উপন্যাস

অন্তহীন প্রহর

আবু ইয়াহইয়া

অন্তহীন প্রহর

মূল:

আবু ইয়াহইয়া

অনুবাদ :

মুশফিক হাবীব

মাকতাবাতুল হাসান

অ র্প ণ

মা!
নাড়ি ছেঁড়া যন্ত্রণার অমোঘ পরিণতি কী
কেবল তুমিই জানো।
বাবা!
তোমার এক ফোঁটা ঘামের মূল্য
আমার জীবন থেকেও বেশি।
(অপরিশোধ্য তোমাদের এই ঋণ)

—মুশফিক হাবীব

লেখকের ভূমিকা

ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) কে ইউরোপের সেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয় যাদের চিন্তা ও দর্শনের ওপর পশ্চিমা সভ্যতার বিদ্যমান ভিত গড়ে উঠেছে। ভলতেয়ারের সময়ে পর্তুগালের লিসবন শহরে ভয়াবহ রকমের এক ভূমিকম্প হয়, যার সঙ্গে আগত সুনামী তুফান এবং এরপর শহরে ছড়িয়ে পড়া আগুন প্রলয় ঘটিয়ে দেয়। এতে লাখো মানুষের বসত এ শহর পুরোদস্তুর বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এ দুর্ঘটনা গোটা ইউরোপকে কাঁপিয়ে তুলে। নিছক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেই নয় বরং চিন্তা ও দর্শনের জগতেও এ ধ্বংসযজ্ঞ ব্যাপক প্রভাব ফেলে। প্রচলিত ধর্মগুরুরা অভ্যাস অনুযায়ী একে খোদার আযাব হিসেবে অভিহিত করে। কিন্তু সময় এখন বদলাচ্ছে। তাই বড় রকম এর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সামনে এলো। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ভলতেয়ার প্রথমে "Poem on the Lisbon Disaster" নামে একটি কবিতা এবং পরে "Candide" নামে একটি উপন্যাস লিখেন। যার মূলকথা ছিল এই, আধুনিক বিশ্বে খ্রিস্টানদের প্রচার করা এমন কোনো ঈশ্বর-ভাবনার সুযোগ নেই যার প্রেরিত আযাব অপরাধী ও নিরপরাধ সবাইকে নির্বিচারে ধ্বংস করে দেয়।

ভলতেয়ারের এ কাজ প্রথমে প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে পড়ে। কিন্তু এতে বর্ণিত চিন্তা-দর্শন খুব দ্রুতই সময়ের ভাষায় রূপান্তরিত হয়। খোদার দিকে সম্বন্ধকৃত ভুল ধারনার প্রতিক্রিয়া মানুষকে ধীরে ধীরে আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়। পরে এমন এক সময় এলো যে, পশ্চিমা দেশগুলোতে খোদার নাম নেওয়াটাও এক ধরনের নির্বুদ্ধিতার কাজ বলে গণ্য হতে লাগলো। কবি আকবর এলাহাবাদী তার এক কবিতায় এ অবস্থাটি চিত্রিত করতে গিয়ে বলেন,

"থানায় গিয়ে রিপোর্ট জানায় প্রহরী

এযুগেও খোদার নাম জপে আকবরী।"

পরবর্তী সময়ে এসে খোদার প্রতি বিশ্বাস কোনো না কোনো ভাবে তো মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরকালের বিশ্বাস যা মূলত আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ ন্যায়বিচারের প্রমাণ এবং পৃথিবীতে সংঘটিত যাবতীয় অন্যায়ের প্রতিকার-তা কখনো ব্যাপক হতে পারেনি। ভলতেয়ার এমন এক খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করতেন– যেখানে পরকাল ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং অযৌক্তিক

ধারণায় ভরপুর। ফলে তার মনে জেগে ওঠা আপত্তিগুলোর সঠিক সমাধান তিনি পাননি। এভাবেই তিনি খোদা ও পরকালকে অস্বীকারকারী আন্দোলনের গোড়াপত্তনকারী হয়ে যান, যা আজ পৃথিবীর সর্বত্র দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

সৌভাগ্যবশত মুসলমানদের কাছে কুরআনের মতো কিতাব রয়েছে, যাতে বিবৃত হয়েছে, দুনিয়ার জীবনের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত ধাপ হলো আখেরাত। এ কুরআন ছাড়া মানবজীবন ও বিশ্বচরাচরের কোনো বিষয়ই সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব নয়। ইউরোপের মুক্তচিন্তার যুগের মতো আজ মুসলিমসমাজেও রক্ষণশীল ধার্মিক ও লাগামহীন মুক্তমনাদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে গেছে। এ সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে এখানে কোনো ভলতেয়ার সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর রহমতে উপন্যাসের ভাষায় মানবজীবনের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত অধ্যায়ের কিছু বিবরণ পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

বিষয়টি নিয়ে এজন্য আলোচনা করছি যে, সাহিত্যে অনুরাগী পাঠকগণ সাধারণত গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেম-ভালোবাসা, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়ে লেখা উপন্যাসের সাথেই পরিচিত, যেগুলো সাধারণত আমাদের অঞ্চলে লেখা হয় এবং পড়া হয়। অথচ উপন্যাস রচনার পরিধি মূলত এরচে বহুগুণ বিস্তৃত। প্রতিটি উপন্যাসের পটভূমি, প্রারম্ভিক আলোচনা, ঘটনা এবং সংলাপ তার নিজস্ব স্টাইলে হয়ে থাকে; যার ওপর উপন্যাসের ভিত্তি রচিত হয়। "*অন্তহীন প্রহর*" এমনই একটি অভূতপূর্ব উপন্যাস। অভূতপূর্ব হলেও এটি মূলত একটি কল্পনা। প্রত্যেকটি উপন্যাসই একটি কল্পনা, যা চিন্তাজগতে বা কল্পলোকে সম্ভাবনার এক ভিত গড়ে তোলে। এ ভিত সম্ভাবনার আকাশ যতোটাই স্পর্শ করুক এর ভিত্তি কিন্তু বাস্তবতার ভূমিতেই প্রোথিত। আমার এ উপন্যাসটি মৌলিক বিষয়বস্তু এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর বিচারে একটি ফিকশন। তবে এ ফিকশন আপনাকে সম্ভাবনার যে জগতের সাথে পরিচিত করবে তা এ পৃথিবীর সবচে' বড় বাস্তবতা। দুর্ভাগ্যবশত এ বাস্তবতা আজ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে। কিন্তু সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যখন সম্ভাবনার এ জগত উন্মুক্ত ও প্রকৃষ্ট বাস্তবতা হিসেবে প্রকাশ পাবে।

কথা যদি এখানেই শেষ হতো, তবুও এ উপন্যাসের পাঠ আকর্ষণবোধ থেকে খালি হতো না। কিন্তু ব্যাপার হলো, খুব দ্রুত বা খানিকটা বিলম্বে এ উপন্যাসের সকল পাঠক এবং দুনিয়ায় বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ এ ফিকশনের অংশ হবে এবং অনিবার্যরূপে এর কোনো না কোনো অধ্যায় অতিক্রম করবে। এ কারণটিই মূলত আমাকে এ ময়দানে কলম চালাতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আমার উদ্দেশ্য কেবল এই যে, অদৃশ্যে লুকানো সম্ভাবনার এ জগৎকে ফিকশনের মাধ্যমে এক জীবন্ত বাস্তবতা বানিয়ে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা। এটা বড় আয়াসসাধ্য ও স্পর্শকাতর কাজ। কারণ, অনাগত এ জীবনের কোনো বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে নেই। এ উদ্দেশ্যে কল্পনার ঘোড়াকে লাগামহীন দৌড়ানোরও কোনো সুযোগ নেই। সৌভাগ্যবশত শেষ নবীর বর্ণনা থেকে অনাগত ওই জীবনের যে চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে, তার ওপর ভিত্তি করেই আমি ওই জীবনের দৃশ্যপট উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এ কাজে উপন্যাস রচনার রীতি অনুযায়ী সংলাপের আশ্রয়গ্রহণ এবং চরিত্র চিত্রণ ছিল অপরিহার্য। স্পর্শকাতর এ কাজটি করতে গিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে আমি মহান আল্লাহর সুউচ্চ গুণাবলী সংশ্লিষ্ট কুরআনের বর্ণনা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সামনে রেখেছি। এরপরও ভুল ভ্রান্তি থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে তার শ্রেষ্ঠত্বের অসিলায় ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা রাখি।

এখানে পাঠকের সামনে আমি এ কথা জানানোও কর্তব্য মনে করছি যে, প্রথমে এ উপন্যাসটি আমি সাধারণ মানুষের জন্যে প্রকাশ করতে চাইছিলাম না। আমি তো কেবল কেয়ামত দিবস সম্পর্কে ব্যক্তিগত কিছু অনুভূতি শব্দের খাঁচায় আবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখতে দেখতেই এ উপন্যাসের প্রথম আটটি অধ্যায় কয়েক দিনে শেষ হয়ে গেল। এরপর এগুলো পড়তে গিয়ে মনে হলো, এখানে যা কিছু লিখেছি তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা উচিত হবে না। তবে কয়েকজন বন্ধুকে এ রচনাংশটি দিলাম তাদের মতামত জানার জন্যে। তাদের অভিমত ছিলো আমার সম্পূর্ণ উল্টো। রচনাটি তাদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেললো। তাদের অধিকাংশের জন্যে এটি ছিলো হৃদয়-প্রকম্পিতকারী এবং জীবন বদলে দেওয়ার মতো অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। তাদের প্রবল তাগাদা ছিলো, উপন্যাসটি পূর্ণ করে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হোক।

এতকিছুর পরও এটি পূর্ণ করার ব্যাপারে আমি ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছিলাম না। কিন্তু বন্ধুদের পীড়াপীড়ি যখন সীমাহীন বেড়ে গেল, তখন অবশিষ্ট কাজ পূর্ণ করার পূর্বে আমি এস্তেখারা শুরু করলাম। এস্তেখারার মাধ্যমে ভেতর থেকে ইতিবাচক একটি আওয়াজ পেয়ে উপন্যাসটি পূর্ণ করে ফেললাম। বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে উপন্যাসটি পূর্ণ তো হয়ে গেল, কিন্তু তখনও আমি ব্যাপকভাবে প্রচারের পক্ষে ছিলাম না। কিন্তু উপন্যাসটি পূর্ণ করার কয়েকদিন পর আমার কাছে মনে হলো, কোনো এক ধ্বংসাত্মক ব্যাধি মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদার সুরক্ষিত কেল্লার দরোজায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি পেটাচ্ছে। তখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, উপন্যাসটি অবশ্যই ছাপবো। ইনশাআল্লাহ।

মানুষ আমাকে আলেম এবং সাহিত্যিক মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে না আমার কাছে কোনো সাহিত্যিকের কলম আছে, আর না তো কোনো আলেমের মেধা আছে। ব্যথিত হৃদয়ই আমার একমাত্র পুঁজি। এ ব্যথা যখন অনেক বেড়ে গেল তখন এই উপন্যাসের ছাঁচে ঢেলে দিলাম। কঠিন এ ময়দানে আমার অবতরণের এই একটি মাত্র কারণ। এ কারণটি আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হতে পারে যদি আমি এর দ্বারা বিশ্বপ্রতিপালকের ভেগে যাওয়া ভেড়ার পাল তার দিকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হই। বর্তমান সময়ে অদৃশ্যের কথা শোনার জন্যে না তো মানুষের সময় আছে আর না কোনো আকর্ষণবোধ আছে। কিন্তু এ ফিকশনটিই হয়তো প্রতিপালকের কথা শুনতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবে। হয়তো এভাবেই আল্লাহর কোনো বান্দা বা বান্দি ফিরে আসবে স্বীয় রবের দিকে। হয়তো এভাবেই জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাওয়া কোনো কদম ফিরে আসবে সঠিক পথে। হয়তো বেড়ে যাবে জান্নাতের আরেকজন অধিবাসী। এমনটি হলে আমার পরিশ্রম স্বার্থক হয়েছে মনে করবো।

“আওয়াজ দিয়ে দেখ হে! সাক্ষাৎ পাবে তবে
নয়তো জীবনের দীর্ঘ সফর অনর্থকই রবে।”

–আবু ইয়াহইয়া

অনুবাদকের কথা

১.

পাকিস্তানের শক্তিমান লেখক ঔপন্যাসিক আবু ইয়াহইয়া আনকোরা এক পথে হেঁটেছেন। বৃত্তের একদম বাইরে গিয়ে পরকালকে উপজীব্য করে তিনি রচনা করেছেন অনন্য উপন্যাস "*জাব যিন্দেগী শুরু হোগী*"। এতে তিনি কবর, হাশর, কেয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতি বিষয়ে কুরআন হাদীসে বিবৃত বিভিন্ন অবস্থাকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র ও দৃশ্যের মাধ্যমে চিত্রায়ণ করেছেন। এ চিত্রায়ণে তিনি বেশ দক্ষতা ও ঋদ্ধহস্তের প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি যখন কোনো ব্যর্থ মানুষের অপদস্ততা বা শাস্তির ভয়াবহতা কিংবা পরিস্থিতির ভীতিপ্রদতার বর্ণনা দেন তখন অজানা এক আশঙ্কা পাঠকের বুকের ভেতরটায় মোচড় দিয়ে ওঠে। আর যখন তিনি কোনো সফল মুমিনের সফলতা ও নেয়ামত লাভের দৃশ্য চিত্রায়ণ করেন তখন মহাপ্রাপ্তির আশায় চকচক করে ওঠে পাঠকের আঁখিযুগল। অভাবিত এক পুলক বয়ে যায় তনুমনে।

উপন্যাসটির অভিনব বিষয়বস্তু, উত্তম বিন্যাস এবং প্রতিটি বিষয়ের চমৎকার দৃশ্যায়ন পাঠকের ভাবনার জগতে ঝড় তুলবে নিঃসন্দেহে। এ ঝড়ে মূলোৎপাটিত হবে অবিশ্বাসী পাঠকের ঠুনকো সব আপত্তি ও অভিযোগ। একই সাথে তার হৃদয়ের উর্বর ভূমিতে রোপিত হবে বিশ্বাসের চারা। সযত্ন পরিচর্যায় যা একদিন পরিণত হবে সুবিশাল মহিরুহে। আর বিশ্বাসী পাঠক তার বিশ্বাসের জায়গাগুলো উপলব্ধি করবে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ও সবিস্তারে। এতে তার বিশ্বাস হবে আগের চেয়ে বহুগুণ মজবুত, সুদৃঢ় ও শাণিত।

২. আমাদের অগ্রজ তরুণ আলেম লেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের রমযানে। রমযানের কোনো এক অবসন্ন বিকেলে ব্যস্ত নগরী ঢাকার মানুষগুলো যখন স্বীয় গন্তব্যের দিকে ব্যগ্র ছুটোছুটি করছে তখন 'সাজা ভাই' খানিকটা এগিয়ে এসে আমাকে রিসিভ করে নিয়ে গেলেন পল্টনস্থ মহিলাকণ্ঠের অফিসে। অফিসেই ইফতার করলাম, নামায পড়লাম। নামাযের পর দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ সময় আলোচনা হলো। আলোচনার এক ফাঁকে 'সাজা ভাই' পাকিস্তানের ধীমান লেখক আবু ইয়াহইয়ার অনবদ্য রচনা "*জাব যিন্দেগী শুরু হোগী*" আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। বললেন,

মাওলানা! অসাধারণ একটি উপন্যাস। দেশীয় প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। অনুবাদ করে ফেলুন। পাঠকশ্রেণি ব্যাপক উপকৃত হবে।' আমিও কুণ্ঠাহীন চিত্তে লুফে নিলাম সাজা ভাইয়ের প্রস্তাব। রমযান পরবর্তী শিক্ষাবর্ষটি ছিল আমার শিক্ষকতা জীবনের প্রথম বছর। প্রথম বছরেই দরসে নেযামীর সর্বোচ্চ তিন জামাতের সবক থাকায় মুতালা'আর সীমাহীন চাপ মাথায় নিয়েও অনুবাদকর্মে হাত চালাচ্ছিলাম সমান তালে। আল্লাহর অশেষ কৃপায় সে বছরই আরবী শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি সময়ে উপন্যাসটির অনুবাদ সম্পন্ন হলো। কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে প্রায় দেড় বছর পেরিয়ে গেলেও কাজটি আলোর মুখ দেখেনি। অবশেষে বাংলাদেশের অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল হাসান "অন্তহীন প্রহর" নামে উপন্যাসটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ জন্য মাকতাবাতুল হাসানের কর্ণধার রাকিবুল হাসান খান ভাইয়ের প্রতি অসংখ্য কৃতজ্ঞ। বই প্রকাশের এ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দুজন সুহৃদের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি মুফতি মুহাম্মাদুল্লাহ কাসেমি– তিনি দুর্বোধ্য জায়গাগুলোর মর্মোদ্ধারে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। অপরজন বিশিষ্ট ছড়াকার বন্ধুবর আমিন হানিফ– তিনি কবিতাংশের কাব্যানুবাদ করে দিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করেছেন। উপন্যাসটি পড়ে একজন অবিশ্বাসী পাঠকও যদি বিশ্বাসের পথে ফিরে আসে বা বিশ্বাসী পাঠকের বিশ্বাস আগের চেয়ে খানিকটা হলেও শাণিত হয় তাহলেই আমাদের শ্রম স্বার্থক বিবেচিত হবে। আল্লাহ তায়ালা এ উপন্যাসের লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করেন। আমীন।

মুশফিক হাবীব
ধোবাউড়া, মোমেনশাহী
২০ মে ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

কেয়ামত দিবস

পৃথিবীর বুকে কোনো বন্ধুরতা ছিল না। পাহাড় নদী, খাল-বিল, সাগর-মহাসাগর, খানাখন্দ, টিলা মরুবিয়াবান সব মিটে গিয়েছিল। এবড়োখেবড়ো পৃথিবী পরিণত হয়েছিল এক সমতল প্রান্তরে। দৃষ্টিসীমা ছাপিয়ে ছিল তরুলতাহীন বিস্তৃত মরুভূমি। ওপরে ছিল অগ্নি উদ্গীরক আসমান। কিন্তু আসমানের রং নীল ছিল না, ছিল লাল অঙ্গারময়। এ লালিমা সূর্য বিচ্ছুরিত আগুনের প্রভাব নয়, বরং এটা ছিল জাহান্নামের উত্তপ্ত অগ্নিশিখার প্রভাব যা বিশাল অজগরের মতো হা করে খানিক পর পর আসমানের দিকে লাফিয়ে উঠতো এবং সূর্যকে গিলে ফেলার চেষ্টা করতো। জাহান্নামী শিখার এ ভীতিপ্রদ লম্ফঝম্ফ এবং দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনের ভয়ানক শব্দ মানুষেরও অন্তরসমূহকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

কম্পমান এসব অন্তর ছিল পাপিষ্ঠদের অন্তর। এগুলো ছিল গাফেল, অহংকারী, খুনি, উদ্ধত এবং জালেমদের অন্তর। এগুলো ছিল ফেরাউন ও অত্যাচারী রাজাবাদশাহদের অন্তর। এ অন্তরগুলো ছিল পরকালকে ভুলে উদাস জীবনযাপনকারীদের অন্তর। এগুলো ছিল আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহকে উপেক্ষা করে বসবাসকারীদের অন্তর। এগুলো ছিল আল্লাহর সৃষ্টজীবের ওপর নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাকারীদের অন্তর। এগুলো ছিল মানুষের প্রতি সহমর্মিতাশূন্য ও আল্লাহর স্মরণমুক্ত অন্তর।

আজ ওই দিন শুরু হয়ে গেছে, যে দিনে এ সমস্ত গাফেল অন্তরগুলো জাহান্নামের উত্তপ্ত অগ্নিশিখা এবং চিরস্থায়ী আযাবের আহার্য হওয়ার কথা ছিল। যে আযাব নিজের ক্ষুধা মেটানোর জন্যে প্রস্তরাদি এবং এসব পাথুরে অন্তরসমূহেরই অপেক্ষায় ছিল। আজ ওই সকল আযাবের ঈদের দিন। কারণ, আজই তাদের অনন্তকালীন ক্ষুধা নিবারণ হবে। আযাবের ভয়ে এ পাপিষ্ঠগুলো একটু আশ্রয়ের আশায় এদিক ওদিক ছুটে ফিরছে। কিন্তু হাশরের এ কঠিন ময়দানে আশ্রয় বা স্বস্তি কোথায় পাবে? সর্বত্র বিরাজ করছে কষ্ট ক্লেশ, বিপদাপদ ও ভয়াবহতা।

এ পরিস্থিতিতে কত বছর বা কত শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেছে ইয়ত্তা নেই। এটা হাশরের ময়দান। কেয়ামত-দিবস। সম্পূর্ণ নতুন এক জীবন। এ জীবনের

কোনো অন্ত নেই। আমিও হাশরের ময়দানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে সবকিছু অবলোকন করছি। আমার সামনে দিয়ে অগণিত মানুষ দৌড়ে পালাচ্ছে। চোঁচা দৌড়ে তারা পথিমধ্যে আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, উঠে আবার দৌড়তে শুরু করছে, আবার পড়ে যাচ্ছে পুনরায় উঠে দৌড়াচ্ছে। জাহান্নামী শিখা তীব্রভাবে প্রজ্বলিত হওয়ার ভয়ানক শব্দের সাথে মানুষের চিৎকার, কান্নাকাটি এবং হাহুতাশের শব্দও ময়দানে অনুরণিত হচ্ছে। মানুষ একে অন্যকে গালি দিচ্ছে, দোষারোপ করছে, ঝগড়া করছে, একজন আরেকজনের দিকে তেড়ে আসছে।

কেউ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। কেউ চিন্তা ও উদ্বিগ্নতায় সময় কাটাচ্ছে। কেউ নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। কেউ লজ্জায় নীল হয়ে যাচ্ছে। কেউ পাথর দিয়ে মাথায় উপর্যুপরি আঘাত হানছে। কেউ বক্ষদেশ জখমে জর্জরিত করছে। কেউ নিজেকে অভিসম্পাত করছে। কেউ মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান, বন্ধু-বান্ধব ও অনুসৃতদেরকে নিজের এ বিপন্ন অবস্থার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে অনর্গল বকে যাচ্ছে। এদের সবার সমস্যা একই। কেয়ামতের দিন এসে গেছে। অথচ তাদের কারোই এ দিনের কোনো প্রস্তুতি নেই। আজ তারা অন্যকে দোষারোপ করুক বা নিজেকে ধিক্কার দিক, আহাজারি করুক বা ধৈর্য ধারণ করুক, ভাগ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে না। ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। হিসাব-নিকাশের সূচনা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এক্ষুনি রাজাধিরাজ আল্লাহ তায়ালার আত্মপ্রকাশ করবেন। এরপরই শুরু হয়ে যাবে হিসাব-নিকাশ। ইনসাফ ও পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সাথে প্রত্যেককে শুনিয়ে দেওয়া হবে তার ব্যাপারে গৃহিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

কিন্তু আমি এসব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না-জানি কত সময় এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার একদম নিকটে এক ব্যক্তি চিৎকার করে ওঠলো— "হায়! এরচে' তো মরণই ভালো ছিল। এর থেকে তো কবরের অন্ধকার গর্তই শ্রেয় ছিল।"

আমি আশপাশের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ছিলাম। ওই ব্যক্তির চিৎকার আমাকে কল্পলোক থেকে নামিয়ে বাস্তবতার জগতে নিয়ে এলো। মুহূর্তের মধ্যেই আমার স্মৃতিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু মূর্ত হয়ে ওঠলো। আমার নিজের উপাখ্যান, পৃথিবীর দাস্তান, আশপাশের মানুষদের বৃত্তান্ত সব ছবির মতো ঘুরে ঘুরে এসে আমার স্মৃতির পর্দায় দেদীপ্যমান হতে থাকলো।

ভয়াবহ ওই দিনের শুরুতে আমি আমার ঘরে ছিলাম। এ ঘর বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছিল কবরের অন্ধকার গর্ত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল আখেরাতের প্রথম ঘাঁটি। সেখানে আমার জন্যে ছিল অনাবিল সুখ শান্তি। ওই দিন আমার পুরনো ও প্রিয়

বন্ধু সালেহ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। দুনিয়াতে আমার ডান কাঁধে বসে আমার পুণ্যগুলো লিপিবদ্ধ করতো যে ফেরেশতা তার নাম ছিল সালেহ্। মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তার সান্নিধ্য ছিল আমার জন্যে বরাবরই স্বস্তি ও আনন্দের বিষয়। বরাবরের মতো আজও আমরা মধুময় আলাপচারিতায় মজে গিয়েছিলাম।

মজার মজার কথোপকথন চলছিল দু'জনের মাঝে। আলাপচারিতার মাঝেই আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম–

"বন্ধু, বলো তো আমার সাথে তোমার ডিউটি কেন দেওয়া হয়েছে?"

"আব্দুল্লাহ! ব্যাপার হলো এই, দুনিয়াতে আমি ও আমার সাথি তোমার ডিউটি করতাম। সে লিখতো তোমার গুনাহ, আমি লিখতাম নেকী। তুমি আমাকে দু'মিনিটের জন্যেও অবসর দিতে না। কখনো আল্লাহর যিকির, কখনো তাঁর স্মরণে অশ্রু বিসর্জন, কখনো মানুষের জন্যে দুআ, কখনো নামায, কখনো আল্লাহর রাস্তায় দান, কখনো মানবসেবা......অন্য কিছু না পারলেও তোমার চেহারায় সর্বদা অন্যের জন্যে মুচকি হাসির আভা ছড়িয়ে থাকতো : তাই আমি সব সময় কিছু না কিছু লিখতাম। নিরবচ্ছিন্ন কাজে লাগিয়ে রেখে তুমি আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলে। কিন্তু আমরা ফেরেশতারা তো তোমাদের মানুষের মতো না যে, মন্দের বদলা মন্দ দিয়েই দেব। এজন্যেই তোমার ওই মন্দ ও অসৌজন্যমূলক আচরণ সত্ত্বেও প্রতিউত্তরে দেখ আজ আমি তোমার সঙ্গ দিচ্ছি, তোমার খেয়াল রাখছি।" চূড়ান্ত গাম্ভীর্যের সাথে সালেহ্ আমার কথার জবাব দিল। আমিও তার কথার প্রতিউত্তরে সমান গম্ভীরতা মিশিয়ে বললাম–

"তোমারচে' অধিক মন্দ আচরণ আমি বাম কাঁধের ফেরেশতার সাথে করেছিলাম। সে আমার গুনাহ্ লিখতো, কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ তওবা করে নিতাম। এতে সে নিরুপায় হয়ে তার সমস্ত লেখা বসে বসে মুছতো আর আমাকে গালমন্দ করে বলতো, এভাবে যদি মুছিয়েই ফেলবে তবে লিখিয়েছিলে কেন? পরিশেষে বিরক্ত হয়ে সে আল্লাহর কাছে দুআ করেছে, হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি থেকে আমাকে পরিত্রাণ দান করো। এজন্যেই মৃত্যুর পর থেকে তুমি আমার সাথে থাকছো।"

এটা শুনে সালেহ বিকট অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

এরপর বললো– "চিন্তা করো না, হিসাব-নিকাশের সময় সে আবারও এসে পড়বে। নিয়ম অনুযায়ী আমরা দু'জনে মিলেই তোমাকে আল্লাহর সামনে পেশ করবো।"

এ কথাটি বলতে বলতেই তার চেহারায় গভীর গাম্ভীর্যের ছাপ পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠলো। অবনত মস্তকে সে নিবিড় নিস্তব্ধতায় ডুবে গেল। তার মাঝে এমন

পরিস্থিতি আমি ইতঃপূর্বে লক্ষ্য করিনি। কয়েক মুহূর্ত পর সে মাথা উঠালো। লক্ষ্য করলাম, তার চেহারায় সার্বক্ষণিক বিরাজ করা মুচকি হাসির লেশমাত্র বাকি ছিল না। এর পরিবর্তে বরং পেরেশানি ও ভয়ের ছাপ ছিল অতি স্পষ্ট। আমার দিকে তাকিয়ে সে মুচকি হাসির ব্যর্থ চেষ্টা করে বললো,

"আব্দুল্লাহ! ইসরাফীল হুকুম পেয়ে গেছে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সময় অতি সন্নিকটে। পৃথিবীবাসীকে প্রদত্ত অবকাশের সময় শেষ। আরো কিছু সময় তুমি এ কবরে আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে থাকবে। আমি এখন চলে যাচ্ছি। আরেকবার আমি তোমার সাথে তখন সাক্ষাৎ করব– যখন নতুন জীবন শুরু হয়ে যাবে। তুমি যখন চোখ খুলবে দেখতে পাবে কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। ওই দিন আমি আবারো তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব।"

. . . . .

জীবনের চাকা স্বাভাবিক গতিতেই ঘুরছিল। বাজারগুলোতে পূর্বের মতোই হাসি-ঠাট্টা ও ধুমধাম জারি ছিল। নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস, মস্কো, দুবাই, দিল্লি, করাচি, লাহোর সবখানে মহা আড়ম্বরতা বিরাজমান ছিল। রাতকে দিন বানিয়ে দেওয়া চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জার মাঝে টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচ এবং বিশ্বকাপ ফুটবল, দর্শকদের করতালি মারফত বিনোদন প্রকাশ, মদশালায় গিয়ে মদ পান করে এবং ক্লাবে গিয়ে চরম নোংরামিতে লিপ্ত হয়ে মাতাল হয়ে পড়ে থাকা, হলিউড এবং বলিউডের অ্যাকশন মুভিসমূহে অভিনয়কারীদের ঝলক দেখতে অত্যাগ্রহী বিকারগ্রস্ত লম্পটশ্রেণি, মুভি, নাট্যমঞ্চ, টিভি, বেলি ড্যান্স এবং ফ্যাশন শো-গুলোতে কামোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গি করে নেচে গেয়ে নিজের দেহ প্রদর্শনকারী মডেল ও অভিনেত্রীরা, এ দেহ প্রদর্শনীর মাধ্যমে টাকার পাহাড় গড়ে তোলা বুর্জোয়াশ্রেণি, মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর মালিক এবং এদের কাছে নিজের শিক্ষা ও যোগ্যতা বিকিয়ে দিয়ে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা শিক্ষিত ও কর্মঠ যুবশ্রেণি, মিডিয়ার বাহ্যিক মোহময়তা, স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্যে আন্দোলন সংগ্রাম, রাজনীতির বাজারে সুস্পষ্ট ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা, বাজারগুলোতে ঘুরে ফেরা ও কেনাকাটা করা নারী পুরুষ, বিত্তশালীদের প্রমোদশালায় আনন্দ উল্লাসের সমারোহ, দরিদ্রদের ঝুপড়িগুলোতে দারিদ্র ও দীনতা, বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে বাঁধভাঙ্গা আনন্দ উচ্ছ্বাস, হাসপাতাল ও জানাযাসমূহে চিন্তা ও বিরহের হাতছানি, সর্ববিষয়ে আল্লাহর অনুগত ধার্মিকশ্রেণি, গরিব অনাথ এবং তাদের ব্যাপারে সর্বদা উদাসীন থাকা ধনী মহল, ঘুষের টাকায় পকেট গরম করা সরকারি চাকুরিজীবি, ভেজাল মিশ্রণ ও সিন্ডিকেট তৈরির মাধ্যমে শিল্পপতি বনে যাওয়া হারামখোর ব্যবসায়ী, জনসাধারণকে পিষ্ট

করা শাসকবর্গ এবং বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর সাম্রাজ্যবাদি সুপার পাওয়ার, সবাই নিজ নিজ কাজ ও ব্যস্ততায় নিমজ্জিত ছিল।

পৃথিবীবাসী সর্বদা যা করতো তাই করছিল। যুলুম নির্যাতনের উপাখ্যান, ধোঁকা ও প্রতারণার দাস্তান। লোভ লালসার পেছনে ছুটোছুটি, গাফলত ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ চালচলন, আল্লাহ ও আখেরাতকে ভুলে থাকা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা, মাযহাবগত ঝগড়া, সাম্প্রদায়িক বিভেদ.......সবকিছু বরাবরের মতোই চলমান ছিল। নবীর আগমন তো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বহু শতাব্দী আগেই। কৃষিবিপ্লব রূপ নিল শিল্পবিপ্লবে, আর শিল্পবিপ্লব পরিবর্তন হয়ে সৃষ্টি হলো তথ্যবিপ্লবের। সবকিছুতেই পরিবর্তনের ছোঁয়া। পরিবর্তন নেই শুধু মানুষের ঔদাসীন্যে। মানুষের চলন বলনে এতটুকু পরিবর্তন আসেনি। তাদের চিন্তা-চেতনায় আখেরাতমুখিতার ছিটেফোঁটাও নেই। সেই আগের মতোই অর্থলুব্ধতা ও সম্পদ উপার্জনের পেরেশানি, সেই প্রেম-ভালোবাসার মরীচিকা পানে ছুটোছুটি, সেই মৃত্যু ও অসুস্থতার মতো বিপদাপদ। তখনো মানুষের মাঝে সকল চিন্তাই বিদ্যমান ছিল আখেরাতের চিন্তা ছাড়া, সর্বপ্রকার ভয়ই ছিল একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া। আকাশের চক্ষু এটা দেখছিল যে, আল্লাহর জমিনকে যুলুম-নির্যাতন ও ফেতনা-ফাসাদে ভরে দেওয়া মানুষগুলো এখন জমিনের জন্যে অসহনীয় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বার বার পৃথিবীকে আন্দোলিত করা হলো। সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী পুরো হতে লাগলো। খালি পায়ে বকরি চরানো আরবরা পৃথিবীর উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করে ফেলেছে। কিন্তু হৃত মনুষ্যত্ব ও মানবতা ফিরে আসেনি। নূহ আলাইহিস সালামের তৃতীয় ছেলে ইয়াফিছের বংশধর তথা ইয়াজুজ-মাজুজরা পৃথিবীর সদর দরজাসমূহের মালিক হয়ে গেছে। শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিটি চূড়া থেকে এ ইয়াজুজ-মাজুজরাই দুনিয়াবাসীর ওপর আক্রমণ করতে লাগলো। বৃটিশ, রাশিয়া, আমেরিকা এবং চীন একের পর এক বিশ্বক্ষমতার মসনদে সমাসীন হতে থাকলো। আসমানি কিতাবগুলোর সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী পুরো হয়ে গেছে। তবু মানবতা তার আসল রূপ ফিরে পেল না। সুনামি এলো, টর্নেডো এলো, বন্যা হলো এবং ভূমিকম্প হলো, কিন্তু হতভাগা মানবজাতি তাদের উদাসীনতা থেকে বেরিয়ে এলো না।

আল্লাহ তায়ালা তথ্যবিপ্লব সৃষ্টি করে দিলেন। তার অনারব বান্দারা নবীয়ে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীকে বহন করে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছুটে বেরিয়েছেন এবং সবার কাছে এর সৌন্দর্য ও যথার্থতা তুলে ধরেছেন। কিন্তু মানুষ এর পরও সতর্ক হয়নি। কেয়ামতের পূর্বে একের পর এক

কেয়ামতের সকল আলামত প্রকাশ করে মানুষকে গাফলতের ঘুম থেকে জাগানোর চেষ্টা করা হলো, কিন্তু গাফেল মানুষের চালচলনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তবে যাদের ভাগ্য প্রসন্ন ছিল তারা সঠিক পথে চলে এসেছে। আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে ইসরাফীল আলাইহিস সালাম হাতে শিঙ্গা উঠিয়ে নিয়েছেন। দেখতে দেখতে কেয়ামত চলে এলো।

সূর্যের প্রশস্ততা গুটিয়ে নেওয়া হলো। তারকারাজি জ্যোতিহীন হতে লাগলো। হিমালয়ের মতো পাহাড় বাতাসে তুলোর মতো উড়তে লাগলো। পার্বত্য অঞ্চলগুলো বালুকাময় প্রান্তরে পরিণত হলো। সমুদ্রগুলোতে পাহাড়ের মতো উঁচু উঁচু ঢেউ উঠতে শুরু করলো। খোলা প্রান্তরসমূহ সাগরে পরিবর্তন হলো। জমিন তার আগ্নেয়গিরি বাইরে উগরে দিল। উপত্যকাগুলোয় আগুনের সমুদ্র বইতে লাগলো। পৃথিবী তীব্রভাবে কেঁপে ওঠলো। জমিন উলট পালট হয়ে গেল। শহর-নগর গর্তে পরিণত হতে লাগলো। প্রাসাদগুলো মাটিতে মিশে যেতে লাগলো। বসতিগুলোতে কবরস্থানের দৃশ্য সৃষ্টি হতে থাকলো।

দুর্বল মানুষের ক্ষমতাই বা কী ছিল। খানিক পূর্বেও যে নতুন বাড়ি বানানোর পরিকল্পনা করছিল। নতুন দোকান ও ব্যবসা শুরুর পরিকল্পনা করছিল। বিয়ে-শাদির স্বপ্ন দেখছিল। নতুন গাড়ি, নতুন জামা কেনায় ব্যস্ত ছিল। ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় বিভোর ছিল। সেই ব্যক্তিটিই এখন সকল পরিকল্পনা ও স্বপ্ন ভুলে গেল। মায়েরা দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ফেলে পালাতে লাগলো। গর্ভবতীদের গর্ভপাত হয়ে গেল। শক্তিশালীরা দুর্বলদের পিষ্ট করে এবং যুবকরা বৃদ্ধদেরকে রেখে ছুটে পালাতে লাগলো। স্বর্ণ রৌপ্য রাস্তার মাথায় পড়ে রইলো। টাকার নোট বাতাসে উড়তে থাকলো। মূল্যবান আসবাবপত্র বিক্ষিপ্ত পড়ে রইলো। কিন্তু গ্রহণকারী কেউ নেই। কুড়িয়ে নেবার লোক নেই। বাড়ি, ব্যবসা, আত্মীয়-স্বজন, আসবাবপত্র, সবকিছু মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। সবাই কেবল নিজের চিন্তায় অস্থির। মানুষ আজ সবকিছু ভুলে গেছে। এক আল্লাহকেই শুধু ডাকছে। কিন্তু কোনো উত্তর আসছে না। কাফের নাস্তিকরাও আল্লাহর নামের দোহাই দিচ্ছে। কিন্তু পরিত্রাণের কোনো ঠিকানা এদের জন্যে নেই। ধ্বংসের ছায়া এদের পিছু ছাড়ছে না। সর্বত্র মৃত্যু ধাওয়া করে ফিরছে। বিপদাপদ চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসছে। অবশেষে মৃত্যুর কাছে জীবন পরাজয় বরণ করলো। জীবনের লীলাখেলা সমাপ্ত হলো। কিন্তু এ সমাপ্তি ছিল আরেক নতুন জীবনের সূচনার জন্যে।

. . . . .

বাতাস প্রবাহের তীব্র ফরফর ধ্বনি আমার কানে আসতে লাগলো। বৃষ্টির কিছু ফোঁটা আমার চেহারায় এসে পড়লো। আমি সম্বিৎ ফিরে পেতে লাগলাম। অনেকক্ষণ যাবৎ আমি ওঠার চেষ্টা করতে থাকলাম কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়গুলো

পুরোপুরি কাজ করছিল না। এ অবস্থায় যথেষ্ট সময় পার হয়ে গেল। হঠাৎ আমার কানে পরিচিত এক আওয়াজ ভেসে এলো–

"আব্দুল্লাহ! ওঠো। জলদি করো।"

এটা ছিল আমার একান্ত বন্ধু প্রিয় দোস্ত সালেহের কণ্ঠ। তার কণ্ঠ আমার মাঝে জাদুর মতো প্রভাব ফেললো। আমি উঠে একদম দাঁড়িয়ে গেলাম।

"আমি কোথায় আছি?" এটা ছিল আমার সর্বপ্রথম ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্ন।

"আমি তোমাকে কী বলেছিলাম, তুমি ভুলে গেছ। কেয়ামতের দিন শুরু হয়ে গেছে। ইসরাফীল শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দিচ্ছেন। এখনো ফুৎকারের আওয়াজ অনেক হালকা। এ আওয়াজে এখনো পর্যন্ত ওই সকল লোকেরাই জীবিত হচ্ছে যারা অতীত জীবনে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।" আমার পিঠ চাপড়িয়ে সে বললো।

"আর বাকি মানুষ?" আমি ফোঁড়ন কেটে বললাম।

"ক্রমাগত ইসরাফীলের আওয়াজ উঁচু হতে থাকবে এবং তাতে ভয়াবহতা এসে পড়বে। এরপর এ আওয়াজ এক বিস্ফোরণে রূপ নেবে। তখন বাকি সবাই জীবিত হয়ে যাবে। কিন্তু ওই জীবন লাভটা অত্যন্ত কষ্ট ও মুসিবতের ঠেকবে। এর পূর্বেই আমাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।" সে দ্রুত জবাব দিল।

"কিন্তু কোথায়?" এ প্রশ্নটা আমার চোখে খেলা করছিল। আমার চাহনি দেখে অব্যক্ত প্রশ্নটা সালেহ পড়ে ফেললো।

"তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান আব্দুল্লাহ! আমরা আরশের দিকে যাচ্ছি।" দ্রুত গতিতে চলতে চলতে সে উত্তর দিল।

এরপর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সে বললো–

"এ মুহূর্তে কেবল নবী-রাসূল, সিদ্দীক্বীন, শুহাদা ও সালেহীনগণই নিজেদের কবর থেকে বাইরে বেরিয়েছেন। এরা ওই সকল লোক– যাদের কামিয়াবির ফয়সালা দুনিয়াতেই হয়ে গিয়েছিল। এরা ওই সকল মানব– যারা না দেখে আল্লাহর আনুগত্য করেছিল, স্পর্শ না করেই তাকে অনুভব করেছিল এবং তার আহ্বান ওই সময়ই শ্রবণ করেছিল যখন কান তার আওয়াজ শুনতে অক্ষম ছিল। এ সকল লোক তাদের রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে, রাসূলদের সাহায্য ও অনুকরণ করেছে। নিজেদের নেতা, স্বগোত্রীয় গণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গ বা বাপ-দাদার আক্বীদা বিশ্বাস ও ধর্মান্ধতার সাথে এদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ছিল কেবল আল্লাহ ও তার রাসূলদের সাথে। আল্লাহর ইবাদত করতে গিয়ে তারা সর্বপ্রকার কষ্ট সয়েছে, নানা কটুকথা শুনেছে এবং অবর্ণনীয় নিপিড়ন সহ্য করেছে। তারা উত্তম চরিত্র ও উন্নত নৈতিকতাকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিল।

আল্লাহর সাথে ভালোবাসা ও সৃষ্টিজীবের প্রতি মমতা নিয়ে জীবনযাপন করেছে। আব্দুল্লাহ! আজ এ সকল লোকদের প্রতিদান লাভের দিন। আর এটা হলো তাদের প্রতিদানের শুরু।"

সালেহের কথা শুনে আমার চেহারা থেকে পেরেশানি ও তার চেহারা থেকে খুশি টপকে পড়ছিল।

"কিন্তু আমি তো জান্নাতে ছিলাম আর......" সালেহ হাসতে হাসতে আমার কথায় ফোঁড়ন কেটে বললো–

"শাহজাদা! ওইটা ছিল বারযাখের যমানা। স্বপ্নের জীবন। প্রকৃত জীবন তো এখন শুরু হলো। জান্নাত তো এখন লাভ হবে। তবে ওটাও বাস্তবেই ছিল। খেয়াল করো, তোমার আর আমার বন্ধুত্ব সেখানেই হয়েছিল।"

আমি আমার মাথাটা নাড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলাম। কিছু কিছু বিষয় আমার বুঝে আসছিল আর অনেক কিছুই এখনো বোঝার বাকি ছিল। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি নিজেকে সালেহের কাছে সোপর্দ করাটাই উত্তম মনে করলাম।

. . . . .

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের শুরুতেই সালেহের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। মানুষ মৃত্যুকে ভীষণ ভয় পায়, কিন্তু আমার জন্যে মৃত্যুটা ছিল এক সুখকর অভিজ্ঞতা। দুনিয়াতে আযরাঈল এক মহা আতঙ্কের নাম, কিন্তু সেও আমার কাছে এসেছিল অত্যন্ত সুদর্শন আকৃতি নিয়ে। সে গভীর ভালোবাসা ও মমতা মিশিয়ে আমার দেহ থেকে আমার রূহ বের করে নিল। আমার দেহ পড়ে রইলো পেছনের দুনিয়ায়, আর আমার রূহটাকে সে এ নতুন দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিল। নতুন দুনিয়ার নাম আলমে বারযাখ। বারযাখ অর্থ পর্দা, আবরণ। আযরাঈল আত্মপ্রকাশ করতেই আমার ও অতীত জীবনের মাঝে একটি পর্দা আড়াল হয়ে দাঁড়ালো। এরপর থেকেই ওই দুনিয়া থেকে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমার বিয়োগ-ব্যথায় পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা কী ছিল, আমি জানতাম না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমার থেকে প্রাপ্ত দীক্ষার কারণে তারা আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপরই সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ থাকবে।

এ নতুন দুনিয়ায় আযরাঈল আমাকে সালেহের হাতেই সোপর্দ করেছিল। তার সাথে আরো অনেক সুদর্শন ছিমছাম ও স্পষ্টভাষী ফেরেশতাও উপস্থিত ছিল। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল ফুলের তোড়া, মুখে ছিল সংবর্ধনা-বাক্য ও শান্তির দুআ। এ আয়োজনের দ্বারা তারা আমাকে বোঝাতে চাইছে, কষ্টের দিন ফুরিয়ে নির্মল আনন্দ ও মহা সফলতার দিন শুরু হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে সালেহ আমাকে সুসংবাদ দিল, নতুন জীবনের শুরুতেই আমার সর্বপ্রথম পুরস্কার হলো আসমান-

জমিনের প্রভু আল্লাহর সামনে উপস্থিতি। সে বলেছে, এ সম্মান ও সুযোগ সবাই লাভ করতে পারে না। এ সুসংবাদটি আমার জন্যে জান্নাতের সুসংবাদের থেকেও মূল্যবান ছিল।

আমরা সবাই মিলে সফর শুরু করলাম। এটা ছিল এক নতুন দুনিয়া। এখানে দূরত্ব, সময় ও স্থানের অর্থ বর্ণনাতীত পাল্টে গিয়েছিল। অতীত জীবনের বাস্তবতার সাথে এগুলোর কোনোই মিল ছিল না। আমি এক ধরনের মোহাচ্ছন্নতা ও উন্মাদনার ভেতর দিয়ে পথ চলছিলাম। হঠাৎ আমাদের পথ আটকে দেওয়া হলো। ঘোষণা এলো, জমিনের ফেরেশতাদের সীমানা এসে গেছে। এখানেই সবাই থেমে যাও। আর এক কদমও সামনে এগুবে না। কেবল সালেহকে আমার সাথে সামনে যেতে দেওয়া হলো। শুরু হলো উর্ধ্ব জগতের সফর। খানিক পরেই একটি জায়গায় গিয়ে আমরা আবারও থেমে গেলাম। এখানে জিবরীল আলাইহিস সালাম আমাকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়ার জন্যে এসেছিলেন।

আমাকে দেখে তিনি বললেন–

"আব্দুল্লাহ! তুমি এই প্রথম আমার সাথে সাক্ষাৎ করছ। কিন্তু আমি পূর্বেও কয়েকবার তোমার সাথে সাক্ষাৎ করেছি।"

এরপর মৃদুভাবে আমার পিঠ চাপড়িয়ে বললেন–

"মনিবের নির্দেশে আমি কয়েকবার তোমাকে সহযোগিতা করেছিলাম। কিন্তু তখন তুমি সেটা জানতে না।"

মনিব শব্দটি শুনতেই আমার চেহারায় একটি আলো ছড়িয়ে পড়লো। শব্দের ছাঁচে আবদ্ধ করার পূর্বেই জিবরীল এ আলোর মর্মার্থ বুঝে নিয়ে বললেন–

"চলো, আমি তোমাকে তোমার ওই দয়াময়ের সাথে দেখা করিয়ে দিচ্ছি। নবী রাসূলদের ছাড়া খুব কম মানুষই আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার এ সম্মান লাভ করতে পারে। সত্যিই তুমি বড় ভাগ্যবান।"

সামনে যেতেই আমার মাথায় একটি প্রশ্ন এলো। জিবরীল আলাইহিস সালামকে আমি জিজ্ঞেস করলাম–

"আমরা কি 'সিদরাতুল মুনতাহা'র দিকে যাচ্ছি?"

"না.....।" জিবরীল আলাইহিস সালাম উত্তর দিলেন। এরপর ব্যাপারটি আরেকটু খুলে বললেন–

"তোমার মাথায় বোধহয় মেরাজের কথা খেলা করছে। সেটা তো নবী-রাসূলগণের রাস্তা। নবীদের উপস্থিতির ব্যাপারটি অনেক উঁচু। তাঁদেরকে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করানো হয়। তোমার রাস্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তোমাকে শুধু আল্লাহর দরবারে সেজদা করার জন্যে ডাকা হয়েছে। সম্ভবত তোমার কারণেই সালেহ্কে এ পর্যন্ত আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।"

ওই সময় আমি সালেহের দিকে তাকালাম। দেখলাম, খুশিরা তার চেহারায় উল্লাসে মেতেছে। জিবরীল আলাইহিস সালাম অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন– "আল্লাহর সত্তা অসীম। তার স্থানও সীমাহীন। তোমাদের পৃথিবীতে ওই সমস্ত স্থানের কোনো কল্পনাই করা যায় না। পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু জানতে তা ছিল খুবই সীমিত ও অল্প। আজ মৃত্যুর পর তোমার চোখ খুলেছে। এখন তুমি যে দুনিয়া দেখতে শুরু করেছ এর সফলতা ও সুখ শান্তি অসীম ও চিরন্তন।"
জিবরীল আলাইহিস সালাম যেমন বলেছিলেন আমি বাস্তবে ঠিক তেমনই দেখছিলাম। আমি মনে মনে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করলাম যে, তিনি আমাকে কাফের বা বেইমান অবস্থায় মৃত্যু দেননি। কারণ, চোখ তো তখনো খুলত, কিন্তু যা কিছু দেখতে পেতাম তা হতো নিতান্ত খারাপ ও ভয়াবহ।
জিবরীল আলাইহিস সালামের সাথে আমরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আরশ বহনকারীদের পর্যন্ত পৌঁছলাম। এখানে আলো, রং ও নূরের সংমিশ্রণে এক অবর্ণনীয় সুন্দর ও নান্দনিক দৃশ্য বিরাজ করছিল। আরশ বহনকারীদের মাথা অবনমিত ছিল। চেহারায় ভীতির ছাপ ও স্বস্তির দ্যোতি ছড়িয়ে ছিল। জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন–
"আল্লাহর দরবারের প্রতিটি হুকুম এ ফেরেশতাদের মাধ্যমে নিচে যায় এবং নিম্ন জগতের প্রতিটি কাজ এদের মাধ্যমে বিশ্বপ্রতিপালকের সামনে পেশ করা হয়।"
আল্লাহর দরবারের এ অবস্থা আমি ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে দেখছিলাম। তারাও চোখ তুলে আমাকে দেখল। অল্প সময়ের জন্যে তাদের চেহারায় মুচকি হাসি ছড়িয়ে পড়লো। আমি সাহস পেলাম। আরশের দিকে পা বাড়ালাম। আমার শরীরের প্রতিটি লোমকূপ থেকে আল্লাহর হামদ ও স্তুতি উচ্চারিত হচ্ছে।
এরপর চলতে চলতে কেন যেন আমার মাঝে কম্পন সৃষ্টি হতে লাগলো। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ভীষণ আগ্রহে তার মহত্বের অনুভূতি প্রবল হয়ে গেল। ওই সময় আমার মাঝে এত তীব্র ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আমি ঘাবড়ে গিয়ে পিছু হটতে শুরু করেছিলাম। অথচ আরশ ছিল তখনো অনেক দূরে। কিন্তু আরশওয়ালার মহত্বে ও বড়ত্বের অনুভূতিতে আমি সম্পূর্ণ বীতসাহস হয়ে

পড়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, এ মুহূর্তে আমার অস্তিত্ব টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় মিশে যাবে। আর খানিকক্ষণ গেলে হয়তো এমনই হতো।

কিন্তু তখনই আমার কানে জিবরীল আলাইহিস সালামের কণ্ঠ ভেসে এলো–
"এখানেই সেজদায় পড়ে যাও। এর সামনে কেবল নবী-রাসূলগণ গিয়ে থাকেন।"

আমি ও সালেহ দু'জনই সেজদায় চলে গেলাম। আজীবন যাকে না দেখে সেজদা করেছিলাম আজ প্রথমবার তাকে দেখে সেজদা করলাম। এ সেজদা কতটা দীর্ঘ ও মধুময় ছিল ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। যে সত্তা সূর্যকে আলোর আচকান ও চন্দ্রকে জ্যোতির আলখেল্লা পরিয়েছেন, পুষ্পরাজিকে সৌরভ ও বাতাসকে গতিময়তা দান করেছেন, তারকারাজিকে চমক ও পুষ্পকলিকে চটক দান করেছেন, আকাশকে উচ্চতা ও সমুদ্রকে প্রশস্ততা দান করেছেন, ভূমিকে শ্যামলিমার নেয়ামত ও নদীগুলোকে প্রবাহের সৌন্দর্য দান করেছেন এবং মানবজাতিকে বাকশক্তি ও কোরআন বহনের সম্মান দান করেছেন তাঁর পায়ে পড়ে থাকা এক একটি মুহূর্ত আমার কাছে সাত মহাদেশের রাজত্বের থেকেও দামী ছিল। কিন্তু মধুময় মুহূর্ত বেশিক্ষণ বাকি থাকে না। আরশ-বহনকারীদের মনোহরী কণ্ঠ ভেসে এলো–

"هو الله لا اله إلا هو."

এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছিল, আরশের মালিক কথা বলা শুরু করছেন। অনুরণিত হলো–

"আমি আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।"

অব্যক্ত মধুর এ তানে এমনই মোহময়তা ছিল যে, আমার অস্তিত্ব আপাদমস্তক কান বনে গেল। আমার গোটা দেহ ও তাবৎ কায়িক ক্ষমতা কান ও শ্রবণশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। আমি আরো কিছু শোনার জন্যে অধীর অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু আলাপচারিতায় খানিকটা বিরাম এসে পড়েছিল। আমি ভাবলাম, এবার আমার কিছু বলা দরকার। আমার কণ্ঠ থেকে সর্বপ্রথম যে বাক্যটি বেরিয়েছিল তা ছিল এই–
"প্রভু! জীবনভর এ একটি বিশ্বাসই তো বুকে লালন করেছি।"

আমার কণ্ঠ ছিল অতি ক্ষীণ। আমি নিজেই আমার কথা সঠিক শুনতে পাইনি। কিন্তু দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী এবং হৃদয়ের অতি গোপন রহস্য অনুধাবনকারী সত্তা পর্যন্ত তা পৌঁছে গিয়েছিল। উত্তর এলো–
"কিন্তু এ বিশ্বাস পোষণকারী সকলেই এ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না....জান আব্দুল্লাহ! তুমি এখানে কী কারণে এসেছ ?"
এবার আমার প্রভুর কণ্ঠের পরতে পরতে বাৎসল্যের রং ঝিলিক দিয়ে উঠছিল।

"এজন্যে যে, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে আমার সম্পর্কে বলা। আমার সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করা। আমার স্মরণ ও আমার কাজকে তুমি স্বীয় জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলে। এটা তারই প্রতিদান।"

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রভু আল্লাহ তায়ালার আলাপচারিতা ও মধুময় কণ্ঠ শুনতে পাওয়া আমার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সুখকর বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু রাজাধিরাজ আল্লাহ তায়ালা এটুকু বলে আবারও থেমে গেলেন। আমার মনে হলো, আমার প্রভু আমাকে কিছু বলার জন্যে সুযোগ করে দিচ্ছেন। আমি সবিনয়ে আর্জি রাখলাম–

"আমি কি আঁপনার পাশে এখানে থাকতে পারি?"

"কেউ আমার থেকে দূরে যেতে পারে না। আর না আমি কারো থেকে দূরে থাকি। আমার যে সমস্ত বান্দা-বান্দি আমাকে স্মরণ রেখে জীবন-যাপন করে তারা আমার পাশেই থাকে..... । আরো কিছু ?"

সর্বশেষ বাক্যটি শুনে আমার অনুমান হয়ে গেছে যে, সাক্ষাতের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি আর্জি পেশ করলাম–

"এখন আমার জন্যে আদেশ কী ?"

"আদেশের সময় ফুরিয়ে গেছে। এখন তো তোমাকে বাদশাহ বানিয়ে দেওয়ার সময় আসছে। আপাতত তুমি চলে যাও। জীবন এখনো শুরু হয়নি।"

আমি হাঁটতে হাঁটতে বললাম–

"কেয়ামতের দিন আপনি আমায় ভুলে যাবেন না তো! আমি ওই দিনের ভয়াবহতা ও আপনার অসন্তুষ্টির অনেক আলোচনা শুনেছি।"

মৃদু হাসির এক সোনালি আভা পরিবেশটাকে আচ্ছন্ন করে দিল। ঝংকার তোলা কণ্ঠে ভেসে এলো–

"ভুলে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য তোমাদের আছে। বাদশাহদের বাদশাহ, তোমার প্রভু কিছুই ভুলেন না। আর আমার ক্রোধ কখনো আমার দয়াকে হার মানাতে পারে না। তুমি তো জীবনভর আশা ও শঙ্কার সাথে আমাকে স্মরণ রেখেছ। আমিও তোমাকে ক্ষমা ও দয়ার সাথে স্মরণ রাখবো। কিন্তু...... ।"

এক মুহূর্ত রাজোচিত বিরতির পর বললেন–

"তোমাকে আশ্বস্ত করার জন্যে সালেহকে তোমার সাথে দিচ্ছি। সর্বপ্রকার প্রয়োজনে সে তোমার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে।"

এটা ছিল আমার এবং সালেহের প্রথম সাক্ষাতের প্রেক্ষাপট এবং আমার সাথে তার থাকার মূল কারণ। কবরদেশে আমার জীবন ছিল দেহহীন। সেখানে আমার

অনুভূতি উপলব্ধি, আশা আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতার ধরন ছিল স্বপ্নের মতো। অর্থাৎ, বস্তুহীন, কাল্পনিক। তবে অনুভবে ভরপুর সে জীবনে আমি জান্নাতে প্রাপ্য সকল নেয়ামত পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতাম। আমার আগ্রহে সালেহ মাঝে মাঝে আমার সাথে দেখা করতে আসতো। প্রতিবার সে আমাকে নিত্য নতুন জিনিসের কথা বলতো এবং আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিত। ধীরে ধীরে আমাদের বন্ধুত্ব গভীর হতে লাগলো। সর্বশেষ সাক্ষাতে সে আমায় বলেছিল, জীবন শুরু হতে যাচ্ছে। আর তখন আমি তার সাথে দ্রুত হাশরের মাঠ অতিক্রম করে আরশের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম।

.....

হাঁটতে হাঁটতে আমি আশপাশে তাকালাম। দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত এক সমতল প্রান্তর চোখে পড়লো। পরিবেশটা ছিলো অনেকাংশে ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বের ক্ষণটার মতো। অর্থাৎ, চতুর্দিকে ছিলো মৃদু আলো। এ মুহূর্তে এ মাঠে খুব কম সংখ্যক মানুষই চোখে পড়ছিলো। কিন্তু যারা ছিল তাদের সবার অবস্থান একই ছিল। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, তাদের মধ্যে কোনো নবী বা রাসূলও কি আছেন? আমি সালেহের দিকে তাকালাম। সে বুঝে ফেললো আমি কী জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি। সে বলতে লাগলো–

"তারা সবাই আগেই উঠে গেছেন। তুমি তো তাদের কাছেই যাচ্ছ।"

"তাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হবে কি?" আমি শিশুসুলভ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সে থেমে গিয়ে আস্তে আস্তে বললো–

"এখন তাদের সাথেই জীবনযাপন করবে। আব্দুল্লাহ! কী হতে যাচ্ছে তুমি এখনো বুঝে উঠতে পারছো না। পরীক্ষার সময় শেষ। ধোঁকা প্রতারণার রাস্তাও বন্ধ। এখন সম্পূর্ণ নতুন এক জীবন শুরু হতে যাচ্ছে, যেখানে ভালো লোক সর্বদা ভালো লোকদের সাথেই থাকবে আর খারাপ লোকেরা অনন্তকাল খারাপ লোকদের সাথেই থাকবে।"

মূলত আমি এখনো পর্যন্ত ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। নতুন এ জগতের পুরো বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কবরজীবনে আমি পেয়ে গিয়েছিলাম। তবে সেখানে আমার উপলব্ধিটা ছিলো কাল্পনিক। আর এখানে হাশরের মাঠে সব কিছু ফেলে আসা দুনিয়ার মতো ছিল। আমার হাত-পা, অনুভূতি, জমিন-আসমান সবকিছু সেগুলোই ছিল যেগুলোর সাথে আমি পেছনের দুনিয়ায় পরিচিত ছিলাম। সেখানে আমার বাড়ি ছিল, পরিবার ছিল, আমার মহল্লা, আমার এলাকা, আমার

গোষ্ঠী....এগুলো চিন্তা করতে করতে আমার স্মৃতিতে প্রচণ্ড এক আঘাত লাগলো। আমি থেমে গিয়ে সালেহকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম–

"আমার পরিবারের লোকেরা কোথায়? আমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা কোথায়? তাদের সাথে কীরূপ আচরণ হবে? তাদেরকে আজ দেখা যাচ্ছে না কেন?"

সালেহ অন্য দিকে তাকিয়ে বললো–

"যেসব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই সেসব প্রশ্ন আমাকে করো না তো! আজ সবাই একা। কেউ কারো কাজে আসবে না। তাদের আমল যদি ভালো হয়ে থাকে, তাহলে তুমি নিশ্চিত থাক তারা তোমার সাথে এসে মিলিত হবে। তাদের সাথে কোনো প্রকার সীমালংঘন হবে না। আর যদি এমন না হয় তাহলে......"

বাক্যটি অসম্পূর্ণ রেখে সালেহ চুপ হয়ে গেল। তার কথা শুনে আমার চেহারায় মলিনতা ছেয়ে গেল। আমাকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে সে বললো–

"আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো। তুমি ছিলে আল্লাহর পথে একজন মুজাহিদ। এজন্যেই আগে আগে উঠে গেছ। বাকি মানুষ তো এখনো উঠছে। ইনশাআল্লাহ তারাও নিরাপদেই এসে তোমার সাথে মিলিত হবে। এবার তাহলে সামনে চলো।"

তার আশ্বাসবাণীতে আমি কিছুটা সাহস পেলাম। আমি ক্ষিপ্রগতিতে তার সাথে চলতে লাগলাম।

আরশের ছায়াতলে

আমরা বাতাসের গতিতে সামনের দিকে এগুচ্ছিলাম। এ পথ চলায় কোনো কষ্ট ছিল না, বরং ছিল আনন্দ ও প্রশান্তির ছোঁয়া। বহু পথ অতিক্রম করার পর সালেহ বললো–

“আল্লাহর আরশের ছায়া বেষ্টিত এলাকা শুরু হতে যাচ্ছে। ওই দেখো! সামনে ফেরেশতাদের ভিড় দেখা যাচ্ছে। এর পেছনে উঁচু একটি দরজা। সেটাই মূলত ভেতরে প্রবেশের দরজা।”

সালেহের কথা শুনে আমি সামনের দিকে তাকালাম। দেখলাম, সত্যিই ফেরেশতাদের একটি জটলা আর তার পেছনে আছে সুউচ্চ দরজা। কিন্তু এ দরজার একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। এটি দেয়াল ছাড়াই দাঁড়িয়ে ছিল। কিংবা দেয়াল থাকলেও তা ছিল অদৃশ্য। কেননা, দরজা সংশ্লিষ্ট পেছন দিকে কোনো কিছুই চোখে পড়ছিল না। যেন অদৃশ্য এক পর্দা ছিল, যা দরজার পেছনের সবকিছুকে আড়াল করে রেখেছিল।

তার কথা শুনেই আমার পা ক্ষিপ্রগতিতে চলতে থাকলো আর দূরত্বও দ্রুত কমে আসতে লাগলো। দরজা এখনো দূরেই ছিল। কিন্তু ফেরেশতাদেরকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এরা ছিল সুঠাম দেহের অধিকারী তাগড়া ফেরেশতা। এদের হাতে আগুনের চাবুক দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।
আমি সালেহের হাত শক্ত করে ধরে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম–

“তুমি সম্ভবত ভুল পথে যাচ্ছ। এদেরকে তো আযাবের ফেরেশতা মনে হচ্ছে।”
“চলতে থাকো।” সে না থেমে উত্তর দিল।

অগত্যা আমাকেও তার পেছনে যেতে হলো। কিন্তু আমি তার থেকে দু'চার কদম পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম, যাতে উল্টো দৌড়ে পালাতে হলে আমি তার আগেই থাকি। সালেহ আমার মনোভাব বুঝে ফেলেছিল। তাই ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট করা উচিত মনে করলো–
“এরা নিঃসন্দেহে আযাবেরই ফেরেশতা.....”

আমি তার কথা মাঝখান থেকে কেটে দিয়ে বললাম–

"আর এখানে এজন্যে দাঁড়িয়ে আছে যে, সামনে যাওয়ার আগেই আমাকে পিটিয়ে আমার গুনাহসমূহ ঝেড়ে ফেলবে।"

আমার কথা শুনে সে হাসিতে ফেটে পড়লো। এরপর বললো– "স্মরণ রেখো! তুমি যদি মার খাওয়ার উপযুক্ত হও তাহলে পালিয়েও বাঁচতে পারবে না। কোনো মানুষ এ সমস্ত ফেরেশতাদের গতি ও শক্তির সাথে পাল্লা দিতে পারে না। তোমার জেনে রাখা দরকার, এরা তোমার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে নেই। বরং এজন্যে দাঁড়িয়ে আছে যে, আল্লাহর কোনো পাপিষ্ঠ যদি এ দিকে আসার চেষ্টা করে তাহলে তাকে এত প্রহার করবে যে, আর কোনো দিন সে এদিকে আসার নামও নিবে না।"

আমরা তাদের কাছাকাছি পৌঁছার পূর্বেই তারা দু'ভাগ হয়ে মাঝখান দিয়ে আমাদের যাওয়ার জন্যে রাস্তা করে দিল। আমাদের সম্মানার্থে তারা হাতের চাবুকগুলোকে নিজেদের পেছনে লুকিয়ে ফেলেছে। আমার ধারণা ছিল, তারা আমাদের দেখে মুচকি হাসবে, উল্লাস প্রকাশ করবে। কিন্তু আমি শত চেষ্টা করেও তাদের চেহারায় মুচকি হাসির কোনো ছাপ আবিষ্কার করতে পারলাম না।

সালেহ বলতে লাগলো– "এদের এখানে থাকার একটি উদ্দেশ্য হলো, তোমাকে কত ভয়ঙ্কর ফেরেশতার হাত থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া হলো আল্লাহ তায়ালার ওই নেয়ামতটা অনুধাবন করানো।"

এমনিতেই আমার মুখ থেকে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা-বাক্য বেরিয়ে এলো। এদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করে আমরা দরজার কাছে পৌঁছতেই দরজাটি আপনা আপনিই খুলে গেল। দরজাটি খুলতেই এক মনোরম স্থান আমার চোখে পড়লো। এখান থেকেই আল্লাহর আরশের ছায়া বেষ্টিত এলাকা শুরু হচ্ছে। প্রাণজুড়ানো শীতল বাতাস আর সম্মোহনী সুগন্ধি আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। আমরা দরজার ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলাম ফেরেশতারা দূর পর্যন্ত সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদের চেহারা ছিল ভীষণ হৃদয়গ্রাহী ও সুদর্শন। এরচে'ও বহু গুণ সুন্দর মুচকি হাসি এদের চেহারায় খেলা করছিল। এরা পূর্ণ শিষ্টাচারের সাথে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা তাদের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করতেই দুআ-সালাম এবং খোশ আমদেদ ইত্যাদি শব্দে আমাদের অভ্যর্থনা শুরু হয়ে গেল। তাদের ভাবভঙ্গি ও উচ্চারণগুলো আমার হৃদয়ের গভীরে প্রভাব ফেলছিল আর তাদের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত সুগন্ধি আমাকে উন্মাদ বানিয়ে দিচ্ছিল।

এখানে প্রবেশ করতেই আমার মনে হলো, আমার ভেতর অস্বাভাবিক কোনো পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু তখন আমার পূর্ণ মনোযোগ ছিল ফেরেশতা এবং

এখানকার মনোরম পরিবেশের দিকে। তাই আমি আমার সাথে কী হচ্ছে সে দিকে খুব বেশি দৃষ্টি দিতে পারিনি। আমি এ অবস্থাটাকে এখানকার পরিবেশের প্রভাব ধরে নিয়েছি।

হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে একটি ভাবনা উদিত হলো।

আমি সালেহকে কানে কানে বললাম–

"বন্ধু! এটা তো বুঝলাম, এরা আমাকে মুক্তিপ্রাপ্ত লোক হিসেবে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। কিন্তু এখানে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় তো কারো সাথে নেই। তোমার কি পরিচিত কেউ আছে এখানে?"

আমার কথা শুনে সালেহ হাসতে হাসতে বললো–

"আজ প্রত্যেককে তার ললাট দেখেই চেনা যাবে, সে কে?

তোমার বিস্তারিত পরিচিতি তোমার ললাটেই লিপিবদ্ধ আছে। দেখতে থাকো সামনে কী হয়?"

সারির শেষ মাথায় দাঁড়ানো সুদর্শন ও সম্ভ্রান্ত এক ফেরেশতা। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে এখানকার সকল ফেরেশতার সর্দার হবে। সে আমার কাছে এলো এবং আমার নাম উল্লেখ করে আমাকে সালাম করলো। আমি সালামের উত্তর দিলাম। এরপর সে ভীষণ কোমলতা ও ভালোবাসা মিশিয়ে বললো–

"আপনার সৌভাগ্য। আপনি চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন করেছেন।"

উত্তরে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই সে বললো–

"আপনি কি আয়না দেখবেন ?"

আমার বুঝে আসছিল না, এ কথা সে বিদ্রূপ করে বলছে না-কি বাস্তবেই। কারণ, তখন আয়না দেখার যৌক্তিক কোনো কারণ আমি দেখছিলাম না। সে আমার উত্তরের অপেক্ষা করেনি। একজন ফেরেশতাকে ইঙ্গিত করলো। পরক্ষণেই আমার সামনে বিশাল এক আয়না চলে এলো। আয়নাটি দেখে আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, সে আমার সাথে বিদ্রূপ করেছিল। কারণ, এটি আয়না ছিল না, ছিল অত্যন্ত নান্দনিক একটি শিল্পকর্ম। এতে অনিন্দ্য সুদর্শন এক যুবক রাজকীয় পোশাক পরে দাঁড়িয়ে ছিল। তুলির আঁচড়ে আঁকা ছবিটিকে ছবি ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল; বরং মনে হচ্ছিল যেন আয়নার সামনে কোনো মানুষ জীবিত দাঁড়িয়ে আছে।

আমি ওই ফেরেশতার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললাম–

"আপনি ভালো টিপ্পনী মারতে পারেন তো! তবে ছবিটি কিন্তু আপনারচে'ও অধিক কুহেলিকায় ফেলে দিতে পারে যে কাউকে। অঙ্কনশিল্পী তো মনে হচ্ছে আপনিই, কিন্তু এর ডিজাইনার কে ?"

ফেরেশতা অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমার কথার উত্তর দিল–

"অঙ্কনশিল্পী তো 'মুসাব্বির' তথা মহান আল্লাহ তায়ালা। তবে ডিজাইনার আপনি।"

এরপর সে সালেহকে ইঙ্গিতে কিছু বললো। সালেহ আমার কাছে এসে আমার মাথায় ধরে আবারো আমাকে চিত্রটির দিকে ফিরিয়ে দিল। এবার চিত্রটিতে ওই যুবকের সঙ্গে সালেহকেও দেখা যাচ্ছিল। আমি আশ্চর্য হয়ে কখনো সালেহের দিকে তাকাচ্ছিলাম আর কখনো তাকাচ্ছিলাম আয়নায় দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটির দিকে, যার ব্যাপারে তাদের দু'জনের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত ছিল যুবকটি আমি।

"কিন্তু এটা তো আমি নই।" আমি উচ্চ কণ্ঠে বললাম।

উত্তরে সালেহ বললো–

"সত্য ও বাস্তবতা এটাই যে, এ যুবকটি তুমি।"

"কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব? আমি তো একজন বুড়ো মানুষ ছিলাম। আর যৌবনকালেও তো আমি এমন ছিলাম না।"

এবার ফেরেশতা আমার কথার উত্তর দিল– "আপনি অসম্ভবের জগৎ থেকে সম্ভবের জগতে এসে পড়েছেন। আপনি মানবজগৎ থেকে বেরিয়ে ঐশীজগতে প্রবেশ করেছেন। পৃথিবীতে একজন আরেকজনকে যেমন দেখতো আজ কাউকে তেমন দেখাবে না; বরং মহামহিম আল্লাহ তায়ালা যেমন দেখতেন আজ সবাইকে তেমনই দেখাবে। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের আকৃতি তার গোশত ও হাড়গোড়ের ওপর ভিত্তি করে নির্ণীত হয় না, নির্ণীত হয় তার ঈমান-আমল ও আখলাক-চরিত্রকে কেন্দ্র করে। পৃথিবীতে আপনি তার দৃষ্টিতে যেমন ছিলেন আজ তিনি আপনাকে ঠিক তেমন বানিয়ে দিয়েছেন। তবে এটা কিন্তু আপনার সাময়িক গড়ন। জান্নাতে আপনার প্রাপ্য স্তরটি যখন সুনিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয়ে যাবে তখন আপনার প্রকৃত ও চূড়ান্ত দেহাবয়ব সামনে আসবে। এখন আপনি সামনে চলুন। অনেক লোক আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

. . . . .

আমরা সামনের দিকে যাচ্ছিলাম। ভেতরে প্রবেশ করতেই আমার মাঝে যে পরিবর্তন অনুভূত হয়েছিল তার কারণ আমি আবিষ্কার করে ফেললাম। সম্ভবত আয়নার প্রভাবে আমার হৃদয়ে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে থাকল যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সম্মানিত করে আমার ভাগ্যকে চিরদিনের জন্যে সুপ্রসন্ন করে দিয়েছেন। আমার যাপিত জীবনের দিনরাত এবং নির্যাতনক্লিষ্ট মুহূর্তগুলো এখন স্বপ্ন হয়ে ধরা দিয়েছিল। অতীত জীবনের বঞ্চনা-গঞ্জনা, ধৈর্য ও ক্লেশ যাতনা কখনো এত সুন্দর আকৃতি ধারণ করবে তা আমার কল্পনায়ও ছিল না। কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে পরকালীন জীবনের অনেক পরিচয় পড়েছিলাম, কিন্তু চোখ যা দেখতে পারে, কান শুনতে পারে এবং ইন্দ্রিয়শক্তি অনুভব করতে পারে তার

সবকিছুকে শব্দের জামা পরানো সম্ভব হয় না। আজ যখন এ সমস্ত বাস্তবতা আমার চোখের সামনে তখন বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, আমি......আখেরাতের খেলায় জিতে যাব তা আমি পৃথিবীতে থাকতেই অনুমান করে ফেলেছিলাম। তবে আমার বিজয়টা এত আড়ম্বরপূর্ণ হবে কখনো কল্পনা করিনি।

"তুমি কি এখনো পুরো বুঝে ওঠতে পারনি?" বুঝতে পারলাম না সালেহ কিভাবে আমার ভাবনাগুলো পড়ে ফেলছিল। তার বাক্যটি আমাকে সজাগ করে দিল।

সে কথা চালিয়ে যেতে থাকলো– "প্রকৃত জীবন তো এখনো শুরুই হয়নি। এখনো তুমি আখেরাতের সাময়িক ঘাঁটিতে আছ। প্রকৃত জীবন তো শুরু হবে জান্নাতে। তখন আল্লাহর প্রতিদান দেখবে। এখন সামনে তাকিয়ে দেখো আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।"

তার কথায় আমি বুঝতে পারলাম, আশপাশের পরিবেশ থেকে আমি একদম সম্পর্কহীন হয়ে হাঁটছিলাম। আমি চোখ তুলে তাকালাম। আমরা তখন সবুজ-শ্যামল এক অবারিত প্রান্তরে ছিলাম। আকাশে সূর্য চমকাচ্ছিল। তাতে কিরণ ছিল; কিন্তু অতিরিক্ত গরম ছিল না। আকাশের কোথাও মেঘ ছিল না, কিন্তু জমিনে সবখানে ছায়া ছিল। জমিন সবুজ ছিল। সম্ভবত এরই প্রভাবে আকাশ নীলবর্ণের পরিবর্তে সবুজবর্ণের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। মাঠের মাঝখানে আকাশচুম্বি পাহাড় ছিল। শুধু দৃষ্টান্ত আর প্রবাদ নয়, বাস্তবেই আকাশচুম্বি। কেননা, এর চূড়া আকাশে গিয়ে ঠেকছিল। চারপাশে তাজা ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ সৌরভ ছড়াচ্ছিল। এ সুঘ্রাণ সার্বিক বিবেচনায় সম্পূর্ণ নতুন কিন্তু জাদুময়ী ছিল। আমাদের কানে সুমধুর তানে গেয়ে চলা সঙ্গীত ভেসে আসছিল। আমার মনে হচ্ছিল, এ সুঘ্রাণ ও এ সঙ্গীত আমার নাক ও কানের মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি আমার শিরায় উপশিরায় গিয়ে পৌঁছতেছিল।

এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ আমি থেমে গেলাম এবং চোখ বন্ধ করে পরিবেশের মাঝে হারিয়ে গেলাম। সালেহ আমার তন্ময়তা দেখে বললো–

"এ পাহাড়ের নাম আ'রাফ। এসো এর চারপাশে চক্কর লাগাই। এর ফাঁকে ফাঁকে আমি তোমাকে এখানকার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত করব।" উত্তর না দিয়েই আমি জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির মতো সালেহের কথায় সম্মতি প্রকাশ করলাম। আমরা ডান দিক থেকে চক্কর শুরু করলাম। খানিক দূরে যেতেই চোখে পড়লো পাহাড়ের এক অংশে লেখা 'আদমের উম্মত'।

আমি সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম–

"এখানে কি আদম আলাইহিস সালাম আছেন?"

"না। সমস্ত নবীগণ পাহাড়ের উপরে উঁচু অংশে অবস্থান করছেন। তুমি দেখবে, এমনভাবে একটু পরপরই বিভিন্ন নবী এবং তার উম্মতের নাম লেখা থাকবে। প্রত্যেক উম্মতের মুক্তিপ্রাপ্ত লোক..... তোমার মতো মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষ....এখানে এসে একত্রিত হবে।" সে উত্তর দিল।

"আমাকে কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য নির্ধারিত জায়গায় যেতে হবে?" তার কথা শুনে আমি আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করলাম। সালেহ না সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো–

"মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেরা এ সমস্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে এবং বিচার দিবস সমাপান্তে এখান থেকেই জান্নাতে চলে যাবে। তোমাকে পাহাড়ের উপরে যেতে হবে। সেখানে সমস্ত নবীগণ এবং তাদের উম্মতের যে সকল লোক তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানুষের মাঝে হক ও সত্যের বার্তা পৌঁছিয়েছে তারা অবস্থান করছে। তারা এখানে থেকেই আল্লাহর বিচারকার্য প্রত্যক্ষ করবে। মানুষের ব্যাপারে সাক্ষী দিতে তাদেরকে এখন থেকেই আহ্বান করা হবে। দুর্ভাগারা সবাই জাহান্নামের দিকে আর প্রত্যেক সফল ব্যক্তিই পাহাড়ের নিচে নিজ নিজ নবীর ক্যাম্পে আসতে থাকবে। এরপর প্রত্যেক উম্মত এখান থেকেই দলে দলে জান্নাতে যাবে। হাশরের মাঠে প্রদত্ত সকল সিদ্ধান্ত এখান থেকে সরাসরি অবলোকন করা যায়। জান্নাত এবং জাহান্নামও এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।"

আমরা এ কথোপকথন করছিলাম এবং এক এক করে সকল নবীর উম্মতদের ক্যাম্প অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। তখনো পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্যাম্পে হাতেগোনা কয়েকজন লোক ছিল।

আমি সালেহকে বললাম– "এখনো বোধ হয় সকল মানুষ আসেনি।"

সে বললো– "বিষয়টি আসলে তা না। অন্য নবীদের উম্মত মুক্তিপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যাই অতি অল্প। সবচে' বেশি মানুষ বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়ার সদস্য। এ দুই ক্যাম্পের লোকেরা এখনো আসেনি। তবে এ মুহূর্তে সেখানেও খুব বেশি লোক নেই। অল্পক্ষণের ভেতরেই জায়গা দুটি লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে। চলো এবার উপরে যাই। এ পাহাড়ে চক্কর লাগালে দীর্ঘ সময় নষ্ট হয়ে যাবে।"

.....

উঁচু স্থানে চড়ার আগ্রহ আমার বরাবরই প্রবল। কিন্তু এটা মনে হয় আমার জীবনের সবচে' অদ্ভুত উঁচু স্থান ছিল। বাহ্যত এটা ছিল অনেক উঁচু এবং আকাশচুম্বি একটি জায়গা। কিন্তু এখান থেকে আমরা জমিনকে এত স্পষ্ট দেখছিলাম যেন আমরা মাত্র কয়েক তলা উপরে দাঁড়িয়ে আছি। নিচ থেকে যে

জায়গাটিকে একটি চূড়ার মতো মনে হতো সেটি ছিল এক সমতল উঁচু ময়দান। এ সমতল ময়দানে একটু দূরে দূরে উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মিত ছিল। প্রাসাদগুলোতে কোনো দেয়াল ছিল না, আর না কোনো দরজা ছিল। তাই বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যেত। এখানে সবদিকেই রাজকীয় সেবক-সেবিকা ছিল। অতি মূল্যবান সিংহাসনে মাথায় মুকুট পরে বড় বড় ব্যক্তিত্বরা বসা ছিলেন। চন্দ্র বলয়ের মতো তাদেরকে ঘিরে অন্যান্য মর্যাদাবান ব্যক্তিরা রাজকীয় আসনে সমাসীন ছিল।

আমি সালেহকে এ উঁচু প্রাসাদগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে বললো–

"এগুলো বিভিন্ন নবীর অস্থায়ী বিশ্রামস্থল। এ হিসেবেই পাহাড়টিকে আরাফ বলা হয়। তুমি তো জান আরাফ অর্থ-মর্যাদাশীলদের সমারোহ।"

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ালাম। সে আবারো অনর্গল বলতে লাগলো–

"সিংহাসনে বসা ব্যক্তিগণ হলেন নবী-রাসূলগণ। তাদের চারপাশে যারা বসে আছেন তারা তাদের উম্মতের ছিদ্দীকীন এবং শুহাদা। ছিদ্দীকীন হলো, যারা নবী-রাসূলগণের জীবদ্দশায় তাদের সঙ্গ দিয়েছে। আর শুহাদা হলো, যারা নবীদের পর দ্বীনের দাওয়াতের বিস্তার ঘটিয়েছে। এরা সবাই পৃথিবীতে আল্লাহর জন্যই জীবনযাপন করেছে এবং আল্লাহর জন্যই মরেছে। তারই প্রতিদানস্বরূপ আজ যে সম্মান ও মর্যাদা তুমি দেখছ সে সম্মানে তারা ভূষিত হয়েছে।"

"নবী-রাসূলগণের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ কি আমার হবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সবার সাথে সাক্ষাৎ করার সময় তো হবে না। তবে কয়েকজনের সাথে অবশ্যই করতে পারবে।" সালেহ উত্তর দিল।

এরপর সে এক এক করে আল্লাহর বড় বড় নবী-রাসূলগণের সাথে আমাকে সাক্ষাৎ করানো শুরু করলো। সুমহান মর্যাদার অধিকারী নবী-রাসূলগণের সাথে আমি সাক্ষাৎ করতে থাকলাম। আদম, নূহ, হুদ, সালেহ, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, শুআইব, মুসা, হারুন, ইউনুস, দাউদ, সুলায়মান, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং নবী-রাসূলগণের জনক হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। সবাই আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়ে অভ্যর্থনা জানালেন ও মুবারকবাদ দিলেন।

এ মহান ব্যক্তিবর্গের সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতার পর আমরা সামনের দিকে রওয়ানা হলাম। কিন্তু আলাপচারিতার মাঝে আমি খেয়াল করলাম সবাই অভিন্ন চিন্তা ও ফিকিরে ব্যস্ত। রাস্তায় আমি সালেহকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললো–

"এ মুহূর্তে হাশরের মাঠে কী কেয়ামত বয়ে যাচ্ছে তোমার জানা নেই। মানবজাতির কী উপায় হবে তা নিয়ে এখন সকল নবীই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন।

আল্লাহর শাস্তি এত কঠিন যে, এ নবীদের কেউই চান না তার উম্মত ওই শাস্তির মুখোমুখি হোক; বরং সবাই চান যে, আল্লাহ তায়ালা সকলকেই মাফ করে দিন। কিন্তু এখন এর কোনো সম্ভাবনা নেই। আর এ ধরনের কোনো দুআ করারও অনুমতি নেই। শত শত বছর ধরে মানুষ লাঞ্ছনা ও অপদস্ততায় ভুগছে। আর এ মুহূর্তে হিসাব-নিকাশ শুরু হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।"

"শত শত বছর মানে? আমরা তো ভেতরে এসেছি সর্বোচ্চ দুয়েক ঘণ্টা হবে।" আশ্চর্য গলায় আমি বললাম।

"তোমার কাছেই এমন মনে হচ্ছে। আজকের দিনটি সফল ও মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের জন্যে মাত্র কয়েক ঘণ্টার সমান, পক্ষান্তরে বাইরে অবস্থানকারী পাপিষ্ঠদের জন্যে বিভীষিকাময় বিপদসঙ্কুল অন্তহীন অসীম দীর্ঘ এক দিন। বাইরে কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাপারটি তুমি এখনো বুঝবে না।"

আমি তার কথা হজম করতে পারলাম না। তবে আমি যে জগতে ছিলাম সেখানে তো সবকিছুই সম্ভব ছিল। আরো না জানি কত কত অদ্ভুত বিষয়ের সম্মুখীন আমাদের হতে হবে।

.....

মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ বৃত্তাকারে আদবের সাথে বসে আছেন। উম্মতে মুহাম্মদিয়ার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের থেকেও বিপুল সংখ্যক লোক উপস্থিত ছিল। ভক্ত অনুরক্তের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। বাহ্যত মনে হচ্ছিল সবকিছু ঠিকঠাক আছে, কিন্তু আমি অনুমান করলাম, এখানেও ঠিক একই ধরনের চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা ছড়িয়ে ছিল যা আমি পেছনে দেখে এসেছি।

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে দুআ করছেন। আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।" সালেহ পেছনের চেয়ারগুলোর দিকে যেতে যেতে বললো।

আমরা পেছনের দিকের চেয়ারে বসে গেলাম। সামনে কী হচ্ছে তা এখান থেকে বুঝা মুশকিল। আমি সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম–

"হিসাব নিকাশ কখন শুরু হবে?"

"আমি এর কী জানি! আর এর খবর তো কেউই জানে না।" সে উত্তর দিল।

তার কথা শুনে আমি চুপ হয়ে গেলাম। চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম। দীর্ঘক্ষণ পর আমার কানে সালেহের কণ্ঠ ভেসে এলো–

"আব্দুল্লাহ ওঠো। দেখো, তোমার সাথে কে সাক্ষাৎ করতে এসেছে।"

তার কণ্ঠ শুনে আমি হঠাৎ নিদ্রা ভেঙ্গে জাগ্রত হলাম। সামনে তাকিয়ে দেখি, অত্যন্ত অভিজাত ও মহান এক ব্যক্তি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তার চেহারায় মুচকি হাসি। চোখে মুখে ভালোবাসা ও প্রীতির ঝিলিক। সালেহ অতিরিক্ত কিছু বলার আগে তিনি নিজেই নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে নরম গলায় বললেন–

"আব্দুল্লাহ! মারহাবা। আমার নাম আবু বকর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি।"

এটা বলে তিনি তাঁর উভয় হাত প্রসারিত করে দিলেন। আমি প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাঁর সাথে কোলাকুলি করলাম। কোলাকুলি শেষে তিনি আমাকে মজলিস থেকে খানিকটা দূরে তুলনামূলক নীরব স্থানে নিয়ে সামনাসামনি চেয়ারে বসলেন। বসতেই আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম–

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমি কখন সাক্ষাৎ করতে পারব?"

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও দুআ প্রার্থনায় ব্যস্ত আছেন। তুমি তাঁর সাথে পরেও সাক্ষাৎ করতে পারবে।

গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি তোমাকে বলা দরকার তা হলো, মানুষের হিসাব-নিকাশ শুরু হওয়ার যে দুআ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে করেছিলেন তা কবুল হয়ে গেছে। ঠিক এ দুআ কবুলের মুহূর্তে তুমিও একটি দুআ করেছিলে। তুমি আবারো হাশরের মাঠে গিয়ে সেখানকার অবস্থা দেখতে চেয়েছিলে না? এর অনুমতি তুমি পেয়ে গেছ। খানিক পরেই হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। ওই মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি মানুষের অবস্থা দেখতে পারবে। এ বার্তাটি দিয়েই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

এ কথা শুনে আমার চেহারায় খুশিরা উল্লাসে মেতে ওঠল, যা দেখে স্বয়ং রাসূলের খলিফার চেহারায়ও মুচকি হাসির আভা ছড়িয়ে পড়লো। ছোট্ট বিরতির পর তিনি আবারো বলতে শুরু করলেন–

"বাইরের অবস্থা অতি ভয়াবহ। যদিও সালেহ তোমার সাথে থাকবে এরপরও তুমি এটি পান করে নাও। এ পানীয়টিই তোমাকে বাইরের তাবৎ কষ্ট ও যাতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।"

এটা বলেই তিনি তাঁর সামনে রাখা চকচকে সোনালি বর্ণের একটি গ্লাস আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি দু'হাত বাড়িয়ে গ্লাসটি তাঁর হাত থেকে নিলাম এবং পান করার উদ্দেশ্যে ঠোঁটে লাগালাম।

গ্লাসটি ঠোঁটে লাগাতেই অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটলো। যদিও আমি বিন্দুমাত্র পিপাসার্ত ছিলাম না, আর না আমার মাঝে কোনো কষ্ট বা উদ্বিগ্নতা ছিল, কিন্তু যে পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি আমি লাভ করেছি তা বোধহয় শত শত বছরের পিপাসার্ত ব্যক্তিও পানির প্রথম ঢোক পান করে অনুভব করতে পারে না। এ পানীয়র একেকটি ঢোক আমার কণ্ঠনালি অতিক্রম করতো আর স্বাদ, পরিতৃপ্তি, মিষ্টি ও শীতলতা ইত্যাদি শব্দগুলো তার এমনই বাস্তবতা নিয়ে আমার মাঝে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠতো, যার অভিজ্ঞতা আমার তো নেই-ই অন্য কোনো মানুষেরও নেই। এ পানীয়র প্রতিটি ফোঁটা আমার জিহ্বা থেকে কণ্ঠনালি, কণ্ঠনালি থেকে বুক, বুক থেকে পাকস্থলি পর্যন্ত নামতো আর আমার অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দুকে পরিতৃপ্ত করতো। আমার তো ইচ্ছে চেয়েছিল, এক ঢোকেই পুরো গ্লাস পান করে ফেলি; কিন্তু সামনে উপবিষ্ট মহান ব্যক্তিত্বের আদবের কারণে আমি এমনটি করতে পারিনি।

আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলাম–

"এ জিনিসটা কী?"

"এটা নতুন জীবন ও নতুন জগতের সর্বপ্রথম পরিচয়। এটা কাওছারের পেয়ালা। এটা পান করার পর হাশরের মাঠের গরম ও পিপাসার কারণে তুমি ক্লিষ্ট হবে না। তিনি মুচকি হেসে উত্তর দিলেন।"

কথাগুলো শুনেই আমার বুঝে এসে গেল, এ পানীয় কেন আমার মাঝে বর্ণনাতীত প্রভাব ফেলেছিল? এটা ছিল জান্নাতের কাওছার নহরের পানি। দুনিয়াতে এ পানীয়র যেসব গুণের কথা সব সময় শুনতাম সেগুলো পরিপূর্ণভাবে এতে বিদ্যমান ছিল। এ পানীয় পান করে আমি খুব ভালোভাবেই অনুমান করে নিলাম, জান্নাতের নেয়ামতগুলো কেমন হবে। অতীত জীবনে পানাহারের স্বাদ দুই জিনিসের মাঝে লুক্কায়িত ছিল। মানুষের প্রচণ্ড ক্ষুধা ও তৃষ্ণা লাগা এবং পানাহারের জন্যে তার অত্যন্ত সুস্বাদু বস্তুর ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া। কিন্তু জান্নাতের প্রতিটি বস্তু সত্তাগতভাবেই চূড়ান্ত সুস্বাদু। কোনোরূপ ক্ষুৎপিপাসা ছাড়াই মানুষকে ওই স্বাদ ও প্রশান্তি সরবরাহ করবে, যা একজন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ব্যক্তিই অর্জন করতে পারে। এখন আমার বুঝে আসলো, জান্নাতে না কোনো ক্ষুধা থাকবে, না পিপাসা। কিন্তু মানুষ তবু পরম আগ্রহভরে যত ইচ্ছা খাবে ও পান করবে। অতিরিক্ত খাওয়ার দ্বারা তার না কখনো বদহজম হবে, আর না সে বেঢপ মোটা হবে।

হাশরের মাঠ

আমরা দু'জন আবারো ক্ষিপ্রগতিতে হাঁটছিলাম। আরশের সীমানা থেকে বেরোতেই ভীষণ গরম ও শ্বাসরুদ্ধকর এক পরিবেশের মুখোমুখি হলাম। মনে হচ্ছিল যেন সূর্য নয় কোটি মাইল দূরত্ব থেকে মাত্র সোয়া মাইলের ব্যবধানে এসে আগুন বিচ্ছুরিত করছিল। বাতাস একদম বন্ধ ছিল। মানুষ ঘামে হাবুডুবু খাচ্ছিল। পানির নাম গন্ধও ছিল না। আমার মাঝে কাওছার সুধার প্রভাব বিরাজমান ছিল, অন্যথায় এমন পরিবেশে এক মুহূর্ত অতিবাহিত করাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছিলাম, অসংখ্য অগণিত মানুষ এ পরিবেশেই বিপন্ন অবস্থায় ঘুরাফেরা করছিল। চেহারায় আতঙ্ক, চোখে ভীতির ছাপ, চুল এলোমেলো, দেহে স্যাঁতসেঁতে ঘাম, পদযুগলে ফোসকা ও ফোসকা থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত এবং পানি। ভয় ও হতাশার এমন দৃশ্য আমি জীবনে এই প্রথম দেখলাম। সবদিকে ভীতি ও পেরেশানি বিরাজ করছে। সবাই নিজের চিন্তায় ব্যস্ত। আমার চোখ পরিচিত কাউকে ব্যগ্র হয়ে খুঁজে ফিরছে। আমি আমার পরিচিত যাকে সর্বপ্রথম দেখলাম তিনি ছিলেন উস্তাদ ফারহান আহমদ। তিনি দূর থেকে আমাকে দেখে অতি দ্রুত আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আমি সালেহকে বললাম– "তাঁকে থামাও। তিনি আমার উস্তাদ। আমি তাঁর সাথে কথা বলতে চাই।"

সে আমাকে ওই দিকে যেতে বারণ করলো এবং আক্ষেপস্বরে বললো–

"দেখো আব্দুল্লাহ! নিজের উস্তাদের বিপন্নতা আর বৃদ্ধি করো না। এ মুহূর্তে এখানে যদি কেউ লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয় তাহলে বুঝে নিবে এটা তার সাথে ইনসাফ হয়েছে। আল্লাহর কষ্টিপাথরে তার মাঝে ভেজাল ও অপবিত্রতা ধরা পড়েছে। এজন্যেই সে এ অবস্থাতে আছে।"

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম–

"কিন্তু আমরা তো আল্লাহর বন্দেগি, আখেরাতের চিন্তা এবং চারিত্রিক সকল বিষয়াবলি তাঁর কাছেই শিখেছিলাম।"

"শিখে থাকতে পার।" সালেহ চরম ঔদাসীন্যের সাথে উত্তর দিল।

"কিন্তু তার ইলম তাকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারেনি। দেখো! আল্লাহর সামনে কোনো ব্যক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তার ইলমের ভিত্তিতে হয় না; বরং তার

আমল-আখলাক ও নীতি-নৈতিকতাকেই মৌলিক মাপকাঠি বিচার করা হয়। ইলম তো মানুষকে এজন্যে দেওয়া হয়, যেন সে তার ব্যক্তিসত্তাকে সঠিক ছাঁচে নির্মাণ করতে পারে। এ ব্যক্তি নির্মাণেই যদি ত্রুটি থাকে তাহলে তো এটা ইলম নয়; বরং সেটা সাপ। কোনো কবি বলেন–

ইলম যদি থাকে দেহে সর্প হবে তবে,
দিলের ভেতর ঢুকলে ইলম বন্ধু হয়ে রবে।"

তোমার উস্তাদের সাথেও এমনটাই হয়েছে। সে একজন শক্তিমান লেখক ছিল। আলোচনাও করতো অনেক সুন্দর। কিন্তু তার চালচলন ও ক্রিয়াকর্মের সাথে তার কথার কোনো মিল ছিল না। মূলত তোমার উস্তাদ সাপ লালন করতো। ইলমের ওই সাপগুলোই আজ তাকে দংশন করছে। আজ এখানে তুমি এমন মানুষকে দেখবে যাদের কথা ও কাজে কোনো মিল ছিল না। আজ তাদের দেহাবয়ব ঠিক তেমনই দেখাবে যেমন তাদের ভেতরটা ছিল। স্মরণ রেখ! আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার বাহ্যিক আকৃতি ও কথা দিয়ে যাচাই করবেন না। তিনি আমল ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখবেন। বিশেষ করে জ্ঞানী ও ইলমওয়ালাদের হিসাব আজ বড় কঠিন হবে। যে সমস্ত বিষয় সাধারণ মানুষদের জন্যে মুক্তির উসিলা হয়ে যাবে সেগুলো আলেমদের জন্যে উসিলা হবে না।"

"কিন্তু তিনি তো বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন।" হার না মেনে আমি প্রশ্ন করলাম।

"তা ঠিক। কিন্তু এর প্রতিদান সে দুনিয়াতেই পেয়ে গেছে।" সালেহ উত্তর দিল।

"ইলমের ভুলত্রুটি মাফ হতে পারে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও আমলের দুর্বলতার কারণে ঠিক সেভাবেই ধৃত হতে হবে যেভাবে ধৃত হয়েছে তোমার উস্তাদ। এতক্ষণে এ দিন তো শুরু হয়ে গেছে। দেখো, শেষ পর্যন্ত কী হয়।"

আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি ছিলাম একজন এতিম। আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিল না। আমার আপনজন বলতে কেবল উস্তাদ ফারহান সাহেবই ছিলেন। তিনিই আমার দেখাশোনা করেছেন, আমাকে ইলম শিখিয়েছেন এবং বিয়ে করিয়েছেন। যে ব্যক্তিটি আমাকে বাপেরচে'ও বেশি উপকার করেছেন তাঁকে এমন বিপন্ন অবস্থায় দেখে আমি জবুথবু হয়ে গেলাম। এ অবস্থায় আমি আশপাশের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ কেটে পড়লাম।

আমার সামনে অগণিত মানুষ পড়তে পড়তে দৌড়ে পালাচ্ছে। জাহান্নামী শিখা তীব্রভাবে প্রজ্বলিত হওয়ার আওয়াজের সাথে সাথে মানুষের চিৎকার, কান্নাকাটি এবং হাহুতাশের শব্দও ময়দানে অনুরণিত হচ্ছে। মানুষ একে অন্যকে গালি দিচ্ছে, দোষারোপ করছে, ঝগড়া করছে, একজন আরেকজনের দিকে তেড়ে আসছে।

কেউ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। কেউ চিন্তা ও উদ্বিগ্নতায় সময় কাটাচ্ছে। কেউ চেহারা গোপন করার চেষ্টা করছে। কেউ লজ্জায় নীল হয়ে যাচ্ছে। কেউ পাথর দিয়ে মাথায় উপর্যুপরি আঘাত হানছে। কেউ বক্ষদেশ জখমে জর্জরিত করছে। কেউ নিজেকে অভিসম্পাত করছে। কেউ মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান, বন্ধু-বান্ধব ও অনুসৃতদেরকে নিজের এ বিপন্ন অবস্থার দায়ী সাব্যস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে অনর্গল বকে যাচ্ছে। এদের সবার সমস্যা একই। কেয়ামতের দিন এসে গেছে। কিন্তু তাদের কারোই এ দিনের কোনো প্রস্তুতি নেই। আজ তারা অন্যকে দোষারোপ করুক বা নিজেকে ভর্ৎসনা দিক, আহাজারি করুক বা ধৈর্য ধারণ করুক, ভাগ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে না। এখন তো কেবল রাজাধিরাজ আল্লাহ তায়ালার আত্মপ্রকাশের পালা, যার পর পরই হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে যাবে এবং পূর্ণ ইনসাফের সাথে প্রত্যেকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শোনানো হবে।

কিন্তু আমি এসব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যেন কত সময় এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার একদম নিকটে এক ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে ওঠলো, "হায়! এরচে' তো মরণই ভালো ছিল। এর থেকে তো কবরের অন্ধকার গর্তই শ্রেয় ছিল।"
চিৎকারের এ শব্দে আমার ঘোর কেটে গেল। আমি আমার পরিবেশে ফিরে এলাম। মুহূর্তের মধ্যেই আমার স্মৃতিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছু তাজা হয়ে গেল।

. . . . .

আমি মাথা ঘুরিয়ে সালেহের দিকে তাকালাম। তার চেহারা ছিল অমলিন। অবস্থার ভয়াবহতা তাকে মোটেও স্পর্শ করতে পারল না। সে অপলক আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি তার দিকে ফিরতেই সে বললো–

"আব্দুল্লাহ! তুমি হাশরের মাঠের অবস্থা দেখার আগ্রহ নিয়ে স্ব-স্থান ত্যাগ করে এখানে এসেছ। এমন আরো অনেক দৃশ্য তোমাকে দেখতে হবে। আমি তোমাকে অতিরিক্ত কষ্ট থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এখনই বলে দিচ্ছি, তোমার স্ত্রী, তিন মেয়ে ও দুই ছেলে থেকে এক মেয়ে লায়লা ও এক ছেলে জমশেদ এ মাঠেই লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়ে ঘুরে ফিরছে।"

সালেহের এ কথা শুনে আমার পায়ের নিচের মাটি সরে গেল। আমার মাথা চক্কর দিয়ে ওঠলো। মাথায় হাত দিয়ে আমি বসে পড়লাম। সালেহও আমার সাথে চুপচাপ মাটিতে বসে পড়লো।
আমার চোখ থেকে অনর্গল অশ্রু পড়ছিল। কিন্তু এখানে কারো প্রতি কারো কোনো তোয়াক্কা ছিল না। কেউ কেন বসে আছে? কেন দাঁড়িয়ে আছে? কেন শুয়ে আছে? কেন কাঁদছে? কেন চিৎকার করছে? কেন আহাজারি করছে? এগুলো কারো চিন্তার বিষয় না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। যেখানকার অবস্থা এমন

সেখানে কেন. কেউ আমাকে আমার চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করতে আসবে? মানুষ আমার পাশ দিয়ে নির্বিকার হেঁটে চলে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পর আমি সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম– "এখন উপায় কী হবে?"

"হিসাব-নিকাশ হবে। এরপরই চূড়ান্ত কোনো বিষয় সামনে আসবে।" সে পরিষ্কার উত্তর দিল।

এরপর ব্যাপারটি আরেকটু স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে বললো– "যে সকল লোক আজকের দিনে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিল এবং তদানুযায়ী আজীবন আমল করেছে, চাই সে ঈমান ও আখলাকের চাহিদা পূর্ণকারী সালেহীন হোক বা আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী ঈমানদার হোক, তাদের সবাইকে আজ জীবিত করার পূর্বেই মুক্তির সিদ্ধান্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সকল লোক জীবনে কেবল নেকীই অর্জন করেছিল। সৃষ্টি ও স্রষ্টার অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছিল। তাদের মৃত্যুই মুক্তির সুসংবাদ হয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। আর হাশরের দিন শুরু থেকেই আরাম ও স্বস্তি তাদের ভাগ্যে জুটেছে।"

"কিন্তু গুনাহ তো সবাই করে। এ সকল লোক কি জীবনে কোনো গুনাহ করেনি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, এরাও গুনাহ করেছিল। কিন্তু তাদের নেকীসমূহ তাদের ছোট-খাটো গুনাহগুলোকে শেষ করে দিয়েছে। আর কখনো যদি তারা বড় কোনো গুনাহ করেই বসতো তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ তওবার অশ্রু দিয়ে ওই গুনাহের দাগগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিত। এ ধরনের পূতপবিত্র সমস্ত মানুষ এ মুহূর্তে আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে অবস্থান করছে। নীতিগত একটা হিসাব তাদেরও নেওয়া হবে। এরপরই তাদের সফলতার ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হবে। এর বিপরীত যে সকল লোকের আমলনামায় কুফরী, শিরক, মুনাফেকী, হত্যা, যিনা-ধর্ষণ, ধর্মান্তরিত হওয়া, এতিমের মাল আত্মসাৎ করা এবং এ ধরনের অন্য কোনো ঈমান বিধ্বংসী অপরাধ থাকবে, ইনাসাফের নিক্তিতে তাদের গুনাহের পাল্লা ভারি হয়ে যাবে। তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি শুনিয়ে দেওয়া হবে।" সালেহ নিয়মের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলো।

"কিন্তু মানুষ তো এ দুই প্রান্তিকতার বাইরেও আছে। তাদের কী হবে ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

সালেহ উত্তর দিল– "হ্যাঁ এ দুই প্রান্তিকতার মাঝেও কিছু লোক আছে, যাদের কাছে ঈমানের সাথে সাথে কিছু না কিছু হলেও নেক আমলের পুঁজি রয়েছে। তারা দুনিয়াতে গুনাহ করতো, কিন্তু তওবা করতো না। এ সকল লোক নিজেদের

গুনাহের শাস্তিস্বরূপ হাশরের দিনের ভয়াবহতায় ক্লিষ্ট হবে। এরপর মুক্তির কোনো রাস্তা বের হবে। আজ যে সকল লোক হাশরের মাঠে বিপন্ন অবস্থায় ঘুরে ফিরছে তারা হয়তো পাপিষ্ঠ গুনাহগার, যাদেরকে অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে; নয়তো তারা এমন ঈমানদার যাদের আঁচলে লেপ্টে আছে গুনাহের কলঙ্ক। যার গুনাহ যত বেশি ও যত বড় আজ সে তত বেশি লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে। যাদের গুনাহ কম তারা হিসাবের শুরুতেই মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু আমি যেমনটা বলেছিলাম যে, দুনিয়ার জীবনের শত শত বছর ইতিমধ্যেই অতিবাহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এ সকল লোক হিসাবের শুরুতেও যদি মুক্তি পেয়ে যায় তবু হাশরের এ ভয়াবহতা দুনিয়ার পঞ্চাশ বছরের জীবনের গুনাহের স্বাদ ও নেশা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট। আর যাদের গুনাহ বেশি তাদের তো না-জানি আরো কত হাজার বছর এ বিভীষিকাময় পরিবেশে থাকতে হবে এবং এখানকার ভয়াবহতা সয়ে যেতে হবে।"

সালেহের কথা শুনে আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, দুনিয়াতে গুনাহ কত সহজ ও সাধারণ মনে হতো। অথচ আজ তা কত ভয়ঙ্কর মুসিবত হয়ে সামনে এসেছে। হায়! মানুষ যদি গুনাহকে ছোট মনে না করতো। বরং তওবা করাকে নিজের সার্বক্ষণিক অভ্যাস বানিয়ে নিত। গীবত, পরনিন্দা, অপচয়, লোকদেখানো মনোভাব এবং কাউকে অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি অপরাধগুলোকে যদি সাধারণ বিষয় মনে না করতো। আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের অধিকার খর্ব করাকে যদি তুচ্ছ জ্ঞান না করতো। আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে যদি বাঁচতো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতো তাহলে, আজ তাদের এমন দিন দেখতে হতো না, যে দিনে ছোট্ট একটি গুনাহের যৎসামান্য মজা শত শত বছরের লাঞ্ছনায় রূপ নিয়েছে।

এরপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম–

"আচ্ছা এ মুহূর্তে কি কারো এটা জানা আছে, তার মুক্তি মিলবে কি মিলবে-না? আর মিললে এর প্রক্রিয়া কী হবে ?"

সালেহ উত্তর দিল–

"মুসিবতটা মূলত এখানেই। এখানে কারো জানা নেই, তার ভবিষ্যৎ কেমন হবে। মুক্তির কোনো সম্ভাবনা আছে, না নাই ? আল্লাহ ছাড়া তা কেউ জানে না। এজন্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য নবীগণ অবিরাম দুআ করছিলেন, যেন হিসাব-নিকাশ দ্রুত শুরু হয়ে যায়। এর ফলে ঈমানদারদের এই লাভ হবে যে, তারা পাপিষ্ঠদের থেকে পৃথক হয়ে হিসাবের পর মুক্তি পেয়ে যাবে। তুমি জেনে থাকবে, ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট কারো জন্যে মুখ খোলার অনুমতি আজকের দিনে নেই। তবে খুশির সংবাদ হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দুআ কবুল হয়ে গেছে। এ সংবাদটি রাসূলের প্রধান খলিফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই তোমাকে দিয়েছিলেন।"

"কিন্তু এখনো পর্যন্ত তো হিসাব নিকাশ শুরু হতে দেখছি না।" আমি অস্থির গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

সালেহ বললো–

"দুআ কবুল হয়েছে। কিন্তু এর ওপর কাজ তো করবেন নিজ প্রজ্ঞা অনুযায়ী স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। হতে পারে এখনো পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মানুষ কবর থেকে উঠে এখানে এসে পৌঁছায়নি।"

"মানে? মানুষ এত বছরেও এখানে এসে পৌঁছায়নি?"

"তোমার কি মনে হয়, মানুষ আজ বিমান, ট্রেন, বাস কিংবা মোটরবাইকে চড়ে এখানে আসবে? আজ সবাই দৌড়ে দৌড়ে এখানে আসছে। ইসরাফীলের ফুৎকার মানুষকে এদিকেই আসতে বাধ্য করেছে। আজ সমুদ্র শুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, পাহাড় মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই মানুষ সোজা এখানে চলে আসছে। কিন্তু পদব্রজে আসতে একটু সময় তো লাগবেই। তবে সালেহিনদের সাথে ফেরেশতা ছিল, যারা তাদেরকে দ্রুত নিয়ে এসেছে। হিসাব নিকাশ যতক্ষণ শুরু না হবে ততক্ষণে আমরা এখানে উপস্থিত লোকদের অবস্থা দেখে নিতে পারি। তাছাড়া এখানে তো তুমি এজন্যেই এসেছিলে।"

সালেহ এ কথাগুলো বলে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে সামনের দিকে এগুতে লাগলো। ওই সময় তীব্র গরমে মুখমণ্ডল তেঁতিয়ে উঠেছিল। চারদিকে ধুলোবালি উড়ছিল। মানুষ পেরেশান হয়ে দলে দলে ও একা একা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিল। আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি পরিচিত কাউকে খুঁজে ফিরছিল। কিন্তু কোথাও কোনো পরিচিত মুখ নজরে পড়ছিল না। হঠাৎ কোনো এক দিক থেকে একটি মেয়ে এসে কোনো কিছু বুঝে ওঠা ও এক নজর তার চেহারাটা দেখার পূর্বেই আমার পায়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো। আমি কিছুটা পেরেশান দৃষ্টিতে সালেহের দিকে তাকালাম।

সে সরল গলায় মেয়েটিকে বললো– "উঠে দাঁড়াও।"

তার কথায় না-জানি কী প্রভাব ছিল, আমার শিরদাঁড়ার হাড্ডিতে মরমর শব্দ উঠে গেল। মেয়েটিও সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আমি মেয়েটির চেহারার দিকে তাকালাম। ভয়, আতঙ্ক ও চিন্তার কারণে তার চেহারায় কৃষ্ণ দাগ পড়ে গিয়েছিল। চেহারা ও চুলে ধুলাবালির আস্তর পড়ে ছিল। পিপাসার কারণে ঠোঁটগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। আর সন্ত্রস্ত চক্ষুদ্বয়ে ভয় ও আতঙ্ক খেলা করছিল।

কষ্টের এক বিশাল তরঙ্গ আমার হৃদয়তীরে আছড়ে পড়লো। আমি এ চেহারাটি যখন প্রথম বার দেখেছিলাম তখন মনের অজান্তেই বলে উঠেছিলাম, 'কুদৃষ্টি থেকে নিরাপদ থাকো'। লালচে শুভ্র গাত্রবর্ণ, উন্নত নাক, লম্বা মুখাবয়ব, গোলাপী ঠোঁট, নীলাভ চোখ এবং কুচকুচে কেশরাজি। আল্লাহ তায়ালা এ চেহারাটিকে কুদরতী সৌন্দর্য দিয়ে এমন কান্তিময় বানিয়েছিলেন যে, তার কোনো সাজগোছ বা প্রসাধনী ব্যবহারের প্রয়োজন পড়তো না। কিন্তু এ চেহারা আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ছিল। অতীতের সৌন্দর্য ও লাবণ্য হাশরের দিনের চিন্তা ও পেরেশানির সামনে একদম উবে গিয়েছিল। আপাদমস্তক আক্ষেপ, আতঙ্ক, কষ্ট ও লাঞ্ছনাবোধ দৃশ্যমান ছিল। সে আর কেউ নয়, সে ছিল আমার বড় বৌমা ও প্রিয় ছেলে জমশেদের স্ত্রী হেমা, যে রাজ্যের অনুতাপ ও হতাশা মাথায় নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

"আব্বুজী! আমাকে বাঁচান। আমি অনেক কষ্টে আছি। এখানকার পরিবেশ আমাকে শেষ করে ছাড়বে। সারা জীবন আমি কষ্ট চোখেও দেখিনি। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, আমার জীবনে কোনো দিন স্বস্তি বা শান্তির দেখা পাব না। আল্লাহর দোহাই, আমার ওপর একটু সদয় হন। আপনি আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় বান্দা। আমাকে বাঁচান। আব্বুজী......।"
এটুকু বলে হেমা হেঁচকি তুলে কাঁদতে লাগলো।
"জমশেদ কোথায়?" আমি চিন্তামগ্ন ভারী গলায় বললাম।

"সে এখানেই ছিল। সেও আপনাকে খুঁজছে। কিন্তু এত বিশাল মাঠে কাউকে খুঁজে বের করা অসম্ভব। তার অবস্থাও খুব শোচনীয়। সে আমার প্রতি অনেক রেগে ছিল। তার সাথে সাক্ষাৎ করতেই আমাকে সজোরে থাপ্পর মেরে সে বললো, 'তোর কারণেই আজ আমার এ অবস্থা'। আব্বুজী আমি অনেক খারাপ। আমি নিজেও ধ্বংস হয়েছি, আমার পরিবারকেও ধ্বংস করেছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে বাঁচান। আল্লাহর আযাব বড় ভয়ানক। আমি তা সহ্য করতে পারব না।"

হেমা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল আর তার চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। আমার হৃদয়ে পিতৃসুলভ বাৎসল্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠতে লাগলো। শত কিছুর পরেও পৃথিবীতে সে আমার পুত্রবধূ ছিল। আমি কিছু বলার আগেই সালেহ নরম গলায় বললো–
"এ কথাটা তো তোমার পৃথিবীতেই বোঝা উচিত ছিল। আজ তোমার বুদ্ধি সঠিক কাজ করছে। কিন্তু স্মরণ আছে কি পৃথিবীতে তুমি কী ছিলে? তোমার হয়তো স্মরণ না থাকতে পারে। আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।"

এটা বলেই সালেহ একটা ইশারা করলো। তৎক্ষণাৎ একটি দৃশ্য চোখের সামনে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠলো। এটা জমশেদ ও হেমার রুম ছিল। আমার কাছে মনে হলো, আশপাশের পরিবেশ পরিস্থিতি সব অদৃশ্য হয়ে গেল। আর আমি এ রুমে তাদের দু'জনের সাথে অবস্থান করছি এবং সরাসরি সবকিছু দেখছি ও শুনছি।

.....

"জমশেদ! আমি আর এদেশে থাকতে পারব না। চলো আমরা ইউরোপ আমেরিকার কোনো দেশে চলে যাই। এখন আমাদের ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে শিফট হয়ে যাওয়া উচিত।" ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে হেমা তার কাটা চুলগুলো আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললো। জমশেদ খাটে শুয়ে টি ভি দেখছিল। সে কোনো উত্তর দেয়নি।

"আমি কী বলেছি, তুমি শুনেছ জমশেদ?"

"হ্যাঁ, আমি শুনেছি। কিন্তু আমার গোটা পরিবার তো এখানে। আমি তাদেরকে ছেড়ে কীভাবে চলে যাব?"

"ঠিক সেভাবে যেভাবে তুমি তাদের বাড়ি ছেড়ে আমার সাথে থাকছ।"

"এখানকার কথা ভিন্ন। আমি সপ্তাহে একদিন গিয়ে তাদের সাথে দেখা করে আসতে পারি। তাছাড়া আমরা তো প্রতি বছর বিদেশে প্রমোদ-ভ্রমণে যেয়েই থাকি। এরপরও আমাদের বাইরে চলে যাওয়ার প্রয়োজনটা কিসের?"

"না, এখন ছেলে-মেয়ে বড় হচ্ছে। আমি চাই এরা বাইরের পরিবেশেই বেড়ে ওঠুক।"

"কিন্তু আমি চাই আমার সন্তানাদি আমার পিতামাতার সান্নিধ্যে ধন্য হোক। আমি তো আমার মা-বাবার কোনো ভালো গুণের অধিকারী হতেই পারিনি। কমপক্ষে আমার ছেলে-মেয়েগুলো যেন তাদের সান্নিধ্য পেয়ে ভালো হয়ে যায়, আমি তাই কামনা করি।"

"তাদের সান্নিধ্য থেকেই তো আমি আমার ছেলে-মেয়েদের বাঁচাতে চাচ্ছি। আমার কোনো সন্তানের গায়ে যদি তার দাদার বংশের হাওয়া লেগে যায় তাহলে তার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।"

আলাপচারিতার মাঝেই ক্রিং ক্রিং শব্দে ফোন বেজে ওঠলো। জমশেদ ফোন রিসিভ করলো। অপর প্রান্ত থেকে কিছু বলা হলো। জমশেদ 'ঠিক আছে' বলে রিসিভারটা নিচে রেখে দিল এবং হেমাকে সম্বোধন করে বললো-

"তোমার বাবা আমাকে নিচে ডাকছেন।" এরপর হেমার কথার উত্তর দিতে গিয়ে বললো-

"তুমি আমার মা বাবার ব্যাপারে এতটা নেগেটিভ চিন্তা কেন করো? তারা আমার মনোতুষ্টির জন্যেই তোমাকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অথচ তোমাদের

চালচলন ও ওঠাবসা তাদের মোটেও পছন্দ হতো না। তুমি আমাকে নিয়ে পৃথক হয়ে গেছ তবু তারা খারাপ কিছুই বলেনি...... ।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাদ দাও তো এ আলোচনা।" হেমা রাগের স্বরে বললো।

"আমার চালচলন তাদের পছন্দ ছিল না। কিন্তু তুমি আমার ভালোবাসায় পাগল হয়ে যাচ্ছিলে। তাই তারা বাধ্য হয়ে আমাকে বিয়ে করার জন্যে তোমায় অনুমতি দিয়েছে। তাদের থেকে পৃথক হয়ে এখানে তো তুমি সুন্দর জীবন কাটাচ্ছ। আব্বার ব্যবসার অংশীদার হয়ে গেছ। কোটি কোটি টাকা নিয়ে খেলা কর। জমশেদ আমাকে বিয়ে করে তুমি স্পষ্ট লাভেই রয়েছ। তুমি কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হওনি।"

"জানি না, তোমার কথা শুনে মাঝে মাঝে কেন যে আব্বুর কথাটি মনে পড়ে যায়। তিনি প্রায়শই বলে থাকেন, লাভ লোকসানের হিসাব জান্নাতে হবে।"

"এসব বাজে ধর্মকথা রাখ তো। এ সবের দ্বারা আমার ভীষণ রাগ পায়। কেয়ামত টেয়ামত বলতে কিচ্ছু হবে না। লাখ লাখ বছর ধরে পৃথিবীর নিয়ম এমন চলে আসছে:

If you are smart, powerful and wealthy you are the winner. All the others are loosers and idiots. And you know this judgment day is nothing but a rabbish.

তাছাড়া তোমার জন্যে মজার একটি তথ্য হলো, আমার আব্বা তার পীর সাহেব থেকে এ গ্যারান্টি নিয়ে রেখেছেন যে, কেয়ামতের দিন পীর সাহেব তাকে ক্ষমা করিয়ে দিবেন। আমার আব্বা এ বাবদ তাকে অনেক টাকা পয়সা প্রদান করে থাকেন।"

"হ্যাঁ, আমরা যেভাবে অবৈধ মুনাফা অর্জন, ব্যবসায়িক আইন লঙ্ঘন এবং অন্যান্য হারাম পদ্ধতিতে টাকা কামিয়ে থাকি এগুলো কোথাও তো পবিত্র করতে হবে! আমি সব জানি। তোমার বাবা ও চৌধুরি মুখতার সাহেব কয়েকটি ব্যবসায় অংশীদার আছেন। তারা দুই নাম্বারি ও ধোঁকাবাজি করে অর্থ উপার্জন করে থাকেন।"

"আচ্ছা........এতটাই হালাল হারামের চিন্তা! তাহলে ছেড়ে দাও আমার বাবার ব্যবসা।"

"ব্যবসা তো ছেড়ে দিতে পারব কিন্তু তোমাকে কীভাবে ছাড়ি। আমি খুব ভালো করেই জানি, এছাড়া অন্য কোনো চাকুরি করে আমি তোমার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবো না। তোমার ভালোবাসা আমাকে কোথায় না নামিয়েছে? অন্যথায় আমি যে বংশের লোক সে বংশে হালাল-হারাম সবকিছুর মানদণ্ড।"

"এজন্যেই তারা একদম সাধারণ জীবনযাপন করে। ভালো হয়েছে তুমি আমার সাথে চলে এসেছ। আর না হয় তো তুমিও তোমার ভাইদের মতো মোটরসাইকেলে চলাফেরা করতে এবং কোনো ফ্ল্যাটে হীনতার জীবন কাটিয়ে মরে যেতে।"

"জীবন ভালো কাটুক বা মন্দ, মরতে তো আমাদের হবেই। জানা নেই, আখেরাতে আমাদের সাথে কীরূপ আচরণ হবে?"

"নিশ্চিন্ত থাকো, কিছুই হবে না। সেখানেও আমরা ধুমধাম ও আরাম আয়েশেই থাকব। আমার বাবার পীর সাহেবের সামনে তো তোমার আল্লাহও কিছু বলতে পারবেন না।"

"এমন কুফরী কথা বলো না তো। আর আল্লাহ আমার কোথায় রইলেন। যখন আমি তার থাকলাম না, তিনি আমার কীভাবে থাকবেন?"

এ বাক্যটি বলতেই জমশেদের কণ্ঠ ভারী হয়ে এলো এবং চোখের কোণ ভিজে ওঠলো। কিন্তু বৌমা তার গড়িয়ে পড়া অশ্রু দেখতে পায়নি। তার পূর্ণ মনোযোগ ছিল আয়নার দিকে। এখন তার মেকআপ শেষ হয়েছে তাই ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে উঠতে উঠতে বললো–

"আচ্ছা রাখো এসব বাজে কথা। এবার নিচে চলো। আব্বা মনে হয় অপেক্ষা করছেন।"

. . . . .

সালেহ দ্বিতীয় বার ইঙ্গিত করলো। এতে চিত্রগুলো মুছে গেল। কিন্তু এর সাথে হেমার সকল আশা আকাঙ্ক্ষাও মাটি হয়ে গেল। সালেহ সেই কঠোর ও নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বললো–

"দেখলে তো, তোমার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ রেকর্ড হয়ে আছে। অতএব, হেমা তুমি যাও, গিয়ে তোমার পীর সাহেবকে খুঁজে বের করো; যে তোমার ক্ষমাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে দিতে পারবে। যার কথায় আল্লাহ তায়ালাও...."

সালেহের কথা অপূর্ণই রয়ে গেল। কিন্তু হেমার কথাগুলো বারবার বলতে গিয়ে সে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠল। এতে আমি নিজেও শিউরে উঠলাম। হেমার মধ্যেও চরম ভয় ও শঙ্কা কাজ করছিল। সালেহ আর কিছু বলার আগেই সে সেখান থেকে চিৎকার করতে করতে সরে গেল।

এ চিত্রে জমশেদকে দেখে আমি চরম অস্থিরতায় পড়ে গেলাম। তবে সেও তো হেমার মতো উদ্ভ্রান্ত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করবে! আমি ভাবতে লাগলাম, জমশেদ যদি এ অবস্থায় আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলে কী করবো! এ চিন্তায়ই আমি ডুবে ছিলাম, সালেহ আমার পিঠ চাপড়ে বললো–

"আসো, চলে যাই।"

কী ছিল এ পিঠ চাপড়ানোর মধ্যে? আমার ওপর ছেয়ে থাকা সব শঙ্কা থেকে নিমিষেই নিজেকে মুক্ত মনে হলো। আমি প্রফুল্ল চিত্তে তার সঙ্গে চলতে লাগলাম। আশপাশে ছিল শঙ্কাগ্রস্ত মানুষের অস্থির ছুটোছুটি। কিছু দূর যেতেই চৌধুরি মুখতার সাহেবকে আসতে দেখলাম। তিনি হয়তো আমাকে দেখেই এদিকে ছুটে আসছেন। চৌধুরি সাহেব ছিলেন আমার ছেলে জমশেদের শ্বশুরের বিজনেস পার্টনার। সেই সুবাদে তার সঙ্গে ছিল আমার সৌজন্য ভাব। কাছে

আসতেই তিনি সানন্দে আমার সঙ্গে আলিঙ্গনের জন্যে আগে বাড়লেন। সালেহ হাত বাড়িয়ে তার আশা হতাশায় পরিণত করে দিল। সে বললো–
"দূর থেকেই কথা বলুন।"

তার ভাবভঙ্গি ছিল একেবারেই বিরস। এতে আমিও যেন কেমন বদলে গেলাম। কিছুটা দূরত্ব বোধ করতে লাগলাম। এমন লাঞ্ছনার পরও চৌধুরি সাহেবের আবেগে এতটুকু হ্রাস পায়নি। তিনি তার কথা বলতে থাকলেন– "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আব্দুল্লাহ সাহেব! আপনি অবশ্যই আমাকে খুঁজতে আসবেন। আপনার তো মনে থাকার কথা! আমি একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলাম। তাতে আপনিও নামাজ পড়তেন। তাছাড়া অসহায় গরিবদের আমি সাহায্য করতাম।"
"আমার সব মনে আছে, চৌধুরি সাহেব!" আমি ধীর গলায় উত্তর দিলাম।

"তাহলে চলুন, আমার জন্যে একটু সুপারিশ করে দিন। দীর্ঘক্ষণ হলো অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করছি। যাকে দেখি, সেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কেউ না কোনো ভালো পরামর্শ দেয়, আর না একটু স্বাভাবিক হয়ে কথা বলে!"
শেষ কথাটি বলে সে সহসাই সালেহের দিকে ফিরে তাকালো। আমিও মাথা ঘুরিয়ে সালেহের দিকে ফিরলাম।
সালেহ একবার আমাকে দেখে নিয়ে চৌধুরি সাহেবকে লক্ষ্য করে বললো–

"অবশ্যই আপনি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। কিন্তু তা আল্লাহর জন্যে নয়। আপনার খ্যাতির জন্যে। আল্লাহর জন্যে অর্থ ব্যয় হলে মানুষের মাথা নিচু হয়ে আসে। ব্যবহারে কোমলতা আসে। স্বভাবে বিনয়ী ভাব আসে। অন্তরে ভয় ও নিজের দুর্বলতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আপনার ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনি নিজের প্রসিদ্ধি কামনা করতেন। দুনিয়াতে বেশ সুনাম আপনি কামিয়ে ছিলেন। এবার হিসাব দেওয়ার পালা, কীভাবে উপার্জন করেছিলেন এ সম্পদ। দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজে অর্থ ব্যয়ের কথা তো আপনার বেশ মনে আছে। একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর নৈকট্য অর্জনে তো কোটি কোটি টাকা আপনি তার পায়ে লুটিয়ে দিয়েছিলেন, এটা কেন বলছেন না? আপনার আমলনামায় ব্যভিচারের অপরাধ লেখা আছে। একবার নয়, বহুবার আপনি এ অপরাধে জড়িয়েছেন। বহু নারীর সঙ্গে আপনার দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে। দেশের বিখ্যাত চিত্র নায়িকা আর ফ্যাশন গার্লসদের সঙ্গে আপনার সখ্যতা ছিল। এসব অবৈধ ব্যয়ের প্রসঙ্গ বাদ থাক। আপনার আয়েও তো হারাম উপার্জনের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। ভালো মন্দ পণ্যের মিশ্রণ আপনি করতেন। আপনি অবৈধ মজুতদারি করতেন। মানুষকে চড়া মূল্যে পণ্য ক্রয়ে বাধ্য করতেন। বিদ্যুৎ বিল ফাঁকি দিতেন। ধোঁকাবাজি, কর্মচারীদের অধিকার হরণ ছিল আপনার ব্যবসার ভিত্তি।

নিজেকে একজন শীর্ষ ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেই আপনি একটি মিডিয়া গ্রুপ তৈরি করেছিলেন। আপনাদের ছিল দু'টি টিভি চ্যানেল। একটিতে মানুষকে খুশি রাখার জন্যে আপনারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচার করতেন। অন্যটিতে আর্ট ও এন্টারটেইনমেন্টের নামে সমাজে অশ্লীলতা ছড়াতেন। মানুষকে খুশি রাখাকেই আপনি জীবনের প্রধানতম সফলতা মনে করতেন। আফসোস! যদি আপনার এ বুঝটাও অর্জন হতো, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের সফলতা মানুষকে নয়; আল্লাহকে খুশি করার মধ্যেই নিহিত।"

সালেহ বিরতিহীন বলে যাচ্ছিল। তার মুখ থেকে যেন শব্দের খই ফুটছিল। তার দিকে মুখ তুলে তাকানো চৌধুরি সাহেবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অগত্যা পালানোর মতো কোনো সুযোগও তার ছিল না। অবনত মস্তকে তিনি শুনে যাচ্ছিলেন। সালেহের কঠোরতায় চৌধুরি সাহেবের চেহারায় বিষণ্নতা ছেয়ে গিয়েছিল। তারপরও সালেহ না থেমে আরো বলতে থাকলো-
"চৌধুরি সাহেব, একটু পেছনে তাকান না! আপনার প্রেয়সীও যে দাঁড়িয়ে আছে।"

চৌধুরি সাহেব বিস্মিত হয়ে পেছনে ফিরলেন। আমিও চোখ তুলে তার পেছনে তাকালাম। তার সামনে ছিল অত্যন্ত কুশ্রী কদাকার এক বৃদ্ধা। তার শরীর থেকে অসহ্য দুর্গন্ধ ভেসে আসছিল। সালেহ আমার পিঠে হাত রাখল। এতে দুর্গন্ধ আসা বন্ধ হয়ে গেল। চৌধুরি সাহেব তখনো দুর্গন্ধ অনুভব করছিলেন। এ কুশ্রী বৃদ্ধা চৌধুরি সাহেবকে চৌধুরি বলে ডাকতে ডাকতে তার একদম কাছে চলে আসলো। বৃদ্ধা কাছে চলে আসায় চৌধুরি সাহেব প্রথমে সন্ত্রস্ত হয়ে পেছনে সরে আসলেন। এরপর তিনি দৌড়ে পালাতে লাগলেন। এ নারীই এখন তার জন্যে আযাব হয়ে গেল। সেও তার পেছনে হাত উঁচু করে দৌড়াতে লাগলো।
"কে এ বৃদ্ধা?" তারা দূরে চলে যাওয়ার পর আমি সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম।

"এ হলো চৌধুরি সাহেবের অবৈধ প্রণয় এবং সেকালের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী এবং মডেল।" সালেহ এ কুশ্রী নারীর পরিচয় বলতেই আমি বিস্মিত হয়ে বললাম–
"কিন্তু সে তো ছিল অনিন্দ্য সুন্দরী। মানুষ তার সৌন্দর্যের উপমা দিত।"

"শুধু উপমাই নয়, তারা তাকে নিজেদের আদর্শ মনে করতো। এবার দেখুন মানুষের আদর্শের কী দশা হয়েছে! এ নারী নিজের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্যে অর্ধনগ্ন ছবি প্রচার করে সমাজে অশ্লীলতা ছড়ানোর কাজ করতো। আল্লাহ তায়ালার বিচার হলো, যাদের অন্তর্জগৎ সে জয় করে রেখেছিল, জাহান্নামে তাকে তাদের ওপর আযাবরূপে চাপিয়ে দেওয়া হবে।" সালেহ হাসতে হাসতে উত্তর দিল।
আমার মনে হলো, মানবতার ইতিহাসে অশ্লীলতার সয়লাব আমাদের সময়েই বেশি ছিল। টেলিভিশনের কারণে ঘরে ঘরে এসব চিত্র নায়িকার অভিশাপ ছড়িয়ে

পড়েছিল। সেকালে সামাজিকভাবেই এসব নারীকে উচ্চ মর্যাদায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চলচিত্র প্রযোজক এবং চ্যানেল মালিকদের জন্যে অর্থ উপার্জনের এরা ছিল সস্তা এবং সহজলভ্য পণ্য। তাদের অশ্লীল নৃত্য, চিত্তাকর্ষক অঙ্গভঙ্গি এবং অর্ধনগ্ন দেহ প্রদর্শন করে তারা সম্পদের পাহাড় গড়ত। যুবকরা ছিল এসবে মত্ত। নিজেদের হবু স্ত্রীদের মধ্যেও তারা এসবের চিত্র এবং ছাপ খুঁজত। মেয়েরাও তাদের মতো পোশাকে নিজেদের সৌন্দর্যের রহস্য তালাশ করতো। তাদের কারণেই অত্যন্ত ভদ্র ও সুশীল; কিন্তু রূপলাবণ্যে সাধারণ এমন অনেক মেয়েই সমাজে মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। বাড়ির আঙ্গিনার স্বল্প পরিসরে এমন কত নারীর জীবন-বসন্ত পার হয়ে হৈমন্তিক শুভ্রতা এসে যেত তার কেশগুচ্ছে। পারিবারিক ঐতিহ্যের চাদরে সমাজের নিগ্রহের কলঙ্ক চাপিয়ে কতজন যে নীরবে নিভৃতে দুনিয়া থেকে চলে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই।

আমার চেহারায় কষ্টের ছাপ ছিল স্পষ্ট। সালেহ তা ধরে ফেলল। আমার হাত ধরে সে একদিকে হাঁটতে লাগলো। কিছু দূর গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বললো–

"তোমার এ কষ্ট দূর করার ব্যবস্থাও আল্লাহ তায়ালা করে রেখেছেন। তার আগে ফেলে আসা দুনিয়ার কিছু চিত্র দেখে নাও, এটাই ভালো হবে।"

তার কথা শেষ হতেই আমার সামনে কিছু চিত্র ভেসে আসতে লাগলো। আমার মনে হলো, এসব দৃশ্যের সঙ্গে আমিও জুড়ে আছি অত্যন্ত মজবুতভাবে। আমি খুব অনায়াসেই সব কিছু বুঝতে পারছিলাম।

. . . . .

জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো ঘরের ভেতর আছড়ে পড়ছিল। কলেজে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসছিল। এ হিমশীতল ঠাণ্ডায় শয্যা ত্যাগ, ঘর থেকে বের হওয়া, কলেজের প্রস্তুতি নেওয়ার সাহস শায়েস্তা করতে পারছিল না। শায়েস্তা সাধারণত ফজর নামাজ পড়ে কিছুক্ষণ পড়ালেখায় ব্যস্ত থাকে। এরপর কলেজের প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু আজ সে ফজর নামাজ পড়েই আবার শুয়ে পড়েছে। রাত থেকেই তার শরীর কিছুটা খারাপ।

"না, কলেজে আমি যাবই। অন্যথা ছাত্রদের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। আব্বু আম্মুর জন্যে নাস্তাও তো তৈরি করতে হবে!"

ভাবতে ভাবতেই সে মনে সাহস সঞ্চার করে বিছানা ছেড়ে ওঠে পড়লো। ধীর পায়ে সে আব্বা আম্মার ঘরের দিকে গেল। নিঃশব্দে দরজা খুলে দেখলো তারা এখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তার চেহারায় এক প্রকার প্রশান্তির হাসি ফুটে উঠলো।

শায়েস্তা তার পুরোটা জীবন নিজ বাড়িতেই কাটিয়ে দিয়েছিল। তার শৈশব থেকেই বাবা শয্যাশায়ী। তিন বোনের মধ্যে সেই বড়। সেলাই কাজ করে অতি

কষ্টে তার মা সন্তানদেরকে পড়িয়েছেন। পড়ালেখা শেষ করে প্রথমে স্কুলে, পরে একটি প্রাইভেট কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেছে। সময়টা ছিল তার স্বপ্ন দেখার। পরমা সুন্দরী সে ছিল না। কিন্তু যৌবনই ভিন্ন এক সৌন্দর্য। আর তার জীবনে যৌবন বলতে ছিল ভারী এক দায়িত্ব। এতে স্বপ্ন দেখার কোনো সুযোগ ছিল না। আশার জাল বুনার মতো অবকাশ তার ছিল না। সংসার খরচ, বাড়ি ভাড়া, মা-বাবার চিকিৎসা এবং ছোট বোনদের লেখাপড়ার খরচ তাকেই বহন করতে হতো। ছোট বোনেরা ছিল অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী। বড় হলে তাদের বিবাহের প্রস্তাব আসতে থাকে। শায়েস্তা তাদের পথের কাঁটা হয়ে থাকে না। খুশি মনে তাদের সংসার জুড়ে দেয়। এসব দায়িত্ব পালনেই তার জীবন-সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে। বৃদ্ধ মা-বাবার বোঝা বহনের জন্যে এবার সে একা হয়ে যায়।

এ অবস্থায় আল্লাহ তায়ালাই ছিলেন তার এক মাত্র আশ্রয়। আল্লাহর প্রতি তার ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। আল্লাহর ভালোবাসার সামনে জীবনের কোনো বঞ্চনাই তার কাছে কষ্টের মনে হয়নি। শৈশব থেকেই সে ছিল নামাজ-রোজার ব্যাপারে যত্নশীল। আল্লাহর ভালোবাসার এ মিষ্টতা সে আব্দুল্লাহ সাহেবের বই পড়েই পেয়েছিল। আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে মগ্ন থাকা আর যুবক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভালোবাসার এ মিষ্টতা ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল তার জীবনের উদ্দেশ্য। সে ছিল একজন আদর্শ ও শিক্ষার্থীদের প্রিয় শিক্ষিকা। ছাত্ররা তার কথা গভীর মনোযোগের সাথে শুনত। শায়েস্তাও তাদেরকে আগ্রহ নিয়ে পড়াত। অজানা কোনো কারণে আজ তার হঠাৎ কেমন উদাস উদাস লাগছে। শরীর খারাপ থাকার কারণেই হয়তো এমন লাগছে। নাশতা শেষ করে সে আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কলেজের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। চেহারাটা একটু গভীরভাবেই দেখল। পড়ন্ত যৌবনের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিষণ্ন হাসি হেসেই সে নিজেকে বিড়বিড় করে বললো–

"শায়েস্তা! তুমি তো হেরে গেছ, নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কিছুই যে তোমার জীবনে জুটলো না!"

কথাটি বলতেই তার চোখ বন্ধ হয়ে এলো। হয়তো এটা তার পরাজয় স্বীকার। কিন্তু সাথে সাথেই উস্তাদ আব্দুল্লাহর একটি কথা তার কানে উপর্যুপরি আঘাত হানতে লাগলো–

"যার চুক্তি আল্লাহর সাথে, সে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।"

আরেকবার সে মুচকি হাসলো। চোখ খুলে শান্ত ভঙ্গিতে বললো–

"দেখি না কী হয়... আরো কত সময় তো এখনো পড়ে আছে।"

. . . . .

চিত্রগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি সালেহের দিকে তাকিয়ে বললাম–

"আমি তো এ মেয়েকে চিনি না?"
"একটু পরেই চিনবেন। আপনার লেখা অনেক দূর-দূরান্তের পাঠকের কাছে পৌঁছে যেত।"

সালেহ উত্তর দিল। এরপর সে আমার হাত ধরে একদিকে হাঁটতে লাগলো। অল্পক্ষণ পরেই আমরা এক জায়গায় পৌঁছলাম। এখানে আরশ পর্যন্ত পৌঁছতে সাধারণ মানুষের জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রচণ্ড শক্তিমত্তার অধিকারী ফেরেশতাদের এক জামাত। সালেহকে দেখেই তারা আমাদের জন্যে রাস্তা ছেড়ে দিল। একটু সামনে গিয়েই একটি দরজা দেখতে পেলাম। সালেহ দরজা খুললো। আমাকে হাতে ধরে সে ভেতরে প্রবেশ করলো। এ ছিল ভিন্ন আরেক জগতের প্রবেশপথ। এখানে এক পাশে হাশরের মাঠের ভয়াবহ অবস্থার চিত্র হুবহু দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ আমি সালেহকে বললাম–
"ঘুরতে ঘুরতে তো আমরা নবীগণের ক্যাম্পে চলে এলাম না?"
সালেহ মুচকি হেসে বললো–
"হ্যাঁ, তোমার কষ্ট এখানেই দূর হতে পারে।"
হাঁটতে হাঁটতে আমরা চমৎকার একটি তাঁবুর কাছে পৌঁছলাম। দরজায় অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ, জ্যোতির্ময় চেহারার এক লোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার একদম অপরিচিত। কাছে গিয়ে সালেহ তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো–

"ইনি আব্দুল্লাহ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ যমানার উম্মত। আর আপনি হলেন নুহুর। হযরত ইয়ারমিয়া আলাইহিস সালামের খুব কাছের সাথি। নুহুর, আপনি তো তার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছিলেন না?"
একজন বিশিষ্ট নবীর সাহাবীর আমার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা রইলো না। এতে আমি স্পষ্ট বুঝে ফেললাম, এখানে আমি কেন এসেছি।

নুহুরের সঙ্গে মুসাফাহার জন্যে আমি হাত বাড়ালাম। তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে আমাকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে নিলেন। এ অবস্থায়ই আমি তাকে বললাম-
"হযরত ইয়ারমিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার এখনো হয়নি। তবু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎই কম সম্মানের নয়। ইয়ারমিয়া আলাইহিস সালামের জীবন আমাকে সব সময় প্রেরণা যোগাত। তার সঙ্গে সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমি লালন করছি।"

এ কথা বলতেই বনি ইসরাইলের এ মহান নবীর গোটা জীবন সংগ্রাম আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠলো। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বনি ইসরাইল নৈতিক দিক থেকে চরম বিপর্যয়ের শিকার ছিল। আর এ কারণেই তারা তৎকালীন পরাশক্তি ইরাক সম্রাট বুখতে নসরের হাতে রাজনৈতিক পরাধীনতার আযাব ভোগ করেছিল।

তারপরও তাদের নেতৃস্থানীয়রা জাতির নৈতিক সংশোধনের পরিবর্তে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের ধ্যান-ধারণা সাধারণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল। নবী ইয়ারমিয়া আলাইহিস সালাম তাদের নৈতিক ও আত্মিক সমস্যাগুলো ধরিয়ে দেন। তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, পরাশক্তির সাথে টক্কর না লেগে আগে নিজেদেরকে সংশোধন করে নাও। কিন্তু জাতি সংশোধনের দিকে মনোযোগী না হয়ে বরং তাকেই কূপের ভেতর উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখলো। এরপর তারা বুখতে নসরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসলো। এর ফলে বুখতে নসর তাদের ওপর আল্লাহর আযাব হয়ে আবির্ভূত হলো। জেরুজালেম (বাইতুল মুকাদ্দাস অঞ্চল) তছনছ করে দিলো। ছয় লাখ ইহুদিকে হত্যা করলো। আর ছয় লাখকে দাস হিসেবে নিজেদের সাথে ইরাক নিয়ে গেল।

আমি এসবের মধ্যেই ডুবে ছিলাম। নুহুর আমার কথার উত্তর দিয়ে বললো–

"ইনশাআল্লাহ, খুব দ্রুতই তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে অনুমতি হলে আমি অন্য একজনকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবো।" বলেই সে আমার থেকে একটু দূরে সরে গেল। তাঁবুর দিকে ইঙ্গিত করে উচ্চ আওয়াজে বললো–

"একটু বাইরে এসে দেখো না, কে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন?"

নুহুরের আওয়াজের সাথে সাথেই তাঁবুর ভেতর থেকে এক যুবতী মেয়ে বের হয়ে তার বরাবর এসে দাঁড়ালো। সাজসজ্জায় মেয়েটিকে মনে হচ্ছিল কোনো রাজকন্যা। রূপ-সৌন্দর্যেও তাকে পরিজগতের কোনো পরির মতোই মনে হচ্ছিল। মাথা নুইয়ে মেয়েটি আমাকে সালাম করলো। আমাকে লক্ষ্য করে বললো–

"আপনি আমাকে চিনেন না। কিন্তু আপনি আমার উস্তাদ। এ সম্পর্কে আমি আপনার আধ্যাত্মিক সন্তান। আমার নাম শায়েস্তা। ভ্রষ্টতার অন্ধকারে আল্লাহর সত্য দ্বীনের আলোর সন্ধান আমি আপনার মাধ্যমে পেয়েছি। আল্লাহর সঙ্গে আপনিই আমাকে পরিচয় করিয়ে ছিলেন। আল্লাহর সাথে তার সৃষ্টির সম্পর্ক কেমন হবে, তা আমি আপনার থেকেই শিখে ছিলাম। আজ দেখুন! আল্লাহর কী অপার অনুগ্রহ, এখন আমি একজন মহান নবীর সাহাবীর স্ত্রী হতে যাচ্ছি।"

একটু আগেই সালেহ মেয়েটিকে দেখিয়ে ছিল। তার জীবনে যে পরিবর্তন এসেছিল, তা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে ছিলাম। কিন্তু তাকে এ অবস্থায় দেখে আমি সীমাহীন আনন্দ বোধ করলাম, যা ভাষায় প্রকাশের সাধ্য আমার নেই। আমি শায়েস্তাকে বললাম–

"আপনারা উভয়ে আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আশা করি, আপনাদের বিবাহের সময়ও আমাকে স্মরণ রাখবেন।"

"তা তো অবশ্যই, আপনাকে এখানে ডেকে আনার উদ্দেশ্যই ছিল নুহুরকে এটা বোঝানো যে, আমার সম্পর্ক কোনো সাধারণ মানুষের সঙ্গে নয়।" হাসতে হাসতে শায়েস্তা উত্তর দিল।

"তবে তো আপনি ভুল ব্যক্তি নির্বাচন করেছেন।"

আমি চট করে বলে ফেললাম। এরপর নুহুরের দিকে তাকিয়ে বললাম, "শায়েস্তার কথা কিন্তু ভুল নয়। তার পক্ষের লোকেরা সাধারণ কেউ নয়। আর তা তো হতেও পারে না। শায়েস্তা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার সদস্য। আরবি নবীর সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে যাওয়ার পর তার পিতৃ সম্পর্ক সাধারণ হতেই পারে না।"

এখানে এসে সালেহ মুখ খুললো। সে বললো–

"মান-মর্যাদা নিয়ে আপনাদের এ ঝগড়ার মীমাংসা পরে হবে। আপাতত আব্দুল্লাহকে এখন চলে যেতে হবে। আমাদেরকে অনুমতি দিন।"

নুহুর ও শায়েস্তার অনুমতি নিয়ে আমরা সেখান থেকে বিদায় হলাম। ফেরার পথে সালেহ আমাকে বললো–

"হলো তো তোমার কষ্টের সমাপ্তি?"

বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের যে বর্ষণ এতক্ষণ দেখছিলাম, এতে আমি বাক শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি চুপ করে থাকলাম। সালেহ অবিরত বলে যেতে থাকলো–

"মেয়েটি তার ধৈর্যের কারণে আজ এ মর্যাদা লাভ করেছে। আল্লাহ তায়ালা মেয়েটিকে কঠিন এক জীবন এবং সাধারণ গড়ন দিয়ে পরীক্ষা করে ছিলেন। কিন্তু সে বঞ্চিত হয়েও ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং আল্লাহর আনুগত্যের পথে অবিচল ছিল। আজকের অবস্থা তো তুমি দেখলে, ফেলে আসা জীবনে সে ছিল বঞ্চিত। তার ধৈর্য তাকে কী মহান পুরস্কারের উপযুক্ত করে তুলেছে!"

চলতে চলতে আমি হঠাৎ থেমে গেলাম। আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশ দেখলাম। আকাশের মালিককে দেখলাম। এরপর মাথা অবনত করে ফেললাম।

নাঈমা

হাঁটতে হাঁটতে আমরা ওই দরজার নিকটে চলে এলাম যেখান থেকে হাশরের ময়দানে যাওয়ার রাস্তা ছিল। আমি সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম– "আমাদের কি আবার হাশরের মাঠে ফিরে যেতে হবে?"

"কেন, সেখানে যাওয়ার আগ্রহ কি মিটে গেছে ?" সে কণ্ঠে খেদ মিশিয়ে বললো।

"না, এমনিই বললাম। ভাবছিলাম, এখানে যেহেতু এসে পড়েছি পরিবারের লোকদের সাথে দেখা করে নেব। আমরা প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম তখন তুমি আমাকে নিয়ে সোজা উপরে চলে গিয়েছিলে। এতক্ষণে তো আমার পরিবারের লোকেরা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ক্যাম্পে পৌঁছে গেছে, তাই না ?"

"তোমরা মানুষেরা নিজেদের আগ্রহ ভদ্রতার চাদরে মুড়িয়ে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে ঋদ্ধহস্ত। স্পষ্ট করে কেন বলো না যে, পরিবারের লোকদের সাথে দেখা করতে চাও। বার বার শুধু পরিবার পরিবার বলছ কেন ?"

সালেহ আমার কথায় হেসে হেসে মন্তব্য করায় আমি চুপসে গেলাম। এবার সে মুচকি হেসে বললো–

"লজ্জা পেয়ো না বন্ধু। আমরা সেদিকেই যাচ্ছি। তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি।"

আমরা যে জগতে ছিলাম সেখানে রাস্তা, সময় এবং জায়গা, সবকিছুর অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল। এজন্য সালেহের কথা শেষ হওয়া মাত্রই আমরা ওই পাহাড়ের নিকট চলে গেলাম যার চারপাশে সকল নবী-রাসূল এবং তাদের উম্মতদের তাঁবু স্থাপিত ছিল।

"সম্ভবত প্রথম বার এখানে আসার সময় আমি তোমাকে বলেছিলাম, এ পাহাড়ের নাম "আরাফ"। তুমি এর চূড়ায় উঠেছিলে। আর এ যে দেখো! উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ক্যাম্প অতি নিকটেই।"

আমরা পাহাড়ের যে অংশে ছিলাম তা ছিল বেশ প্রশস্ত। এজন্য এর ধারণ ক্ষমতা ছিল প্রচুর। কিন্তু এ পুরো জায়গাটিই তখন অগণিত লোকে ভরপুর ছিল। পাহাড়ের আশেপাশে এত লোকের ভিড় মনে হয় আর কোথাও ছিল না।

আমি সালেহকে লক্ষ্য করে বললাম–

"মনে হচ্ছে সকল মুসলমান এখানে চলে এসেছে।"

"না। এখানে তো অল্প কজন এসেছে। উম্মতে মুহাম্মদিয়ার সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। এজন্য এ উম্মতের নেককার ও ভালো মানুষের সংখ্যাও বিপুল। অন্যথা অধিকাংশ মুসলমান তো এখনো পর্যন্ত হাশরের মাঠে অস্থির ঘুরাফেরা করছে।"

"তাহলে আমার সমকালীন মুসলমানরাও তো এখানে থেকে থাকবে।"

"দুর্ভাগ্যবশত তোমার সমকালীনদের খুব কম লোকই এখানে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের শুরুর দিকের লোকেরা অনেক বড় সংখ্যায় এখানে উপস্থিত আছে। শেষ যমানার স্বল্প সংখ্যক লোকই এখানে আসতে পেরেছে। তোমার সমকালের অধিকাংশ মুসলমানই ছিল দুনিয়াপূজক ও দলান্ধ। এ দু'প্রকারের লোকই এ মুহূর্তে হাশরের মাঠে ঘুরছে ফিরছে। এজন্য এখানে তোমার পরিচিত লোক খুবই কম পাবে। যারা আছে তাদের সাথে তুমি জান্নাতে প্রবেশের পর দরবারে গিয়ে সাক্ষাৎ করে নিবে। এখানে তো আমরা তোমাকে তোমার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে কেবল তোমার চক্ষুদ্বয় শীতল করাব এবং এক্ষুনি ফিরে যাব।"

দরবারটা কী?

সালেহের কথার যে অংশটি আমি বুঝিনি সে ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম।

"হিসাব-নিকাশের পর সকল জান্নাতবাসী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহর সাথে তাদের একটি বৈঠক হবে এর নাম 'দরবার'। এ বৈঠকে সকল জান্নাতবাসীকে তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হবে। এখানে লোকেরা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আর এখানেই নেককার ও নৈকট্যশীলদেরকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হবে।"

আমার ইচ্ছে করছিল আরো কিছু জিজ্ঞেস করি। কিন্তু কথা বলতে বলতে আমার ক্যাম্পের একদম নিকটে চলে এলাম। জায়গাটি ছিল তাঁবু নির্মিত এক প্রশস্ত ও মুক্ত প্রাঙ্গণ। এ প্রাঙ্গণে লোকদের ক্যাম্প বিভিন্ন যুগ অনুপাতে বণ্টিত ছিল। অনেককেই দেখলাম তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে পরস্পরে কথা বলছে। এখানেই আমার অনেক সাথি-সঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধব নজরে পড়লো। এরা দ্বীনের দাওয়াতের কাজে আমাকে ভরপুর সঙ্গ দিয়েছিল। এদেরকে দেখে আমি বর্ণনাতীত খুশি হলাম। এরা ঐ সকল লোক যারা, নিজেদের যৌবন, নিজেদের ক্যারিয়ার এবং নিজেদের বংশমর্যাদা ও মনোবাসনাকে কখনো মাথায় চড়তে দেয়নি। বরং এগুলোকে পায়ে দলে নিজের সময়, যোগ্যতা, টাকা-পয়সা এবং জযবাকে আল্লাহর দ্বীনের জন্যে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিল। এরই ফলস্বরূপ আজ এ সকল লোক চিরস্থায়ী সফলতাকে সর্বাগ্রে লুফে নিয়েছে, যে সফলতার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দুনিয়াতে দেওয়া হয়েছিল। এখানেই আমরা মুসলিম ইতিহাসের

অনেক বরেণ্য ব্যক্তিদের দেখতে পেলাম। আমরা যেদিক দিয়েই অতিক্রম করতাম লোকদেরকে সালাম দিয়ে দিয়ে যেতাম। প্রত্যেক ব্যক্তিই আমাদেরকে তাদের তাঁবুতে গিয়ে বসা এবং কিছু খাওয়ার দাওয়াত দিল।

ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিটি দাওয়াতই সালেহ প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে আমি সবার সাথেই পরবর্তীতে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছি।

রাস্তায় সালেহ বলতে লাগলো–

"এদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিই এর উপযুক্ত যে, তাঁর কাছে একটু বসা হবে। তুমি ভালোই করছ, এদের অনেকের থেকেই একটু সময় নেওয়াও মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।"

এটা বলে সে এক মুহূর্ত থামলো। এরপর ভালোবাসা মাখা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো–

"সময় নেওয়া তো তোমার থেকেও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে আব্দুল্লাহ। তুমি এখনো পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারছো না যে, নতুন এ জগতে তুমি নিজেও বিশাল মর্যাদার অধিকারী হবে। বরং বাস্তবতা তো হলো, তুমি রব্বে কারীমের মাপকাঠিতে সদা সর্বদা অনেক বড় মাপের ব্যক্তিত্ব ছিলে।"

এটা বলে সালেহ থেমে গেল এবং আমায় জড়িয়ে ধরলো। এরপর আমার কানে ফিসফিস করে সে বললো আমার জন্যে মহা সৌভাগ্যের বিষয়। আমি আকাশের দিকে আমার দৃষ্টি প্রসারিত করলাম এবং আস্তে আস্তে উত্তর দিলাম–

সৌভাগ্যের বিষয় তো হলো আল্লাহর বন্দেগি করা। তার বান্দাদেরকে বন্দেগির দাওয়াত দেওয়া। এটা আমার সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তায়ালা বালির তুচ্ছ একটি কণাকে এমন খেদমতের সুযোগ দান করেছেন।

এটুকু বলতেই শুকর ও কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা নুয়ে পড়লো এবং চোখ থেকে অশ্রু বইতে শুরু করলো।

"হ্যাঁ, কথা এটাই ঠিক। আল্লাহ তায়ালাই ঐ সত্তা যিনি তুচ্ছ বস্তুকে দামি বানান। হীন ও অসম্মানী ব্যক্তিকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেন। তুমি যদি সূর্যের ন্যায় চমকাও তবে এটা হবে আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু এ অনুগ্রহ তো তিনি তার ইবাদতকারীদের ওপরই করে থাকেন। অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং গাফেলদের ওপর নয়।

আমরা আবারো হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমরা উন্নত ও দৃষ্টিনন্দন এক তাঁবুর কাছে পৌঁছে গেলাম। আমার হৃদয়ের স্পন্দন বেড়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে সালেহ বললো–

নাঈমা কি তোমার স্ত্রীর নাম?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। সালেহ্ আঙুলের ইশারায় বললো-
"সে এ তাঁবুতে আছে।"
সে কি জানতো যে, আমি এখানে আসব? অস্থির চিত্তে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।
"না।" সরল গলায় জবাব দিল সালেহ । এরপর হাতে ইশারা করে বললো–
এটা তোমার আবাস।

আমি মন্থর গতিতে চলতে চলতে তাঁবুর একদম নিকটে চলে এলাম এবং সালাম দিয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। ভেতর থেকে একটি আওয়াজ আসলো যা শ্রবণে আমার হৃদয়ের স্পন্দন আরো তীব্রতর হয়ে গেল।
আপনি কে?
আব্দুল্লাহ।

আমার মুখ থেকে আব্দুল্লাহ নামটি বের হতেই পর্দা উঠে গেল এবং সমগ্র দুনিয়া আঁধারে ছেয়ে গেল। কোথাও খানিকটা আলো যদি থেকে থাকে তা একটি চেহারাতেই আছে যা আমার সামনে ছিল।
সময়, যুগ, শতাব্দী এবং মুহূর্ত সব স্ব-স্ব স্থানে থেমে গেল। আমি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে অপলক নেত্রে তাকে দেখতে গেলাম।
সর্বশেষ আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল জীবনের গোধূলি বেলায়, যখন প্রীতি, ভালোবাসা, সৌন্দর্য বা যৌবন কোনো কিছুরই প্রয়োজন থাকে না।

নাঈমা তার জীবনের সকল কামনা-বাসনা ও স্বপ্ন-সাধনা আমার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল। সে টগবগে যৌবনের মুহূর্তেও তখন আমাকে সঙ্গ দিয়েছে যখন আমি আরাম আয়েশের জিন্দেগি ছেড়ে দিয়ে কণ্টকাকীর্ণ এক রাস্তা বেছে নিয়েছিলাম। এরপরও জীবনের সুখ-দুঃখের প্রতিটি মুহূর্তে আনন্দ বেদনার প্রতিটি ক্ষণে সর্বশক্তি নিয়ে সে আমার সাথে থেকেছে।

অবশেষে মৃত্যু আমাদের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে দিল। কিন্তু আজ মৃত্যুর এ অস্থায়ী আবরণ যখন সরে গেল তখন আমার সামনে চাঁদের আলো, তারকারাজির চমক, সূর্যের কিরণ, ফুলের সৌরভ, শিশির-স্নাত দূর্বাঘাসের মোহময়তা, সকালবেলার স্নিগ্ধ আলো এবং গোধূলিবেলার রক্তিম আভা সবকিছু এ একটি মাত্র চেহারায় মূর্ত হয়ে ওঠলো। বহু বছরের সঙ্গত্ব ও সখ্যতাকে আমি কয়েক মুহূর্তেই হাতড়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম। নাঈমার চোখের কোণে অশ্রু চিকচিক করতে লাগলো। এ অশ্রু ধীরে ধীরে তার গাল বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলো। আমি হাত বাড়িয়ে আলতো করে তার গাল থেকে অশ্রু মুছে দিলাম।
আর তার হাত দুটো আমার হাতে মৃদু চেপে ধরে বললাম–

আমি বলেছিলাম না একটু অপেক্ষা করতে হবে আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে। এ যুদ্ধে আমরাই বিজয়ী হবো। সে বললো– আমি কবে আপনার কথা বিশ্বাস করিনি। আর আজ তো আমার বিশ্বাস বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। আমার তো এমন মনে হচ্ছে যে, আপনি অল্পক্ষণের জন্যে ঘরের বাইরে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসেছেন। আমরা একটু ধৈর্য ধারণ করেছি। কিন্তু এতে বিশাল যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গেছি।

নাঈমা! আমাদেরই তো জেতার কথা। আল্লাহ তায়ালা কখনো পরাভূত হন না। আল্লাহওয়ালারাও পরাভূত হয় না। দুনিয়াতে তারা পশ্চাৎপদ থাকতে পারে কিন্তু আখেরাতে তারাই সর্বদা অগ্রগামী হয়ে থাকে।

প্রশ্নটি করে নাঈমা চোখ বন্ধ করে ফেলল। সম্ভবত সে কল্পনার চোখ দিয়ে জান্নাতের ঐ জগৎকে অনুভব করছিল যা এখনই শুরু হতে যাচ্ছে।

আমরা আল্লাহর বাণীকে ব্যাপক করার লক্ষ্যে আমাদের ধ্বংসশীল, ক্ষণস্থায়ী জীবন কাজে লাগিয়েছি। এর বিনিময় এখন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে চিরস্থায়ী জীবনে সফলতা ও কামিয়াবি দান করবেন। এটা বলে আমিও চোখ বন্ধ করলাম। আমার সামনে আমার কষ্ট পরিশ্রম ও মেহনত মুজাহাদায় ভরপুর জীবনের এক একটি মুহূর্ত এসে হাজির হচ্ছিল। আমি আমার যৌবনের সবচে' উত্তম সময়টা আল্লাহর দ্বীনের খেদমতের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলাম। পৌঢ়কালের সমস্ত যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা এবং বৃদ্ধকালের সর্বশেষ শক্তি সামর্থটুকুও আমি এ রাস্তায় ব্যয় করেছি। আমি ছিলাম অসাধারণ যোগ্যতা ও বিরল মেধাবী একজন ব্যক্তি। দুনিয়ার জীবনকে মাকসাদ বানিয়ে নিয়ে উন্নতি ও অগ্রগতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা আমার জন্য ছিল অত্যন্ত সহজসাধ্য বিষয়। কিন্তু আমি স্থির করে নিয়েছিলাম, ক্যারিয়ার, সম্পত্তি মান-মর্যাদা এবং সম্মান সুখ্যাতি যদি অর্জন করতেই হয় তবে তা জান্নাতেই অর্জন করব। জীবনে আমি কেবল কুপ্রবৃত্তির ময়দানেই নিজের সাথে যুদ্ধ করেছি এমন নয় বরং উগ্রপন্থি মনোভাব ও অযাচিত মনোবাসনার সাথেও নিরন্তর লড়াই করেছি। সাম্প্রদায়িকতা, বরেণ্যপূজা এবং উগ্রপন্থা আমাকে কখনো গ্রাস করতে পারেনি। আল্লাহর দ্বীনকে সর্বদা ঈমানদারি এবং সুস্থ যুক্তির আলোকে বুঝেছি। অতঃপর ইখলাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে তার ওপর আমল করেছি। তার দ্বীনকে দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছি। দ্বীন প্রচারের এ রাস্তায় কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে কখনো পাত্তা দেইনি। এ সফরে আল্লাহ তায়ালা আমাকে সবচে' বড় সহযোগিতা যা করেছেন তা হলো, নাঈমার নির্মল ভালোবাসা ও নিঃস্বার্থ সঙ্গদান। সে সর্ব অবস্থায় আমাকে লড়ে যাওয়ার উদ্দীপনা যুগিয়েছে। আর তখন আমরা দু'জনই

শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলাম। দুঃখ-কষ্ট চুকে গিয়েছিল, সময়টা ছিল উদযাপনের। আমরা এ অবস্থাতেই ছিলাম, সালেহ খকখক করে কাশির আওয়াজ দিয়ে নিজের উপস্থিতির জানান দিল এবং বললো–

'আপনারা বিস্তারিত আলোচনা পরে করবেন, এখন চলে যেতে হবে।'

তার কথা শুনে আমি এ জগতে ফিরে এলাম, আমি এ কথা শুনে সালেহকে পরিচয় করিয়ে দিলাম–

'ইনি হলেন সালেহ!' আমি হাসতে হাসতে আরেকটু বাড়িয়ে বললাম- 'নাছোড়বান্দা। একটি মুহূর্তের জন্যও আমাকে একা ছাড়তে রাজি নন। নাঈমা সালেহের দিকে তাকিয়ে বললো–

'আমি উনাকে চিনি। তিনিই আমাকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন। আর তখনই তিনি আপনার ব্যাপারে আমাকে বলে দিয়েছিলেন অন্যথা আমি অনেক চিন্তিত থাকতাম।'

আমি সালেহের দিকে ফিরে বললাম–

'তুমি কবে আমার থেকে পৃথক হয়েছিলে যে, নাঈমাকে এখানে রেখে যেতে এসেছিলে?'

'তোমার বোধ হয় স্মরণ নেই। যখন তুমি উপরে বসে রব্বে কারীমের কাছ থেকে হাশরের মাঠে ঘোরাফেরা করার অনুমতি নিচ্ছিলে তখন আমি তোমার নিকট থেকে ওঠে গিয়েছিলাম।

আব্দুল্লাহ! এটা তোমার দুর্বলতা এবং শক্তিও যে, তুমি যখন আল্লাহর সাথে থাক, তখন আশপাশের কোনো হুঁশ তোমার থাকে না।'

'আমার হুঁশ তো একটু আগেও ছিল না। কিন্তু ওই সময় তো তুমি স্থান ত্যাগ করোনি।'

'হ্যাঁ, আমি যদি সরে যেতাম তাহলে তোমার সাথে পরবর্তী সাক্ষাৎ হাশর দিবসের পরেই হতো। এমননিতেই তোমরা মানুষরা হলে বড় অকৃতজ্ঞ এবং মেধাহীন। তুমি কি ভুলে গেছ এখন তোমাকে যেতে হবে কোথায়?

'উফ নাঈমা! আমাদের চলে যেতে হবে। তুমি এখানেই থেকো। আমি খানিক বাদেই চলে আসব।'

'কিন্তু আমাদের সন্তানাদি।'

'তাও ঠিক। তুমি এখানে তাদেরকে তালাশ করতে থাকো। আশপাশেই কোথাও সন্ধান পেয়ে যাবে। অন্যথা একটু পরে আমি নিজেই সবাইকে নিয়ে চলে আসব। আর এখন আমাকে খুব দ্রুত হাশরের মাঠে ফিরে যেতে হবে।'

এ শেষ প্রশ্নটির পর এখানে অবস্থান করার অবকাশ আমার ছিল না। কারণ, আমাকে ঐ দুই বাচ্চার ব্যাপারেও কিছু বলতে হতো, যারা মূলত এখানে ছিল না, এটা বড় পীড়াদায়ক ও কষ্টকর কাজ।

নাঈমা কিছু বুঝে আর কিছু না বোঝার ভান করে মাথা নাড়ালো।

. . . . .

ফেরার পথে আমি সালেহকে বললাম-

'এখানকার জীবনে তো বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ভেঙে খান-খান হয়ে যাবে। কারো স্ত্রী পেছনে পড়ে যাবে। আর কারো স্বামী।'

'হ্যাঁ এসব তো হবেই। এগুলোর জায়গা তো ছিলই দুনিয়া যা গত হয়ে গেছে। সেখানে যে পিছে পড়ে গেছে সে পিছেই থাকবে। তবে এখানে কেউ একা থাকবে না। পেছনে পড়ে যাওয়াদের অপেক্ষায় কেউ থেমে থাকবে না। নতুন আত্মীয়-স্বজন জন্ম নেবে। নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। নতুন করে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে।'

'কিন্তু এখানে বংশ ও খানদান তো তেমন হবে না যেমনটি দুনিয়াতে হতো।'

'তুমি সঠিক বুঝেছ। দুনিয়াতে বংশের ধারা চালু করা হয়েছিল মানুষের কিছু দুর্বলতার কারণে। বাচ্চাদের লালন-পালন এবং বয়োবৃদ্ধদের দেখভাল ছিল এ বংশধারার মৌলিক এক উদ্দেশ্য। বংশের শক্তিবৃদ্ধি ও দৃঢ়তা অর্জনের লক্ষ্যে পুরুষদেরকে বংশের প্রধান বানানো হয়েছিল। এ বংশকে জুড়ে রাখার জন্যেই মহিলাদেরকে অনেক ব্যাপারে পুরুষদের চেয়ে দুর্বল বানানো হয়েছিল অথচ প্রকৃতিগতভাবে পুরুষকে মহিলাদের মুখাপেক্ষী করে রাখা হয়েছিল। তারা পুরুষদের জন্যে একদিকে ছিল নেয়ামত অন্যদিকে ছিল জরুরত। তাদেরকে ছাড়া দুনিয়ার নেযাম চলতে পারতো না। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা হবে ভিন্ন। মহিলারা পুরুষদের জন্যে নেয়ামত তো থাকবে কিন্তু তারা পুরুষদের মুখাপেক্ষী হবে না। এজন্যে তাদের সম্মান ও মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে যাবে।'

'এর অর্থ হলো এ জগতে মহিলা হওয়াটা অধিক লাভজনক। মহিলা যখন চাইবে পুরুষের মনোযোগ হাসিল করে নেবে। কিন্তু মহিলাদের ওপর পুরুষের কোনো অধিকার থাকবে না, অথচ সে তাদের মুখাপেক্ষী হবে।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা এমনই।'

'তাহলে আমরা পুরুষরা তো ক্ষতির মাঝে রয়ে গেলাম।'

'হ্যাঁ, তোমরা তো ক্ষতির মাঝেই থাকবে।'

'এটাতো বিশাল সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান কী?'

'জান্নাতের নতুন দুনিয়ায় সব সমস্যার সমাধান আছে। হুররাই হলো, এ সমস্যার সমাধান।'

'কিন্তু এর দ্বারা তো জান্নাতী রমণীদেরকে কয়েদির মতো মনে হবে।'

'না। এমন হবে না। হুরেরা নিজেদের অবস্থান এবং সৌন্দর্যের বিচারে কখনো জান্নাতী রমণীদের সমকক্ষ হতে পারবে না। এজন্য তারা কখনো জান্নাতী রমণীদের হিংসা ও ঈর্ষার কারণও হবে না। জান্নাতী রমণীরা নিজেদের আমলের কারণে হুরদের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী এবং উঁচু মর্যাদার মালিক থাকবে, এ ব্যাপারে তাদের কোনো পরোয়া থাকবে না যে, তাদের স্বামীর আর কী মনোবাসনা ও চাহিদা রয়েছে।

এমনিতেই জান্নাত তো মানুষদের নয় আল্লাহর দুনিয়া। তুমি কি জান মানুষদের এবং আল্লাহর দুনিয়ার মাঝে পার্থক্য কি?

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে চুপচাপ তাকে দেখতে থাকলাম।

নিজের প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই দিল—

"মানুষের দুনিয়ায় প্রেমিকা তার প্রেমিকের অন্য কোনো গার্লফ্রেন্ড থাকলে ওই গার্লফ্রেন্ডের প্রতি হিংসায় ফেটে পড়ে। কিন্তু প্রভুজগতে প্রেমিকের গার্লফ্রেন্ডের সাথে ও প্রেমিকার বেশ সখ্যতা থাকে।"

"জান্নাত সৎ ও পবিত্র মানুষদের বসবাসের জায়গা। তাদের সততা ও পবিত্রতা কোনো নিষিদ্ধ জযবাকে তাদের কাছে ও ভিড়তে দেবে না।" সালেহ আমার কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে একটি মৌলিক কথা বলে দিল।

এরপর এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বললো—

মূলত তুমি এখনো মানবজগতের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারনি। পেছনের দুনিয়া ছিল পরীক্ষার দুনিয়া। এজন্যে সেখানে ইতিবাচক জযবার সাথে নেতিবাচক জযবাও প্রদান করা হয়েছিল। এ নেতিবাচক জযবা প্রতিটা মানব সত্তার ভেতরই ছিল। প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মহিলার এ জিম্মাদারি ছিল যে, সে সর্বপ্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে থেকে ও নিজের নেতিবাচক জযবাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এটা হুবহু এমন যে, ঘাম এবং মল-মূত্র মানবদেহ থেকে নির্গত হওয়া নাপাকি, কিন্তু নির্দেশ ছিল সর্বপ্রকার নাপাকি থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা। এজন্যে তো তোমরা পানি দিয়ে গোসল ও পবিত্রতা অর্জন করতে। ঠিক তেমনি নেতিবাচক জযবাগুলোও ছিল ভেতর থেকে সৃষ্ট নাপাকি। রাগ-গোস্বা, মিথ্যা বলা, হিংসা, অহংকার, জুলুম-অত্যাচার এবং এ ধরনের অন্যান্য মন্দ স্বভাবগুলোর ব্যাপারে নির্দেশ ছিল যে, ধৈর্যের পানি দিয়ে এগুলোকে ধুয়ে ফেলো। মুমিন নারী-পুরুষ সারা জীবন এ ধরনের কষ্ট করে থাকে। কিন্তু আজ তাদেরকে এ ধরনের সকল কষ্ট থেকে পবিত্র করে দেওয়া হবে।'

'মানে?'

'মানে আজ না তো তাদের শরীর থেকে কোনো নাপাক জিনিস নির্গত হবে। আর না তাদের মনে কোনো নেতিবাচক চিন্তা ও মনোবাসনার উদয় হবে। জান্নাত সুশীল ও শালীন ব্যক্তিদের বসবাসের এক মনোরম আবাস, যেখানে অশালীন কোনো চিন্তাচেতনা বাকি থাকবে না।'

'আমার ধারণায় এ আলোচনা থেকে মৌলিকভাবে এ কথাটি সামনে এসেছে যে, হুররা জান্নাতী রমণীদের চেয়ে নিম্নমানের। তবেই তো রমণীরা হুরদের প্রতি হিংসা করবে না।'

এরপর আমি হাসতে হাসতে কথা আরো লম্বা করলাম- মুসলমানরা খামোখা হুরদের সৌন্দর্য-লাবণ্যের কথা শুনে এদের জন্যে পাগল হয়ে যায় এবং অযথা মানুষের বিষোদগার শুনে থাকে।

আমার ঠাট্টার জবাবে সালেহ বললো– তোমার উভয় ধারণাই ভুল। আসল ব্যাপার হলো, জান্নাতে তোমরা পুরুষরা মহিলাদের জন্যে এমন কোনো মূল্যবান বস্তু থাকবে না যার কারণে তারা কারো প্রতি হিংসা করবে। রয়ে গেল হুরদের ব্যাপারটা। তুমি তাদেরকে এতোটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করো না যে, তাদের শানে 'নিম্নশ্রেণি' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করবে। এরা জান্নাতী রমণীদের মতো তো নয়, কিন্তু এমনো নয় যে তুমি এদেরকে নিম্নশ্রেণির ভাববে।

'আচ্ছা তাহলে তারা কেমন?'

'আমি বলছি তারা কেমন। এ সকল হুর মেয়েলি সৌন্দর্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এবং আঙ্গিক সৌন্দর্যের অপূর্ব শৈলী। এদের সৌন্দর্য ও লাবণ্য, শ্রীবর্ধক ক্রীম, হাতের বালা, মুতির হার কিংবা অন্য কোনো প্রসাধনীর মুখাপেক্ষী নয়। এদেরকে অস্তিত্ব দানের জন্যে বিশ্ব চরাচর তার সকল সৌন্দর্য ধার দিয়ে দেয়। ফুল তার রং, বাতাস তার সূক্ষ্মতা, সমুদ্র তার প্রবাহ, জমিন তার স্থিরতা, তারকা তার চমক, চাঁদ তার ঔজ্জ্বল্য, সূর্য তার কিরণ, আকাশ তার ভারত্ব এবং পর্বতচূড়া তার উচ্চতাকে যখন একত্রিত করে তখন একজন হুর অস্তিত্ব লাভ করে।

এদের সৌন্দর্য লাবণ্যের মাপকাঠিতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের হয়ে থাকে। এরা উচ্চতায় লম্বা, সারা গায়ের রং শুভ্রতার দিকে ধাবিত। গোটা দেহের তক নির্মল পরিষ্কার। চোখ ডাগর ডাগর এবং ঘন কালো। এদের ভ্রু সরু এবং পলক দীর্ঘ। এদের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে অবনমিত থাকে। কিন্তু যখন তা ওপরে ওঠে তখন তীরের ন্যায় অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে। এদের চেহারা বেশ মোহনীয়, ললাট প্রশস্ত, গাল লালাভ, নাক পাতলা, ভাষা মিষ্টি, ঠোঁট গোলাপের মতো মোলায়েম আর দাঁত মণি-মুক্তোর মতো চমকদার। এদের চুল রেশমের মতো মোলায়েম ও ঘন কালো এবং পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত প্রলম্বিত। এদের আওয়াজ সুমধুর তানে

কানে অনুধিত হয়, কথা থেকে মুক্তো ঝরে আর মুচকি হাসিতে রাত আলোকিত হয়ে ওঠে। এদের বাচন ভঙ্গিতে নম্রতা, চলনে অন্তরঙ্গতা আর আলাপচারিতায় আভিজাত্যের ছাপ। মিহি লালাভ বস্ত্রে আচ্ছাদিত চমকদার যেওর পরিহিত এদেরকে বিশাল মেঘখণ্ডের আড়ালে লুক্কায়িত ভরা পূর্ণিমার চাঁদের মতো মনে হয়।'
'তুমি কি হুরদের দেখেছ?'
'না। তাদেরকে কেউ দেখেনি। শুধু এদের অবস্থা জেনেছি। তোমাকে শোনাচ্ছি।'
এটা বলে সে কথার ধারাবাহিকতা বাকি রাখল। তবে এবার কবিতার মাধ্যমে নিজের দাবি উপস্থাপন করতে লাগল–

যখন সে বলে কথা, মুখনিঃসৃত ঝরে ফুল
যদি হয় এমনই ব্যাপার, চলো আলাপে-হৃদয় ব্যাকুল।
পূর্ণিমা রাতের চাঁদও, তাকিয়ে তার দিকে
তারাদের আলো যেন, হয়ে যায় ফিকে।
দিবসের প্রজাপতি, অনুরাগে সঙ্গী
জোনাকিরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে, দেখে রূপ-ভঙ্গি।
অপরূপ সুন্দর, ডাগর দু'টি আঁখি
হরিণিরা জুড়ায় চোখ, তার নয়নে রাখি।
কাজলকালো আখিদ্বয়, জুড়ায় এ মন
বিমোহিত সুরমাওয়ালা, যেন সারাক্ষণ।
গলায় তার থাকে যখন অলংকার ঝোলা
দর্শক হয়ে পড়ে মনযোগী আত্মভোলা।
নন্দিত দেহে তার ভঙ্গি এমন
ফুলকলি উঁকি দেয় সরিয়ে আবরণ।
থামিলে তার চলার গতি বিপদ এসে দাঁড়ায় পাশে
ফের চলাতে স্তব্ধ সময় তাকে দেখে মনের আশে।
মনে হতে পারে অতিরঞ্জন গল্প অসার
মনে হয় যদি স্বপ্ন, চলো! তাবীর খুঁজি তার।

. . . . . .

সালেহ ক্লান্তিহীন বলে যাচ্ছে। আমি চুপচাপ তার অবস্থা লক্ষ্য করছি। কবিতা পড়ে যখন সে শেষ করল আমি বললাম–
'তোমার কথাগুলো আমার কাছে অতিশয়োক্তি, বানোয়াট কাহিনি এবং স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। এটা যদি স্বপ্নই হয় তবে এটা বেশ মজাদার স্বপ্ন।'

'এ স্বপ্ন এখনই শেষ হয়নি। শোনো, একটি হুরের অবস্থা একেবেঁকে চলা সেই স্রোতস্বিনী নদীর মতো যা আকাশের মেঘমালা সরিয়ে বরফের আকৃতিতে যাত্রা শুরু করে। পাহাড়ের ওপর ঢেরা ফেলে। নির্ঝরিণীর মতো বয়ে চলে। ঢাল বেয়ে ছুটে চলে। মাঠে অবস্থান করে। উচ্চতাকে ছুঁয়ে সজিবতার দিকে অগ্রসর হয়। টিলা অতিক্রম করে উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছে। অবশেষে নেকী, তাক্বওয়া ও সংযমের ওই মহাসাগরে নিজেকে বিলীন করে দেয়, যার জীবন-যৌবন ধৈর্য ও খোদাভীতির সাথে কেটেছে। এটা এজন্য যে, এ নদী তার পুরো সফরে কোনো নাপাকি বা ময়লা-আবর্জনার শিকার হয় না। সব গায়রে-মাহরামের দৃষ্টি ও স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। হাজার হাজার মাইলের দীর্ঘ সফর সে পবিত্রতার সাথে অতিক্রম করে। এজন্য পবিত্রতা ও সততার গুণশূন্য কাউকে সে গ্রহণ করে না। অবশেষে যৌবন-নদীর উঁচুনিচু তরঙ্গের মতো তার অস্তিত্ব স্বীয় সমুদ্রের মাঝে চিরকালের জন্যে মিশে যায়।"

আমার বুঝে আসছে না, প্রশংসা হুরদের করব না তোমার বর্ণনা শৈলীর?

'প্রশংসা তো হওয়া চাই কেবল আল্লাহর।'

'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রশংসা ও স্তুতি নিছক আল্লাহর হওয়া উচিত। তবে এটা বলো, এরা কি মানুষ হবে?

'হ্যাঁ। এরাও মানুষ। জান্নাতীদের খাদেমরাও এমনই হবে, যাদেরকে গিলমান বলা হয়। তারাও মানুষ। ঐ গিলমান আজীবন বালকই থাকবে।'

'ওরা বালক কেন থাকবে। কর্মচারী এবং খাদেম হিসাবে তো তাদেরকেই অধিক মানায় যাদের বয়স বেশি এবং বুদ্ধিশুদ্ধি পাকাপোক্ত।' আমি আমার মাথায় জন্ম নেওয়া প্রশ্নটা তার সামনে ছুঁড়ে দিলাম।

'ব্যাপারটা আসলে এ রকম নয়। এরা কম বয়েসি হওয়া সত্ত্বেও হবে চালাক চতুর এবং চাহিদা ও মেযাজ অনুধাবনে বেশ পটু। জান্নাতীদের বৈঠকে যখন কোনো জান্নাতীর পানীয় শেষ হয়ে যাবে তখন ঐ জান্নাতী তার (বালকের) দিকে শুধু তাকাবে। এসে সে কোনো জিজ্ঞাসা ছাড়াই তার গ্লাসে প্রার্থীত শরাব ঠিক ততটুকু ঢালবে যতটুকু ঐ জান্নাতীর প্রয়োজন। এজন্যে এদের বুদ্ধিশুদ্ধি ও মেযাজ-অনুধাবন শক্তির তো কোনো সীমা নেই। তবে এদেরকে বালক রাখা হবে– যেন শারীরিকভাবে সর্বদা কর্মক্ষম থাকে এবং মুহূর্তের মধ্যে সকল খেদমত আঞ্জাম দিতে পারে। এদের পোশাক-আশাক, গঠন আকৃতি ও মুখাবয়ব এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে, দেখে মনে হবে যেন মাহফিলজুড়ে অমূল্য মুক্তোদানা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছে। চিরস্থায়ীভাবে এদের অল্প বয়েসি বানানোর অপর একটি কারণ এটিও যে, বৈবাহিক সম্পর্কের কোনো প্রয়োজন এদের হবে না।

কারণ, হুররা যখন ভরা যৌবনা যুবতীতে পরিণত হবে তখন জান্নাতীদের স্ত্রী হয়ে যাবে।

"হুর এবং গিলমানদেরকে কি শুধু জান্নাতের জন্যই সৃষ্টি করা হবে?"

"এ এক লম্বা দাস্তান।"

'আমাদের হাতে তো সময়ের কমতি নেই। তাহলে লম্বা দাস্তান শুনতে অসুবিধা কীসে? আপনি বলুন।'

'শোনো! আজকের দিনটাই মানুষের জন্যে প্রথম হাশর দিবস নয়।'

'মানে? কেয়ামত কি আগেও একবার হয়েছে?'

'কেয়ামত তো আগে হয়নি। তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে আগেও একবার সৃষ্টি করা হয়েছে।'

'তা কখন হয়েছিল?'

'এটা জান্নাতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালাকে তুমি নিজেই জিজ্ঞেস করো। আমি তো কেবল এটুকু জানি যে, তা হয়েছিল। মূলত মানুষকে যে পরীক্ষায় নিপতিত করা হয়েছিল– এ প্রথম উত্থান। ঐ দাস্তানের দ্বিতীয় ঘটনা প্রথম ঘটনা ছিল এই, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টজীবের সামনে এ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে, তারা জান্নাতে স্থায়ীভাবে আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভ করবে। কিন্তু এজন্য তাদেরকে দুনিয়াতে কিছু সময় এমনভাবে কাটাতে হবে যে আল্লাহ তাদের সামনে থাকবেন না। তাদের সামনে থাকবে কেবল তার বিধান। আল্লাহকে না দেখেই তার ইবাদত ও আনুগত্যের রাস্তা অবলম্বন করতে হবে। এ সৃষ্টিজীবকে সাময়িকভাবে আমানতস্বরূপ জমিনের রাজত্ব দান করা হবে। নিজের রাজত্বকালে এ সৃষ্টিজীবকে একথা প্রমাণ করতে হবে যে, সে প্রতাপশালী বাদশাহ হয়েও আল্লাহকে না দেখে তার আনুগত্যের জন্য সদা প্রস্তুত। যে ক্ষমতা ও প্রতাপের এ আমানতকে যথাযথভাবে ব্যবহার করবে সে প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতে পাবে আল্লাহ তায়ালার চিরস্থায়ী সান্নিধ্য। আর একাজে ব্যর্থ হলে পাবে জাহান্নামের শাস্তি।'

"তো পরে কী হলো?"

"সমস্ত সৃষ্টিজীব ভয়ে পেছনে সরে গেল। কারণ জান্নাত যতটা সুন্দর ও আরামদায়ক, জাহান্নাম ততটাই ভয়ানক ও কষ্টদায়ক। হাশরের ভয়াবহতা তো এখনই তুমি স্বচক্ষে অবলোকন করছ। এরপরও কি কোনো বুদ্ধিমান নিজেকে এমন পরীক্ষায় ফেলতে চায়?"

"আমি ফোঁড়ন কেটে, বললাম সম্ভবত আবেগ প্রবণ আমরা মানুষরা এ পরীক্ষায় আদাজল খেয়ে নেমেছিলাম"।

"হ্যাঁ, তাই হয়েছিল। তবে এ ঐশী আমানত বহন করার সংকল্প মানবাত্মা সম্মিলিতভাবে করেছিল। এজন্য আল্লাহ তায়ালার ইনসাফের দাবি এটাই ছিল যে, একেক জন মানুষ সৃষ্টি করে সরাসরি তার থেকে শুনে নেওয়া হবে যে, কী পরিমাণ পরীক্ষায় নিজেকে সংশ্লিষ্ট করতে রাজি।

আবদুল্লাহ! এটা এজন্য হয়েছে যে, তোমাদের প্রতিপালক কারো প্রতি দানা পরিমাণও জুলুম করেন না। তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সবার সামনে তার পরিকল্পনা পেশ করেছেন। অধিকাংশ মানুষ পূর্ব থেকেই এ উদ্দেশ্যের জন্যে প্রস্তুত ছিল। এজন্যে তারা পূর্ণসজ্ঞানে এ পরীক্ষায় নিপতিত হতে প্রস্তুত হয়ে গেল। তবে যে সমস্ত লোক এ আপদ মেনে নিতে অস্বীকার করলো তাদের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, মানুষের ঘরে যে সমস্ত বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করে এবং বালেগ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তাদেরকে এ দায়িত্বই দেওয়া হবে। আর এ সকল ছেলে মেয়েদেরকেই জান্নাতের হুর এবং গিলমান বানিয়ে দেওয়া হবে।

"আর বাকিরা কি এ কঠিন পরীক্ষায় নামতে তৈরি হয়ে গেল?

"এক্ষেত্রেও দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ভরপুর অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তোমরা জান দুনিয়াতে সবার পরীক্ষা এক ধরনের হয় না। এ পরীক্ষাটা ঐ দিন সবাই নিজের মর্জি মাফিক বেছে নিয়েছিল। যারা খুব সাহসী লোক ছিল তারা নবীদের যুগকে বেছে নিল। এদের পরীক্ষা ছিল এ, বিরাজমান শত গুমরাহী ও ভ্রষ্টতার যুগেও নবীদেরকে সত্যায়ন করতে হবে, তাঁদের সঙ্গ দিতে হবে। এ শ্রেণির লোকদের কামিয়াবির জন্যে প্রধান শর্ত ছিল, কঠিন বিরোধিতা ও বৈরী পরিবেশেও অটল অবিচল থাকা, এ পথে আগত সকল কষ্ট-ক্লেশ সয়ে যাওয়া এবং বাণীকে সামনের দিকে পৌঁছে দেওয়া। এ জন্যে এদের প্রতিদানও বেশি। কিন্তু নবীদের সরাসরি পথনির্দেশ এত সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও এ শ্রেণির যে সকল লোক কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকবে তাদের শাস্তিও হবে ততটা কঠিন ও ভয়াবহ। এ শ্রেণির লোকদের মাঝেই একদিকে ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মতো মহান ব্যক্তিত্ব আর অন্য দিকে ছিল আবু লাহাবের মতো হক্কের দুশমন।

দ্বিতীয় পর্যায় ছিল ঐটা যেটাতে লোকেরা কেবল মুসলমান হওয়া এবং নবীদের চলে যাওয়ার পর তাদের উম্মতে শামিল হওয়ার প্রশ্নপত্র বেছে নিয়েছিল। এ সকল লোকদের পরীক্ষা ছিল এই, পরবর্তী যুগে সৃষ্ট গুমরাহী ও সাম্প্রদায়িকতা, বিদআত ও উদাসীনতা থেকে বেঁচে শরীয়তের চাহিদা সর্বাবস্থায় পূরণ করে যাবে এবং সমাজের সঙ্গতি-অসঙ্গতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে লোকেদের মাঝে সৎ কাজের প্রসার ঘটাবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। এ জিম্মাদারি

তাদেরকে এজন্যে দেওয়া হয়েছিল যে, তাদের কাছে নবীদের শিক্ষা ও আদর্শ ছিল আর তারা ছিল জন্মগত মুসলমান, ইসলাম গ্রহণের জন্যে যাদের বিন্দুমাত্র পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি। এর অর্থ হলো সাধারণ মানুষদের তুলনায় এদের রাহনুমায়ী বেশি করা হয়েছে। তাদেরকে অধিক পূণ্য লাভের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
"আমার এবং অন্যান্য মুসলমানদের সর্ম্পক এ দলের সঙ্গেই ছিল না?

"হ্যাঁ, তুমি ঠিক বুঝেছ। তৃতীয় দল ছিল ঐ সকল লোকদের যারা বিলকুল সাদা প্রশ্নপত্র বেছে নিয়েছে। এদেরকে নবীদের সরাসরি রাহনুমায়ী ছাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এদের প্রশ্নপত্র ছিল মূলত ফিতরত বা স্বভাবজাত হেদায়াত। অর্থাৎ, এদের পরীক্ষা ছিল ঈমান ও আখলাকের পরীক্ষা। সাধারণ মুসলমানদের মতো এদেরকে না তো শরীয়তের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে আর না নবী-রাসূলদের সান্নিধ্য অর্জনের মতো কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। এদের হিসাব-নিকাশ হবে সবচে' সহজভাবে। এদের জন্যে কঠিন আযাবের আশঙ্কাও আর প্রতিদান লাভের সুযোগও কম।
"আর নবী-রাসূলদের ব্যাপারটা কী ছিল?"

"তারা পরীক্ষার সবচে' কঠিন প্রশ্নপত্রটি বেছে নিয়েছিলেন। তাদের রাহনুমায়ী করা হয়েছে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে। এজন্যে তাদের হিসাবের মাত্রাটা ছিল সবচাইতে বেশি ও কঠিন। তুমি তো জানো যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের সঙ্গে কী হয়েছিল? তিনি কোনো গুনাহ করেননি। শুধু একটা ইজতেহাদ ছিল। কিন্তু দেখো আল্লাহ তায়ালা তাকে কীভাবে মাছের পেটে বন্ধ করে দিলেন।"
এরপর সে তার এ দীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপ বলতে গিয়ে বললো–

সব দলে যেই মূলনীতিটা কাজ করছে তা মূলত একই। রাহনুমায়ী বেশি তো হিসাব নিকাশ কঠিন আর শাস্তি ও প্রতিদান বেশি। রাহনুমায়ী কম তো হিসাব-নিকাশ সহজ। ফলশ্রুতিতে শাস্তিও কম, প্রতিদানও কম। কোনো মানুষের সম্পর্ক যেই দলের সঙ্গেই হোক সেটা মানুষেরা নিজেরাই বেছে নিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বেছে দেননি।
"এর মানে তো হলো দুনিয়াতে যদি আমার রাহনুমায়ী বেশি করা হয়ে থাকে তাহলে এটা মূলত আমার দরখাস্তের ভিত্তিতেই করা হয়েছিল।"
"হ্যাঁ! ব্যাপারটা হুবহু এমনই। এজন্যেই আজ তুমি এত উঁচু মর্যাদা পেয়ে গেছ। তুমি যদি এ রাহনুমায়ীর কদর বা মূল্যায়ন না করতে তাহলে ততটাই কঠিন আযাব তোমাকে দেওয়া হতো।"
"বন্ধু! আমি কত বড় ঝুঁকি না নিয়ে ফেলেছিলাম।"

"তোমাদের দুনিয়ার নীতিও তো এমনই ছিল No Risk No Gain রিস্ক নেই তো বিজয় নেই।"

এই মুহূর্তে আমার অনুধাবন হলো, আমি কী অর্জন করে ফেলেছি আর কী মহাবিপদ থেকে বেরিয়ে এসেছি। মনের অজান্তে আমি সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম। দীর্ঘক্ষণ আমি প্রতিপালকের শুকরিয়া আদায় করতে থাকলাম যিনি আমাকে এ কঠিন পরীক্ষায় সফলতা দান করেছেন। এরই মধ্যে সালেহ আমার পিঠ চাপড়ে বললো–

"আবদুল্লাহ, ওঠো"।

আমি ওঠে দাঁড়ালাম। সালেহকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললাম–

"সালেহ আমি আর কখনো মরবো না। আমার জীবনে অসুস্থতা, বার্ধক্য, চিন্তা, পেরেশানি, ভয় বা নৈরাশ্য কখনো আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আমার মন চাচ্ছে, আনন্দে-খুশিতে আমি লাফিয়ে বেড়াই আর চিৎকার দিয়ে দিয়ে দুনিয়াবাসীকে বলি, লোকসকল! আমি কামিয়াব হয়ে গেছি। লোকসকল! আমি সফল হয়ে গেছি। আজ থেকে শুরু হবে আমার রাজত্ব। আর আজ থেকেই শুরু হবে আমার প্রকৃত জীবন।"

সালেহ চুপচাপ মুচকি হাসির আভা ছড়িয়ে আমায় দেখতে লাগলো। আমি চুপ হতেই সে বললো–

"জীবন তো শুরু হবে। তবে এখন আমাদের হাশরের মাঠে ফিরে যেতে হবে। অনেক অবস্থা দেখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে অকল্পনীয় সুযোগ দিয়েছেন। এসো আমরা হাশরের মাঠের দিকে যাই।"

দুই বান্ধবী

আমরা আরো একবার হাশরের মাঠে দাঁড়ানো ছিলাম। বাচ্চাদের ব্যাপারে নাঈমার প্রশ্ন বার বার আমার কানে বেজে ওঠছিল। আমি সালেহকে বললাম–
"আমি এখানে থাকা আমার দুই বাচ্চার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"
"এর মানে তো তুমি তাদের দুরবস্থায় তাদের সঙ্গে দেখা করতে মানসিকভাবে তৈরি আছ, তাই?
"হ্যাঁ! আমি সম্ভবত আগে আমার ভেতর এ সাহস পেতাম না।"
"হ্যাঁ, এটা হাশরের দিন। তা তো কেবল জান্নাতে যাওয়ার পরেই হবে যে মানুষের দুঃখ-বেদনা, চিন্তা-পেরেশানি কিছুই থাকবে না।" সালেহ আমার ওপর বয়ে যাওয়া পেরেশানির কারণ দর্শালো।

"কোরআনেও জান্নাতের বিবরণ এভাবেই দেওয়া হয়েছে। জান্নাত এমন জায়গা যেখানে অতীতের জন্যে কোনো আক্ষেপ থাকবে না আর ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোনো চিন্তা বা পেরেশানি রইবে না। "আমি তার সমর্থনে কোরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিলাম। জবাবে সালেহ আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বললো–

হ্যাঁ, জান্নাত এমন জায়গা। হিসাব-নিকাশ যখন শুরু, প্রত্যেক ব্যক্তির যখন জান্নাত বা জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে যাবে তখন তাকে এটাও বলে দেওয়া হবে যে, তাকে কী ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে বা কী অফুরান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।
"মানে? আমার চোখে মুখে বিশ্লেষণ জানার কৌতূহল খেলা করছিল।"

"মানে কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে যদি জান্নাতের ফয়সালা হয় তখনই তাকে এটাও বলে দেওয়া হবে যে, জাহান্নামে ওই ব্যক্তির সম্ভাব্য ঠিকানা কী ছিল? যা থেকে তাকে বাঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে। তদ্রূপ ফয়সালা যদি জাহান্নামের হয় তখন ওই পাপিষ্ঠ জাহান্নামীকেও বলে দেওয়া হবে যে, জান্নাতে তার জন্য বরাদ্দকৃত স্থান কোনটা ছিল যেটা সে বদ আমলের দ্বারা নষ্ট করে দিয়েছে।"
"এটা তো হবে নিজের ভেতর অনেক বড় এক শাস্তি।"

"হ্যাঁ, জান্নাতীদের জন্যে সবচে' বড় এবং প্রথম খুশি– এ জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ আর জাহান্নামীদের জন্যে সর্বপ্রথম শাস্তি হবে– এ আক্ষেপ যে, কী অফুরন্ত

নেয়ামত ও উঁচু মর্যাদা থেকে সে চিরকালের জন্যে বঞ্চিত হয়ে গেছে। খানিকক্ষণ পূর্বে তোমাকে বলা আমার সেই কথাটা তোমার স্মরণ থাকার কথা, "আদিজগতের যে মানুষ জান্নাতে নিজের যতটা উঁচু মর্যাদা আশা করেছিল। সে জাহান্নামে ঠিক ততোটা নীচুতা ও হীনতার আশঙ্কাও মাথা পেতে নিয়েছিল। আজ এর ফলাফল এই দেখা দিবে যে, জান্নাতে উঁচু মর্যাদা লাভের খুশির আনন্দেও ভাসবে। আর জাহান্নামের কঠিন মুসিবতে নিপতিত হওয়ার সাথে সাথে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আক্ষেপের আগুনে রয়ে রয়ে জ্বলবে।"

"ও আমার আল্লাহ!" মনের অজান্তেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। আমরা এ কথোপকথন করছিলাম আর ধীরে ধীরে হাঁটছিলাম। হাশরের অবস্থা এখনো তেমনি ছিল বা একটু তীব্র হয়েছিল। সেই একই কান্না ও আহাজারি, একই চিন্তা ও পেরেশানি, একই আফসোস ও অনুশোচনা, সেই একই অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা, সেই একই হতাশ ও নিরাশা। প্রত্যেকটি চেহারায় ছিল প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা। কিন্তু জবাব ছিল না কোথাও। প্রতিটি চেহারায় ছিল ক্লান্তি ও অবসন্নতা। স্বস্তির লেশ ছিল না কোথাও। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, জানা নেই আমার ছেলে ও মেয়ের ওপর কী অবস্থা বিরাজ করছে?

. . . . .

এ মাঠেরই এক জায়গায় দু'জন মেয়ে পাথুরে ভূমিতে বন্ধু-বান্ধব ছাড়া বসা ছিল। দু'জনেরই চোখ বিচ্ছিরি মতো ফুলে গিয়েছিল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, কাঁদতে কাঁদতেই এদের এ অবস্থা হয়েছে। অবসন্ন দেহ, চিন্তিত চেহারা আর বিদঘুটে স্ফীত আঁখি। এদের কষ্টের দাস্তান এদের চেহারায় দূর থেকে পড়া যায়। এদের মধ্যে বেশি দুরবস্থার শিকার মেয়েটি অপরজনকে বলতে লাগলো–

"লায়লা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে, এসব কিছু সত্য!

মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় এভাবে জীবিত হতে পারে। দুনিয়ার জীবনের পরে নতুন আরেক জীবন শুরু হতে পারে। না আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

হায়! যদি এটা ভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন হতো।

হায়! চোখ খুলে যদি দেখতাম, আমি আমার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার নরম তুলতুলে বিছানায় শোয়া। এরপর কলেজে এসে আমি তোমাদেরকে বলতাম, আজ আমি ভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন দেখেছি।

হায়! যদি এটা স্বপ্ন হতো" এটুকু বলে সে ডুকরে কাঁদতে লাগলো।

লায়লা কেঁদে কেঁদে আছেমাকে বললো–

"বিশ্বাস করা না-করার দ্বারা আজ লাভ-ক্ষতি নেই। এটা স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। স্বপ্ন তো ছিল সেটা যা আমরা ফেলে আসা দুনিয়ার জীবনে দেখতাম। চক্ষু তো আজ খোলা আছেমা। চক্ষু তো আজ খোলা। কিন্তু আজ চোখ খোলার দ্বারা কী ফায়দা হবে?"
বেশ খানিকক্ষণ সুনসান নীরবতা বয়ে গেল। নীরবতা ভেঙ্গে লায়লা অনুশোচনার সুরে আছেমাকে বললো–
"হায়! যদি তোমার সাথে আমার হৃদ্যতা না থাকতো।
হায়! যদি আমি তোমার রাস্তায় না চলতাম।"
"হ্যাঁ যদি আমি, তোমার রাস্তায় চলতাম তাহলে আমাদের দু'জনের এ অবস্থা হতো না। জানা নেই সামনে কী না কী হয়।" আছেমাও আফসোসের গলায় বললো।
কিছুক্ষণ চুপ থেকে আছেমা লায়লাকে উদ্দেশ্য করে বললো–
"লায়লা এটা তো বলো, দুনিয়াতে আমরা কতদিন ছিলাম?"
"জানা নেই! একদিন, দশদিন, নাকি এক প্রহর। তখন তো এমন মনে হতো, জীবন কখনো শেষ হবে না। কিন্তু এখন তো সে সব একটি স্বপ্নের মতো মনে হয়।"
"আমার তো সেই স্বপ্নের কোনো ঝলকই মনে পড়ছে না।" এটা বলে আছেমা অতীতের কল্পনায় হারিয়ে গেল। সম্ভবত সে অতীতের পাতাগুলো হাতড়ে এমন কোনো প্রহর খুঁজে ফিরছে যেটাকে স্বরণ করে সে একটু সান্ত্বনা গ্রহণ করবে। কিন্তু তার স্মৃতিতে এমন কোনো প্রহরের হদিস নেই। যা মনে পড়েছে তা স্বয়ং অন্যায়-অপরাধের এক ফিরিস্তি।"

.....

"আমি আজ কেমন লাগছি না?"
আছেমা বিশেষ এক অভিনয়ে শরীরটা আন্দোলিত করলো এবং কোনো বিপণন তারকাদের ভঙ্গিমায় দু'কদম হেঁটে লায়লার সামনে এসে দাঁড়ালো। লায়লা তার কলেজের ভেতর গাছতলায় পাতা একটি বেঞ্চিতে বসে জুস পান করছিল। তার সামনে তার প্রিয় বান্ধবী আছেমা হেলতে দুলতে অহংকার ভরে নিজের নতুন জামার প্রদর্শনী করে যাচ্ছিল। লায়লা কিছু না বলায় আছেমা আবারো বললো–
"আমাকে কেমন লাগছে?"
"কাপড় পরা সত্ত্বেও তোমাকে বিবস্ত্র মনে হচ্ছে।" লায়লা স্বাধীনভাবে এক ঢোক জুস গলাধঃকরণ করে তার কাপড়ের ব্যাপারে মন্তব্য করলো।
"হোয়াট (কী)?"
"সত্য বলছি।
কিন্তু এর দ্বারা তোমার গোটা শরীর ঝকঝক করছে, চমকাচ্ছে। আস্তিন পড়তে তো তুমি এমনিতেই অভ্যস্ত নও। কিন্তু এ পোশাকে তো বাহুর সাথে সাথে তোমার কাঁধও উদোম দেখা যাচ্ছে।"

"কথাটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেলো। পূর্ণ কথা হলো, টাইট-ফিট জিন্স আর আঁটো-সাঁটো টি শার্ট।"
"তবে কি আমি এখন বোরকা পড়ে আসবো?" তীর্যক গলায় জিজ্ঞেস করলো আছেমা।
"আছেমা এখানে ছেলেরাও পড়ে। আমাদের সতর্ক থাকা চাই। এটা আমাদের দায়িত্ব।" লায়লা তাকে হিতৈষিণীর গলায় বুঝিয়ে বললো।
"স্যরি, এটা তোমার মতামত। অন্যথা দায়িত্ব তো সকল ছেলেদের যে, তারা নিজেদের দৃষ্টি অবনমিত রাখবে। কোনো মাওলানা সাহেব এটা তাদেরকে কেন বলে না?"
"নিঃসন্দেহে এটা তাদের দায়িত্ব। তবে আমাদের কি কোনো দায়িত্ব নেই?"
লায়লার এ জবাবে আছেমা রাগের গলায় বললো—
"আমরা কি আমাদের পছন্দের কাপড়ও পরবো না? আমরা কি একটু সাজসজ্জাও করবো না?"
"অবশ্যই! তুমি সুন্দর কাপড় পরো ও সাজসজ্জা করো। তবে লজ্জা-শরমের গণ্ডির ভেতর থেকে।"

"চুপ করো বন্ধু। এখানে একজন ভদ্র ম্যাডাম আছেন যিনি সব সময় এ ধরনের ধর্মান্ধতার ওপর লেকচার দিয়ে থাকেন। আর এ মেযাজের দ্বিতীয় ব্যক্তি হলে তুমি। শোনো তার পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, তাহলে কিন্তু পরিণাম তার মতোই হবে। সারা জীবন ঘরে বসে থাকতে হবে। তোমারও কোথাও বিয়ে হবে না।
"আছেমা অত্যন্ত কষ্টের ব্যাপার! এত আদর্শ, শালীন ও ভালো একজন শিক্ষিকাকে নিয়ে তুমি বিদ্রূপ করছ? তার বিয়ে হয়নি এতে দোষ তার ধর্মান্ধতা নয়, আমাদের সমাজ ব্যবস্থার ব্যর্থতা।
"আরে বন্ধু! বাদ দাও তো এসব বাজে আলোচনা।
"এ কাজ করলে পরিবারের লোকেরা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।"
"ডান আমি তোমাকে আমার সাথে নিয়ে নেব। তোমার পরিবারের লোকেরা বড় রক্ষণশীল। তোমার আম্মা নাঈমা আন্টি এমনিতে তো ভালো মহিলা। কিন্তু সব সময় শুধু নসিহতই করতে থাকেন। আর তোমার আব্বা আবদুল্লাহ আঙ্কেল— এ বেচারাকে তো মনে হয় সারা দুনিয়ায় ইসলাম প্রচার করেই একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। তোমার বাকি ভাই-বোনরাও এমনই। তোমার এক বড় ভাই জমশেদ সেই একটু আধুনিক, প্রগতিশীল। এজন্যেই বোধ হয় সে তোমাদের সাথে থাকে না।
"আব্বা তো মনে করেন সেই তার থেকে সবচে' দূরে সরে গেছে।"
আর আম্মার কথা অনুযায়ী তো সে আমাকেও খারাপ বানিয়ে ফেলেছে।"
"কী খারাপ গুণ আছে তোমার ভেতর? তোমাকে তো আমার কাছে অনেক ভালো মানুষ মনে হয়।"

"আমি ভালো? শৈশব গড়ে ওঠা অভ্যাসের কারণে নামায রোযাটা চালিয়ে যাই আর কী। অন্যথা তোমার সাথে চলে তো তোমার মতোই কাজ করি। "কিন্তু দেখো! আমার সাথে চলে কত মজা পাওয়া যায়। পঞ্চাশ বছরের জীবন। খাও-দাও ফূর্তি করো।

"হ্যাঁ তোমার সাথে চললে মজা তো পাওয়া যায়। কিন্তু আব্বু বলেন– আখেরাতে যদি একদিনের জন্যও কেউ ধরা খেয়ে যায় তাহলে সেখানকার একদিন হাজার হাজার বছরের সমান হয়ে থাকে। সেখানে পঞ্চাশ বছরের জিন্দেগির যত উন্মাদনা সব উবে যাবে। তার দিকনির্দেশনার কারণেই আমার আম্মু আপুরা এবং আনোয়ার ভাই সবাই নেককার জীবনযাপন করে থাকে।"

"Don`t talk about them" তাদের ব্যাপারে কোনো কথা বলবে না। তারা নেককারদের জীবন নয় বরং সেকেলে জীবনযাপন করেন। এ সেকেলে চিন্তা ভাবনা আমাকে বড় পীড়া দেয়।

আমি এজন্যই তোমাদের বাড়িতে যাওয়া এখন কমিয়ে দিয়েছি। সবসময় জান্নাতের কথা, সবসময় I dont like.

"আছেমার এ কথায় লায়লার চেহারায় অসন্তোষের ছাপ ফুটে ওঠলো। সে বললো–

"এমন করে বলো না আছেমা। আমার পরিবারের লোকেরা তোমায় কখনো কিছুই বলেনি। ওই বেচারারা যা করে নিজেরাই করে অথবা আমাকে করতে বলে। তোমাকে তো কিছুই বলে না। শুধু একবার মাত্র আমার আব্বু তোমাকে বলেছিলেন–

'মা তুমি আমার মেয়ের বান্ধবী। দেখো একে অন্যের এমন বান্ধবী হও যেন জান্নাতেও দু'জন এক সাথে থাকতে পারো। এমন যেন না হয় যে, কেয়ামতের দিন তোমরা একজন আরেকজনকে দোষ দাও যে, তোমার সাথে বন্ধুত্বই আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।'

"স্যরি ভাই! এসব বাদ দাও তো, তুমি তো দেখছি তোমার আব্বার বকবকানি আমাকে আরেকবার শুনিয়ে দিলে। এ বেচারাদের মাথায় সব সময় কেয়ামত ঘুরে।"

আছেমার এ তীর্যক কথায় লায়লার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এর চাহনি দেখে আছেমা দ্রুত বলে ওঠলো–

"স্যরি, স্যরি রাগ করো না। আমি আর কখনো তোমার আব্বুকে কিছুই বলবো না। চলো কেন্টিনে গিয়ে কিছু খেয়ে নেই। আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে।

হাশরের মাঠে ক্রোধের উত্তপ্ততা ছিল। আমি চিন্তা করছিলাম, এ আশঙ্কায় যে, তাকে যেন জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষেপ করা না হয়।

আমি এ কল্পনার ভানায় ভাসছিলাম। হঠাৎ সালেহের আওয়াজ আমার কর্ণকুহরে আঘাত করলো–

"আবদুল্লাহ প্রস্তুত হও। আমি তোমাকে তোমার মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ করাতে নিয়ে যাব।"

মনের অজান্তে আমি আমার নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলাম। আমরা কয়েক কদম সামনে এগিয়ে দেখতে পেলাম এবড়োথেবড়ো পাথুরে ভূমিতে দু'জন মেয়ে বসে আছে।

আমি দূর থেকেই এদের দু'জনকে চিনে ফেললাম। এদের একজন ছিল লায়লা। আমার সবচে' ছোট ও আদরের কন্যা। অন্যজন ছিল আছেমা। আমার মেয়ের প্রিয় বান্ধবী।

ওই সময় পরিবেশ ও আবহাওয়া ছিল তীব্র গরম। মানুষের শরীর থেকে পানির মতো ঘাম ঝরছিল, পেরেশানির কারণে ক্ষুধা তো বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু পিপাসার তীব্রতা প্রত্যেককে আরো বেশি পেরেশান করে তুলছিল। এরা দু'জনও পিপাসায় কাতর হয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত বসে ছিল। আছেমার অবস্থা ছিল খুব শোচনীয়। অসহ্য পিপাসায় সে তার বাহু বেয়ে গড়িয়ে পড়া ঘাম চেটে চেটে খাচ্ছিল। এর দ্বারা পিপাসা কতটুকুই বা মেটে? আর তার পাশেই হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে লায়লা বসা ছিল।

আছেমা বড় এক ধনী পরিবারের একমাত্র কন্যা ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাকে রূপ-লাবণ্য, বিত্ত-বৈভব ও স্টাটাস-ক্যারিয়ার সব দান করেছিলেন। মা-বাবা আদরের দুলালীকে উন্নত প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করিয়েছেন। আরবি আর কোরআন বুঝে পড়ার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রভাব এতটাই ছিল যে, মেয়ে ইংরেজদের চেয়েও সুন্দর ইংরেজি বলতে পারত। কিন্তু এসকল স্কুলে ভাষাটাকে শুধু ভাষা হিসেবে নয়; বরং কদর্য এক সভ্যতার দাসত্বের মনোভাব নিয়ে শেখানো হতো। ফলে ভাষার সাথে সাথে পশ্চিমা সভ্যতার অধিকাংশ নোংরা দিক তার মাঝে চলে এসেছিল। সালামের জায়গায় হ্যালো-হায়, পোশাক-পরিচ্ছদে জিন্স শার্ট আর ইংলিশ গান ও মুভি ইত্যাদি জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এতৎসত্ত্বেও আছেমা বংশীয়ভাবে নব্যধনিক ছিল না; বরং এরা বংশ পরম্পরায়ই ছিল বিত্তশালী। বাহ্যিকভাবে হলেও এক ধরনের ভদ্রতা, শালীনতা এবং বড়দের প্রতি সম্মানবোধ তার মাঝে পাওয়া যেত। এ কারণেই আমি তার বন্ধুত্বকে মেনে নিয়েছিলাম। আশা ছিল, যদি লায়লার সান্নিধ্যে এসে আছেমা একটু ভালো হয়ে যায়। লায়লার সাথে তার সম্পর্ক হয়েছে কলেজ জীবনে। জানা নেই, দু'জনের চিন্তা-চেতনায় কোনো জিনিসের মিল ছিল যে, দু'জনের অবস্থায় বিস্তর ফারাক থাকা সত্ত্বেও কলেজ জীবনের সম্পর্ক সারা জীবনের বন্ধুত্বের রূপ নিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ বন্ধুত্বে আছেমা লায়লা দ্বারা প্রভাবিত কম হয়েছে আর লায়লা আছেমার দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয়েছে।

লায়লা আমার মেয়ে ছিল ঠিক; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে আমার মতো হতে পারেনি। আমারচে বেশি সে তার সব চাইতে বড় ভাই জমশেদের আদুরে ছিল। এ জমশেদ ছিল আমার প্রথম সন্তান। সেও হাশরের মাঠে কোথাও বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে ফিরছিল। একদিকে বড় ভাইয়ের আদর-স্নেহ, অন্যদিকে আছেমার বন্ধুত্ব। এ আছেমা বাবা-মার একমাত্র মেয়ে হওয়ায় তাদের আতুআতু করা আদর যত্ন আর অঢেল ভোগ বিলাসের মধ্যে বেড়ে উঠেছিল। ফলশ্রুতিতে আজ হাশরের মাঠের এ লাঞ্ছনার একটি অংশ তাদেরও ভোগ করতে হয়েছিল। আমার সমকালের অধিকাংশ ছেলে-মেয়েকে তাদের বাবা-মার অনিয়ন্ত্রিত আদর-স্নেহ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

প্রত্যেক যুগেই সন্তান বাবা-মার আদরের বস্তু ছিল। আমার সমকালে এ এক আশ্চর্য দৃশ্য প্রকাশ পেল যে, বাবা-মা সন্তানের ভালোবাসায় এতটাই কাবু হয়ে গিয়েছিল, তারা তাদের খেলনায় পরিণত হয়েছিল। সম্ভবত এটা কম সন্তানের প্রভাব ছিল। আগে প্রত্যেক ঘরে আট দশ জন সন্তান থাকত। ফলে বাবা-মা সন্তানের প্রতি মনোনিবেশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি সীমানা অতিক্রম করতে পারত না। কিন্তু আমাদের সময়ে বাবা-মার বাচ্চাই হতো দু'তিন জন। ফলে তাদের লক্ষ্য হয়ে গিয়েছিল সারা দুনিয়ার আনন্দ খুশি একত্রিত করে সন্তানদের জন্যে সরবরাহ করা।

এদের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে একটু কঠোরতা অবলম্বনকে তারা খারাপ মনে করতো। এদের প্রত্যেক চাহিদা ও মনোবাসনা পূরণ করাকে নিজের জীবনের প্রধান লক্ষ্য বানিয়ে নিত। এদেরকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার জন্যে নিজের সবকিছু উজাড় করে দিত। এমনকি এদের সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দময় ভবিষ্যতের আশায় শিক্ষা অর্জনের জন্যে এদেরকে বিদেশে পাঠিয়ে দিত। ফলশ্রুতিতে এ সকল ছেলে-মেয়ে বৃদ্ধ বাবা-মাকে রেখে উন্নত দেশ সমূহের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে নিত। এটা না হলে ও নতুন জীবনে মা-বাবার কদর ও গুরুত্ব থাকত খুবই সীমিত। কিন্তু বাবা-মা এত কিছুর পরও অনেক খুশি থাকত।

বাবা-মার নিকট দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি সন্তানদেরকে শিক্ষাদানের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল মুখ বাঁকা করে ইংরেজি বলা শিখানো। ঈমান ও আখলাকের শিক্ষাদানের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চ শিক্ষিত করা। আল্লাহর মুহাব্বত, তার বান্দাদের প্রতি ভালোবাসা, মানবসেবা এবং আল্লাহর সৃষ্টি প্রতি কল্যাণকামিতা ও সহমর্মিতার পরিবর্তে সন্তান তার পিতা-মাতা থেকে স্বার্থপরতার শিক্ষাই পেত। বংশের মুরুব্বিদের হাতে বাচ্চাদেরকে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে ন্যস্ত করা হত টিভি সিনেমার হাতে– যেখানে ভদ্রতা, সভ্যতা, শিষ্টাচার ও শালীনতার পরিবর্তে ব্যক্তি স্বার্থ এবং বস্তুবাদিতার এক নতুন পাঠ প্রতিদিন দেওয়া হতো। পরকালীন সফলতার পরিবর্তে ইহকাল ও

ইহকালীন সফলতাকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে পেশ করা হত। আল্লাহ, ধর্ম এবং আখেরাত এগুলো ছিল প্রথাগত বিষয়। ধার্মিকতার চূড়ান্ত পর্যায় ছিল এই- কোনো মাওলানা সাহেবের মাধ্যমে বাচ্চাকে কোরআন শরীফের নাজেরা পড়িয়ে দেওয়া হতো। আর কোরআনের বাণী ও মর্মার্থ? তা না তো মাওলানা সাহেবের জানা থাকত না মা-বাবার, আর সন্তানও কখনো তা জানতে পারত না। এরা যদি কখনো বুঝে পড়তে পারতো তাহলে জেনে নিতে সক্ষম হতো যে, কোরআন ইহকালীন সফলতার আলোচনা থেকে ততটাই খালি, তাদের জীবন যতটা খালি আখেরাতের আলোচনা থেকে। এর রহস্য পেছনের জীবনে কারো বুঝে আসুক বা না আসুক আজ তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। দুনিয়াতে যা অতিক্রম করা হয়েছে তা জীবনই তো ছিল না। তা তো ছিল নিছক একটি প্রশ্নপত্র অথবা চলার পথে কোনো মুসাফিরের সরাইখানায় কাটানো একটি প্রহর। মূলত জীবন তো ছিল সেটা যা চিরস্থায়িত্বের কঠিন বাস্তবতা নিয়ে আজ সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

আমরা খানিকটা নিকটে যেতেই আছেমার দৃষ্টি পড়লো আমার ওপর। সে লায়লাকে ধাক্কা দিল। লায়লা হাঁটু থেকে মাথা ওঠাল। তার দৃষ্টি আর আমার দৃষ্টি একাকার হয়ে গেল। ওই চোখগুলোতে এত অসহায়ত্ব, ভীতি এবং কষ্ট ছিল যে, আমার অন্তর ফেটে যাচ্ছিল। সে ওঠলো। দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো এবং পূর্ণ শক্তিতে কাঁদতে লাগলো। তার মুখ থেকে শুধু আব্বু আব্বু ছাড়া আর কিছু বেরুচ্ছিল না। আমি খুব কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করছিলাম। আমি ধারণা করলাম সে যদি এভাবে কাঁদতে থাকে তাহলে আমারও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম- "মা চুপ হও। আমি তোমাকে অনেক বুঝিয়েছিলাম না? ওই দিনের জন্যে বাঁচতে শিখো। দুনিয়া একটা ফানুস ছাড়া কিছুই না।"

"হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলতেন। কিন্তু আমার চোখে তখন পর্দা পড়ে ছিল।" এটা বলতেই তার ফোঁপানোর আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল।

সে আমার বুকের সঙ্গে লাগানো ছিল। আমার চোখের পাতায় তার জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও গোটা জীবনের প্রতিটি ধাপের ছবি এক এক করে মূর্ত হয়ে ওঠছিল।

কখনো সে বিছানায় গড়াগড়ি খেতে খেতে কাঁদতো আমার পিতৃহৃদয় তখন অস্থির ছটফট করতো। কখনো ফ্রক পরে পরির মতো ছুটোছুটি করতো যার একেকটি অভিনয় ও চলন-ভঙ্গিমার জন্যে আমি সদা মুখিয়ে থাকতাম। কখনো স্কুলড্রেস পরে ব্যাগ কাঁধে সে নিষ্পাপ ফুলকলি, কখনো কলেজের ইউনিফর্মে প্রস্ফুটিত পুষ্প আর কখনো বৈবাহিক জীবনের একজন দায়িত্ব সচেতন রমণী।

আমার এ কলিজার টুকরা আজ আপাদমস্তক হতাশা আর নিরাশায় জর্জরিত হয়ে আমার বুকের সঙ্গে লেপ্টে ছটফট করছিল। আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেন আমার থেকে একটু সরিয়ে দিলাম এবং মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। লায়লা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো– "ভাইয়া ছাড়া এখনো পরিবারের আর কারো সাথে আমার দেখা হয়নি। না স্বামীর সাথে, না বাচ্চাদের সাথে আর আপনাদের কারো সাথে। ভাইয়ার অবস্থা খুবই খারাপ, আব্বু। সে খুব অস্থির হয়ে আপনাকে খুঁজছে। সে কেবল আপনার মাধ্যমে কিছু একটার আশা করে।

আমি লায়লার দিকে তাকিয়ে বললাম–

এ নির্বোধটা দুনিয়ার বুকেও মিথ্যা আশায় বুক বাঁধতো এখানে এসেও সে মিথ্যা আশায়ই বুক বাঁধছে। দুনিয়াতে তার আশা ও স্বপ্ন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, স্ত্রী ও সন্তানাদিকে ঘিরে, যার মাশুল এখন সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। আর এখন সে আশা দেখছে আমাকে দিয়ে, অথচ আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব না।

এতক্ষণে আছেমাও আমাদের নিকটে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমার সর্বশেষ কথাটি শুনে সে বললো–

"আঙ্কেল! আমার তো যত আশা-ভরসা সব আপনিই ছিলেন। কিন্তু এখন তো দেখছি আপনিও হতাশ করে দিচ্ছেন।"

"তোমার কি স্মরণ আছে আছেমা? তুমি প্রথম দিন যখন লায়লার সাথে আমাদের বাড়ি এসেছিলে তখন আমি তোমাকে কী বলেছিলাম?

"আপনি ওকে কী বলেছিলেন আমার স্মরণ আছে আব্বু" আছেমার পরিবর্তে লায়লা জবাব দিল।

"আপনি বলেছিলেন, মা তুমি হলে আমার মেয়ের বান্ধবী। দেখো, এমন বান্ধবী হও যেন জান্নাতেও তার সাথে থাকতে পার। এমন যেন না হয় যে, তোমরা আল্লাহকে নারাজ করে দিবে। ফলে কোনো খারাপ জায়গায় তোমাদের দু'জনকেই একসাথে থাকতে হবে। এমনও যেন না হয় যে, কেয়ামতের দিন একজন আরেকজনকে দোষারোপ করতে থাকবে যে, তোমার সাথে বন্ধুত্ব আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।"

শেষ বাক্যটি বলতে বলতে লায়লা আবারো কান্নায় ভেঙে পড়লো। তার সাথে আছেমাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। আমি ঘাড় ফিরিয়ে সালেহের দিকে তাকালাম। আমার ধারণা ছিল, সে হয়তো কোনো আশাব্যঞ্জক কথা বলতে পারবে। আমাকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে বলতে লাগলো–

"আবদুল্লাহ! সবার মুয়ামালাটা তো আল্লাহর হাতে। মানুষের আমল যদি সরিষার দানা পরিমাণও থাকে, তাও তার আমলনামায় সংরক্ষিত থাকবে।

প্রত্যেকটি আমল আজ পরীক্ষা করা হবে। নিয়ত, উপায়-উপলক্ষ, উসিলা, প্রেক্ষাপট, আমল এবং এর ফলাফল সবগুলো জিনিসকে এক এক করে যাচাই করা হবে। ফেরেশতাদের দিওয়ান ও তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সবকিছুই সাক্ষী প্রদান করবে। এমনকি এটাও নির্ধারণ হয়ে যাবে যে, প্রতিটি ভালো-মন্দ আমল কী প্রতিদান বা শাস্তির উপযুক্ত। নেককাজের প্রতিদান দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত, আর ধৈর্য ও দ্বীনের সহযোগিতায় কৃতকর্মের জন্য অগণিত, অসম প্রতিদান দেওয়া হবে। আর খারাপ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে ওই কাজের পরিমাণ অনুযায়ী। তবে শিরক, হত্যা, এবং যিনার মতো আপরাধ যদি আমলনামায় এসে যায় তাহলে এগুলো মানুষকে ধ্বংস করে ছাড়বে। আর এতিমের মাল খাওয়া, উত্তরাধিকারের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, অপবাদ লাগানো ইত্যাদি অপরাধ এতটাই মারাত্মক যে, এগুলো সমস্ত নেকীকে ধ্বংস করে মানুষকে জাহান্নামে পৌঁছে দিতে পারে। এটা হলো প্রতিদান ও শাস্তির সাধারণ নিয়ম। এর ভিত্তিতেই আল্লাহ তায়ালা ন্যায় সঙ্গত ফয়সালা প্রদান করবেন। বিশ্বাস রাখো, কারো প্রতি সরিষার দানা পরিমাণও জুলুম করা হবে না। তোমার সন্তানদের ব্যাপারে একটি আশাব্যঞ্জক কথা যা আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছিলাম তা এই যে, তোমার মতো অগ্রবর্তীদের ছাড়াও আজকের দিনে হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে সঠিক ঈমানদারগণও একটু আগে পরে মুক্তি পেয়ে যাবে। তবে তোমার সন্তানদের ব্যাপারে তুমিই আমার চেয়ে ভালো জানো, তাদের মুক্তির সম্ভাবনা কতটুকু?"

"আমার বেশি পেরেশানি আমার ছেলেকে নিয়ে।" জবাব দিলাম আমি। এ জবাবে আমার আশা-আকাজ্ক্ষা, হতাশা-আশঙ্কা সব জমা ছিল। আমি অধিক বিশ্লেষণ করে বললাম– "অর্থ উপার্জন, গাড়ি-বাড়ি এবং শিল্পপতি হওয়া বড় শখ ছিল ওর। এ শখ যাকে পেয়ে বসে তাকে যে কোনো খারাপ অবস্থায় নিক্ষেপ করতে পারে। এরপর অধিকাংশ মানুষ হালাল-হারাম এবং ভালো-মন্দ, পার্থক্য করা পর্যন্ত ভুলে বসে। হারাম উপার্জন থেকে বেঁচেও যদি যায় তবু অপচয়, উদাসীনতা, বিলাসিতা, কৃপণতা, অহংকার এবং অন্যের হক নষ্ট করার মতো মন্দ স্বভাবগুলো মানুষকে রব্বে কারীমের ওই কাঠগড়ায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় যেখান থেকে মুক্তি পাওয়াটা বড় কঠিন।"

"এ সমস্ত কথা লায়লা আমাকে বলতো। সে আপনার কিছু কিতাবও আমাকে পড়ার জন্য দিয়েছিল। কিন্তু আমি বাংলা ভালো পড়তে জানতাম না। আমার দুর্ভাগ্য যে, আমার সারাটা জীবন কেটেছে উদাসীনতা, দুনিয়াপূজা, অপচয় এবং অহংকারের ভেতর দিয়ে। লাবণ্যময়ী হওয়ার এক ভূত আমার কাঁধে সাওয়ার হয়েছিল। লাখ লাখ টাকা আমি গয়না-গাঁটি, কাপড়-চোপড় এবং প্রসাধনী কিনে

নষ্ট করে দিয়েছি। কিন্তু গরিবদের উদ্দেশ্যে আমি কখনো কিছুই খরচ করতে পারিনি। আর কখনো যদি দুয়েক টাকা খরচ করতামও, এটাকে মনে করতাম মহা অনুগ্রহ। অথচ আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে অঢেল ধন-সম্পদ দান করেছিলেন।

এটুকু নয়; আমার যদি কখনো রাগ উঠতো তাহলে নির্দয়ভাবে আমি এ রাগ ঝাড়তাম দুর্বলশ্রেণির লোকদের ওপর। শালীন পোশাক পরাটাকে আমি দারিদ্র্যের আলামত মনে করতাম। চোগলখোরি, গীবত এবং অন্যের দোষচর্চা ছিল আমার নিত্যকার ব্যাপার। এ সাধারণ ব্যাপারগুলো এত বড় রোগ হয়ে সামনে আসবে আমার জানা ছিল না।"

এটা বলে সে আবারো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। লায়লা ভারাক্রান্ত গলায় বললো—

"ওর আব্বু আম্মুর সাথে আমাদের দেখা হয়েছে। তাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। বলা যায় না, কী আচরণ করা হবে তাদের সঙ্গে।"

এরপর সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো— "আব্বু আমার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে?" এটুকু বলতেই তার দু'চোখ থেকে দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

"অপেক্ষা করো বাছা। আশা করা হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে যাবে। তখন আল্লাহর রহমতে আশা করি, এ পরিমাণ পেরেশানি ওঠানোর পর তিনি তোমার ওই সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। যেগুলোকে দুনিয়াতে তুমি সাধারণ মনে করেছিলে।"

"হায় আব্বু! আমি যদি আপনার আদর্শে চলতাম। আপনি তো আমাকে অনেক বুঝিয়েছিলেন, ঈমান শুধু মুখে কালিমা পড়ে নেওয়ার নাম নয়। প্রথাগত ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তার প্রয়োজন আত্মার দ্বীনদারি। নির্জীব কয়েকটি সেজদার প্রয়োজন তার নেই। তার প্রয়োজন সত্যিকারের আল্লাহপাগল একজন বান্দা। আমার জীবনে ঈমান তো ছিল কিন্তু তা আমার সত্তাটাকে বেষ্টন করতে পারেনি। আপনার বলার দ্বারা আমি নামায তো পড়তাম; কিন্তু আল্লাহর স্মরণ আমার জীবনের লক্ষ্য হতে পারেনি। রোযা তো আমি রাখতাম কিন্তু আমার মনে সত্যিকারের তাক্বওয়া সৃষ্টি হতে পারেনি। এগুলো তো আমার বেশি থেকে বেশি কয়েক বছর করতে হতো। এখানে তো উষ্ণতা আর ভয়াবহতার অস্থির চিত্তে ঘুরতে ঘুরতে শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেল।"

লায়লার কথা শুনে আছেমা তার কাঁধে হাত রেখে ফুঁপাতে ফুঁপাতে বললো— "বোন তুমি তো আমার থেকে ভালো। আমি তো জীবনে নামায-রোযা কিছুই করিনি। চারিত্রিক গুনাহ, লোক দেখানো, অপচয়, অহংকার এবং অন্যের হক নষ্ট

করা এগুলো তো আছেই। আমার কী হবে? আমার তো জাহান্নাম ছাড়া কোনো শেষ পরিণাম দেখতে পারছি না।" এটা বলে সে চিৎকার দিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগলো। এদের দু'জনের কথায় আমার অন্তর ফেটে যাচ্ছিল। এদের সাথে আর বেশিক্ষণ থাকার হিম্মত আমার হচ্ছিল না। সালেহ আমার অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। সে তাদের দু'জনকে সম্বোধন করে বললো–
"আবদুল্লাহকে এ মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে হবে। তোমরা দু'জন এখানে বসে আল্লাহর ফায়সালার জন্য অপেক্ষা করতে থাকো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে যাবে।"

এটা বলে সে আমার হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আমি চাচ্ছিলাম, যেতে যেতে লায়লাকে একটু সান্ত্বনা দেব। আমি পেছনে তাকিয়ে এটা দেখে ভীষণ পেরেশান হয়ে গেলাম যে, পেছনের দৃশ্য সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। আমরা অন্য কোনো স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

"আমি তোমাকে একটু দ্রুতই সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছি। অন্যথা তোমার আরো কষ্ট হতো। তুমি কি তোমার ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে?"
"না, আমি আর বেশি কিছু দেখার আগ্রহবোধ করছি না।"
আমি পরিষ্কার না করে দিলাম।

আমার অন্তর বিষণ্নতার গভীর সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল। আমার ক্ষমতায় ছিল না যে, আমি কোনোভাবে দুনিয়ায় ফিরে যাব এবং লায়লার সংশোধনকে জীবনের সবচে' বড় উদ্দেশ্য বানিয়ে নেব। আমার উপলব্ধি হয়ে গিয়েছিল যে, এটা এখন আর সম্ভব না। এরপর আশঙ্কার বিষাক্ত এক সাপ আমার সামনে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ালো।
আমি সালেহকে বললাম–
"সালেহ! লায়লার এ অবস্থায় আমার কোনো অপরাধ তো নেই? কোনোভাবে আমি এর জিম্মাদার তো নই?

"না এমন না। দেখ, নূহ আলাইহিস সালামের মতো নবীর সন্তানও তো শাস্তির শিকার হয়েছে। কিন্তু জিম্মাদারি তার ছিল না। মানুষের দায়িত্ব কেবল সত্য কথাগুলো অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কবুল করা না-করা সিদ্ধান্ত সর্বদা অন্যেই নিয়ে থাকে। তোমার মেয়ে লায়লা নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়েছিল। এজন্যে তার কষ্টের জিম্মাদার তুমি নও।"

কার রাজত্ব আজ

হাশরের মাঠের অবস্থা ছিল খুবই ভয়াবহ ও কষ্টদায়ক। একদিকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা, অন্যদিকে সবার মনে বিরাজ করছিল অজানা এক আশঙ্কা যে, সামনে কী হবে? হতাশা ও নিরাশার পাশাপাশি সবার ভেতর ছিল প্রচণ্ড রাগ ও ক্ষোভ। এ ক্ষোভ নিজের ওপরও ছিল এবং নিজের লিডার এবং পথভ্রষ্টকারী অনুসৃতদের ওপরও ছিল। কোনো লিডার যদি তার অনুসারীদের হাতের নাগালে চলে আসতো তখন অনুসারীরা তাকে ধরে বেধড়ক মারধর শুরু করতো। এ যেন আযাবের পূর্বেই আরেক মহা আযাব।

এ ধরনের ঘটনা তখন হাশরের মাঠে বিভিন্ন জায়গায় ঘটছিল। অনুসারীরা তাদের নেতাদেরকে, ছোটরা বড়দেরকে, ভক্তরা তাদের অনুসৃত ওলামা ও দরবেশদেরকে নির্দয়ভাবে পেটাচ্ছিল; আর নিজেদের ক্ষোভটা খানিকটা লাঘব করছিল। কিন্তু এখন কী লাভ! এ ধরনের পেরেশানি এবং বিপন্ন অবস্থার মানুষদের এমন হাস্যকর কাণ্ড অহরহ চোখে পড়ছিল।

আমরা এ ধরনের তামাশা দেখতে দেখতে সামনে এগুতে লাগলাম। রাস্তায় আমি সালেহকে বললাম– "আমি তো এটা চিন্তা করে পেরেশান হয়ে যাচ্ছি যে, দুনিয়াতে খানিক সময়ের লোডশেডিং এবং গরমে আমরা কত অস্থির হয়ে পড়তাম। এখানে সময় তো বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে কিন্তু মানুষ এ মসিবত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। তোমার সঙ্গে থাকার কারণে আমি তো এখানকার দুঃখ-কষ্টগুলো অনুধাবন করতে পারছি না। কিন্তু এখানে যারা আছে তাদের সাথে তো খারাপ মুয়ামালা করা হচ্ছে।"

"নিজের শব্দচয়ন ঠিক করে নাও। খারাপ করা হচ্ছে না, ইনসাফ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, মুয়ামালা কঠিন হচ্ছে তা সত্য। আর এজন্যেই তো সমস্ত সৃষ্টজীব মর্যাদা ও ক্ষমতার আমানতের বোঝা বহন করতে এবং শাস্তি ও প্রতিদানের এ কঠিন পরীক্ষায় অবতরণ করতে সাফ অস্বীকার করে দিয়েছিল।"

"আমার বুঝে আসছে না, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মুয়ামালা যদি এত কঠিন হয়; তাহলে যারা সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকে ক্ষমতা ও মর্যাদার বোঝা বহন করেছিল তাদের সঙ্গে কীরূপ মুয়ামালা হবে?"

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ালাম। সালেহ আরেক দিকে যেতে যেতে বললো– "এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ওই এলাকায়ই ঘুরাফেরা করছিলাম যেখানে সে সমস্ত

লোকেরা ছিল যাদের হিসাব-নিকাশ হবে। যারা ঈমান-আমলে অগ্রবর্তী তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মানে আরশের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কোনো হিসাব-নিকাশ হবে না। আনুষ্ঠানিকভাবে কেবল তাদের সফলতার ঘোষণা দেওয়া হবে। এদের মধ্যে কিছু হতভাগা এমন আছে যাদের বদ আমলের কারণে তাদের জাহান্নামের ফয়সালা পূর্বেই হয়ে গেছে। আমরা তাদের দিকেই যাচ্ছি।"

"আমরা যতই সামনে এগুচ্ছিলাম গরমের তীব্রতা এবং প্রখরতাও ততই বাড়ছিল। মানুষের শরীর থেকে গড়িয়ে পড়া উপচীয়মান ঘাম দেখে আমি এ অনুমান করতে পেরেছিলাম যে, মানুষের ঘাম ফোঁটায় নয় স্রোতের মতো গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু জমিন এতটাই উত্তপ্ত ছিল যে, এ ঘাম জমিনে পড়তেই জমিন তা চুষে নিতো। পিপাসায় মানুষের ঠোঁট বাইরে বেরিয়ে এসেছিল এবং তারা তীব্র পিপাসার্ত উটের মতো হাঁপাচ্ছিল। কিন্তু এখানে পানি আসবে কোত্থেকে?

তাদের চেহারাগুলোতে পেরেশানির চেয়ে কয়েকগুণ বেশি ভয়ের ছাপ দেদীপ্যমান ছিল। এ ভয় কীসের ছিল তাও অল্পক্ষণের মধ্যেই জানা হয়ে গেল। হঠাৎ মানুষের মাঝে এক আশ্চর্য হুলস্থুল বেঁধে গেল। সবাই এদিক ওদিক ছুটে পালাচ্ছিল। দেখলাম, এক ব্যক্তির পেছনে দু'জন ফেরেশতা দৌড়াচ্ছিল। আরশের ছায়ার দিকে যাওয়ার সময় আমরা যে ধরনের ফেরেশতা দেখেছিলাম এরা ঠিক তেমন। একজনের হাতে ছিল আগুনের চাবুক আরেক জনের হাতে ছিল পেরেক লাগানো চাবুক।

ওই ব্যক্তি এদের থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। কিন্তু এ ফেরেশতারা তার পিছু ছাড়ছিল না। তারা তার কাছে পৌঁছে তাকে একটি চাবুক মারতো এবং বলতো হে শাসক ওঠো এবং নিজের দেশে চলো। চাবুক খেয়ে ওই ব্যক্তি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে পড়তে ছুটে পালাতো। ফেরেশতারা তার পিছে দৌড়াতে থাকতো। ওই ব্যক্তির পরিচয় জানার জন্যে আমার বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। সালেহ নিজ থেকেই বললো–
"এ তোমাদের রাষ্ট্রপ্রধান।"

একটু পরেই ওই রাষ্ট্রপ্রধান আগুন ও পেরেকবিশিষ্ট চাবুক খেয়ে জমিনে লুটিয়ে পড়লো। এরপর ফেরেশতারা তাকে লম্বা এক শিকল দিয়ে বাঁধতে শুরু করলো। শিকলের কড়াগুলো আগুনে পুড়িয়ে লাল করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপ্রধান অস্থির হয়ে ছটফট করছিল এবং একটু দয়ার জন্যে আকুতি-মিনতি করছিল। কিন্তু এ ফেরেশতারা তো জানতোই না দয়া কী জিনিস? তারা নির্দয়ভাবে তাকে বাঁধতে থাকলো। তার গোটা দেহ যখন শিকল দিয়ে শক্তভাবে বাঁধা হলো, তখন আরো কিছু ফেরেশতা আসলো। পূর্বের ফেরেশতারা এদেরকে বললো–

"আমরা রাষ্ট্রপ্রধানকে ধরে ফেলেছি। তোমরা গিয়ে এর সহযোগী, তোষামোদকারী এবং সাথিদেরকে ধরে নিয়ে আসো, যারা জুলুম ও অপরাধকর্মে এ হতভাগার সহযোগী হিসেবে কাজ করতো।"

সমাবেশে বড় ধরনের হুলস্থুল পড়ে গেল। দৌড়া দৌড়ি এবং মারপিট শুরু হয়ে গেল। অল্প সময়ের মধ্যেই এমপি, মন্ত্রী, উপদেষ্টা, উকিল-ব্যারিস্টার, তালুকদার, জমিদার, শিল্পপতি এবং সব ধরনের জালেমদের বিশাল এক দল গ্রেফতার হয়ে গেল। এরপর ওই ফেরেশতারা সবাইকে মাথার চুল ধরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা যখন আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল তখন তাদের চামড়া পোড়ার দুর্গন্ধ আমাদের নাকে আসতেই সালেহ আমার কোমরে হাত রাখলো। এতে আমি খানিকটা স্বস্তি বোধ করলাম। তাদেরকে আমাদের সামনে দিয়ে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি তাদেরকে হেঁচড়ে নেওয়ার কারণে জমিনে সৃষ্ট দাগ এবং রক্তের ছোপ দেখছিলাম। যা তাদের শরীর থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছিল।

এ ঘটনা দেখে মনের অজান্তেই আমার ঠোঁট থেকে একটি আহ্! বেরিয়ে এলো। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম–

"কোথায় গেল এদের ক্ষমতা? কোথায় গেল এ আরাম আয়েশের দিন? কোথায় গেল ওই সুউচ্চ প্রাসাদ, দামি দামি কাপড়, মূল্যবান গাড়ি, মান ও মর্যাদা, বহির্দেশে ঘুরে বেড়ানো এবং জাঁকালো জীবন প্রবাহ? আহ্! এ লোকগুলো সাধারণ এবং ক্ষণিকের মজার জন্যে কত কঠিন শাস্তি বেছে নিয়েছিল।

সালেহ বললো–

"এরা সবাই ছিল জালেম এবং আয়েশী লোক। এদের ধ্বংসের ফয়সালা দুনিয়াতেই হয়ে গিয়েছিল। এতৎসত্ত্বেও এটা কিন্তু এদের আসল শাস্তি নয়। আসল শাস্তি তো দেওয়া হবে জাহান্নামে। ফেরেশতারা তাদেরকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছিল সেদিকে জাহান্নাম একদম নিকটে ছিল। সেখান থেকেই এদেরকে হিসাব-নিকাশের জন্যে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে তাদেরকে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা এবং শাস্তির ফয়সালা শোনানো হবে। এরপর তাদেরকে দ্বিতীয়বার বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখান থেকে তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করায় অনিচ্ছাকৃত আমার সময়ের কথা স্মরণ হয়ে গেল। আমি সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম–

"সালেহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ কবুল হয়েছে তো অনেকক্ষণ হলো। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ হিসাব-নিকাশ শুরু হচ্ছে না কেন?

"এটাতো তুমি বুঝতেছ যে, অনেক দীর্ঘ সময় হয়ে গেছে। হাশরের মাঠে খুব মন্থর গতিতে সময় অতিবাহিত হচ্ছে, এজন্যেই দীর্ঘ সময় মনে হচ্ছে। আরশের নিচে খুব অল্প সময় অতিবাহিত হয়েছে। এতটুকু সময়ও কেন মনে হচ্ছে, তুমি কি জান?

"তুমিই বলেছিলে, সকল মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে, এ ভয়াবহতা তাদের ক্ষমা লাভের একটি উসিলা।

"হ্যাঁ, এটা একটা কারণ। দ্বিতীয় কারণ হলো মানুষের ভেতর এ অনুভূতি সৃষ্টি করা যে, এখানে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে।

কথা হলো আবদুল্লাহ! মানুষ তাদের পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু প্রভুর শুকরিয়া আদায় করেনি। ওই প্রভু আজ সবাইকে এ কথা বুঝিয়ে দিচ্ছেন, সকল মানুষ কত নিরুপায় কত অসহায়।

তার শক্তি ও ক্ষমতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল কেয়ামতের দিনে, যেদিন মানুষের দুনিয়া ধ্বংস হয়ে সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। মানুষের তাবৎ ক্ষমতা তাদেরকে কেয়ামতের বিভীষিকায় আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারেনি। দ্বিতীয় বহিঃপ্রকাশ ঘটতে যাচ্ছে আজ হাশরের দিনে। এতক্ষণে একথা সবারই বুঝে এসে গেছে যে, আল্লাহর সামনে কারো কোনো ক্ষমতা বা মর্যাদা বলতে কিছু নেই। তৃতীয় বহিঃপ্রকাশ ঘটবে হিসাব-নিকাশের সময়, যখন আল্লাহ তায়ালা আসমান জমিনের নিয়ন্ত্রণ সরাসরি নিজের হাতে নিয়ে নেবেন।

"তাহলে কি এখনো এমন হয়নি?"

"না এখনো এমন হয়নি। বাহ্যত দুনিয়ার নেয়ামত এখনো ফেরেশতারাই চালাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শুধু হুকুম দিচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এ সবকিছু তিনি স্বয়ং নিজের হাতে নিয়ে নেবেন। যেন মানুষ, জিন ও ফেরেশতাসহ সকল সৃষ্টজীব বুঝে নিতে পারে যে, তাবৎ শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে। ইতিমধ্যে সকল আসমানের বিস্তৃত দুনিয়া যেগুলো সীমাহীন দূরত্বে প্রসারিত ছিল সেগুলোকে সঙ্কোচন করা শুরু হয়েছে। তোমার তো জানা থাকার কথা, পেছনের জীবনে এ দুনিয়া প্রতি মুহূর্তে বিস্তৃত হচ্ছিল। এখন আল্লাহর নির্দেশে এ দূরত্ব কমে যাচ্ছে এবং অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র ও তারকারাজি যা গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তা কাছাকাছি চলে আসছে।

"এমন কেন হচ্ছে?" আমি পেরেশান গলায় বললাম "এটা এজন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা এসবগুলোকে জান্নাতীদের মাঝে পুরুস্কার হিসেবে বিলিয়ে দেবেন। এরপর সমস্ত জায়গায় আল্লাহ তায়ালার পুরুস্কারপ্রাপ্ত বান্দাদের ক্ষমতা ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। দুনিয়াকে পুনরায় সঙ্কোচন করাটাই ঐ বস্তু যাকে কোরআনে আসমানসমূহকে আল্লাহ তায়ালার ডান হাতে গুটিয়ে নেওয়ার দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।"

এরপর সালেহ আকাশের দিকে তাকালো। আমিও তার অনুকরণে ওপরের দিকে তাকালাম। সূর্য নিয়মমাফিক জ্বলছিল। আমি প্রথমবার এ কথা নোট করলাম যে,

চন্দ্র ও সূর্যের নিকটেই ছিল কিন্তু তা আলোহীন হয়ে পড়েছিল এবং বড় মন্থর গতিতে সূর্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তা দেখে সালেহ বললো–

আসমান-জমিনে আজ আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জমিন ফুলে বড় হয়ে গেছে এবং তার বেষ্টনি কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আজ তাতে কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ জমিন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর ও নান্দনিক হয়ে গেছে। ইসরাফীল দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁ দিয়েছিল। প্রথম ফুঁতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল আর দ্বিতীয় ফুঁতে মানুষদেরকে জীবিত করে দেওয়া হয়েছে। এ দুই ফুঁয়ের মাঝখানে আল্লাহর নির্দেশে জমিন বড় হয়েছে আর ফেরেশতারা এর উপর জান্নাতীদের জন্যে উন্নত বাড়ি, সুউচ্চ প্রাসাদ, দৃষ্টিনন্দন বাগান এবং তাদের প্রশান্তি ও আনন্দ উল্লাসের জন্য সুন্দর সুন্দর জিনিস আর তোমাদের জন্য অভাবিত এক সুন্দর দুনিয়া বানিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেক জান্নাতীকে তার বাড়ি এ জমিনেই দেওয়া হবে। থাকা-খাওয়া ও বসবাসের জন্য প্রত্যেককে দেওয়া হবে বিশাল বিশাল জায়গা। পক্ষান্তরে জমিনের গর্ভে প্রজ্বলিত আগ্নেয়গিরী আর উত্তপ্ত জলাধারের মাঝখানে হবে জাহান্নামীদের ঠিকানা। আমি তার কথার সারাংশ বলতে গিয়ে বললাম, তুমি যা কিছু বলেছ কোরআনের বর্ণনা দ্বারা এ ব্যাপারে আমার পূর্ব থেকেই ধারণা ছিল। কোরআনের বর্ণনা দ্বারা এটা জানা ছিল যে, জমিনের উত্তরাধিকারী হবে আল্লাহর নেক বান্দারা। জমিনের পৃষ্ঠদেশকে জান্নাতে রূপান্তরিত করা হবে যেখানে থাকবে জান্নাতীদের আবাস। আর জমিনের তলদেশে থাকবে জাহান্নামীরা। এদিকে আকাশ সমূহের তাবৎ গ্রহ-নক্ষত্র ও তারকারাজি পুরস্কার স্বরূপ জান্নাতিদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

"এর ব্যাখ্যা দরবারের দিন বুঝে আসবে। দরবারের কথা স্মরণ আছে তো?
"হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে হিসাব-নিকাশ শেষে আল্লাহ তায়ালার সাথে জান্নাতীদের যে বৈঠক হবে তাকে দরবার বলে। ওই বৈঠকে প্রত্যেক জান্নাতীকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার মর্যাদা ও দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এটা হবে মানুষদের জন্য তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভের সুবর্ণ সুযোগ এবং নৈকট্যশীলদের সম্মান প্রদর্শনের এক বিশেষ ব্যবস্থা।

"হ্যাঁ, ওই দিন পুরস্কারও দেওয়া হবে এবং দায়িত্বও বলে দেওয়া হবে। এতক্ষণে আলোকহীন চন্দ্র সূর্যের মধ্যে ঢুকে গেছে। তা দেখে সালেহ বললো, আসমানে স্থিত নিদর্শনসমূহ পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। চন্দ্র সূর্যের মধ্যে ঢুকে পড়া এরই একটি আলামত। এর অর্থ হলো, গোটা আসমানকে গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন যেকোনো মুহূর্তে গোটা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা আত্মপ্রকাশ

করবেন এবং ওই আদালত শুরু হয়ে যাবে যার অপেক্ষায় সবাই অপেক্ষামান। তখন তুমি ও সমগ্র দুনিয়াবাসী জানতে পারবে, আল্লাহ কত উঁচু ও মহান সত্তার নাম। সালেহের কথা শেষ না হতেই বিকট শব্দে একটি বিস্ফোরণ হলো। এতে সকল মানুষ কেঁপে ওঠলো। আওয়াজটা যেহেতু আকাশের দিক থেকে এসেছিল, তাই সকলের দৃষ্টি উপরের দিকে ওঠে গেল।

আমি এবং সালেহও সবার মতো উপরের দিকে তাকালাম, এক আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়লো। আসমানে ফাটল ধরে গিয়েছিল এবং দেখতে দেখতেই তা মেঘের মতো ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এ ফাটলগুলো দেখে মনে হচ্ছে, যেন আকাশে অগণিত দরজা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ছিদ্র দিয়ে ফেরেশতারা দলে দলে জমিনের দিকে নামতে লাগলো। তারা সংখ্যায় এতই অধিক ছিল যে, তা গণনা করা বা অনুমান করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। ফেরেশতাদের বিভিন্ন দল ছিল, প্রত্যেক দলের ধরন ও ইউনিফর্ম ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা হাশরের মাঠের মাঝখানে একটি জায়গায় নামতে শুরু করলো। তারা মাঝখানে অবস্থিত একটি বিশাল ও উঁচু উন্মুক্ত প্রান্তরকে তাদের পরিধির ভেতরে নিয়ে নিল।

ফেরেশতারা আসমান থেকে নামতো আর গোল গোল হয়ে হাত বেঁধে আদবের সহিত দাঁড়িয়ে যেত। এতক্ষণে মানুষের শোরগোলও থেমে গিয়েছিল। বিবর্ণ চোখে সবাই ওই দিকে অপলক তাকিয়ে ছিল। মাঠে এখন কেবল একটি মৃদু গুঞ্জন ভেসে বেড়াচ্ছে। এর কারণ সবাই একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে এটা কি হচ্ছে? কী হতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে আমার কিছুটা ধারণা ছিল। তারপরও সালেহ থেকে ব্যাপারটি পরিষ্কারভাবে জানতে চাইলাম। সে উত্তর দিল–

"হিসাব-নিকাশ শুরু হতে যাচ্ছে। আল্লাহর আদালত প্রস্তুত করা হচ্ছে। এটা এর প্রথম ধাপ। ফেরেশতারা ধারাবাহিকভাবে নামছে এবং দীর্ঘক্ষণ নামতে থাকবে। এদের সবার শেষে আরশ বহনকারীরা নামবে। তুমি তো ওদের সাথে সাক্ষাৎ করে ফেলেছ। তখন ওরা ছিল চারজন। এখন আরো চারজন ওদের সাথে শামিল হবে। সর্বমোট আটজন ফেরেশতা আল্লাহর আরশকে বহন করবে।"

"আল্লাহর আরশ!" আমি অবাক গলায় শব্দ দুটি উচ্চারণ করলাম। সালেহ বিষয়টি আরো পরিষ্কার করতে গিয়ে বললো– তুমি তো জানই, আল্লাহ তায়ালা আরশের উপরে বসেন না। তিনি এ ধরনের সমস্ত মানবিক গুণ থেকে পবিত্র। এ আরশ মূলত সকল সৃষ্টজীবকে একত্রিত করার জায়গা। যেমন কিবলাস্বরূপ দুনিয়াতে ছিল আল্লাহর ঘর। "আল্লাহর ঘর" এর অর্থ এই নয় যে, তিনি সেখানে থাকতেন। কিন্তু মানুষ যখন ওই দিকে ফিরে নামায পড়তো তখন তা একটি

কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতো। তদ্রূপ আজ মানুষ আল্লাহর আরশের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কথা বলবে।

আমি বললাম–

"তার মানে কি মানুষ আল্লাহর কথা শুনবে?"

সালেহ জবাব দিল–

"হ্যাঁ, ঠিক তেমনি শুনবে যেমন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম একটি গাছের থেকে আল্লাহর আওয়াজ আসতে শুনেছিলেন। হ্যাঁ, আবদুল্লাহ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনে নাও।

আমার পূর্ণ মনোযোগ তো পূর্ব থেকেই ছিল। এখন পূর্ণ একাগ্রতা নিয়ে আমি তার দিকে তাকালাম।

"আরশ বহনকারীরা নামার সাথে সাথেই আরশ আল্লাহর নূরের তাজাল্লীতে চমকাতে থাকবে। তখন পুরো জমিনে আল্লাহর নূরের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। অর্থাৎ, জমিন স্বীয় প্রতিপালকের নূরে আলোকিত হয়ে ওঠবে। আর তখন সব কিছু স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতে শুরু করবে। কোরআনে যে বলা হয়েছে জমিনকে আল্লাহ নিজের মুঠোয় নিয়ে নিবেন, এর মানে এটাই। তখন সর্বপ্রথম নির্দেশ দেওয়া হবে সবাই আল্লাহর সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ার জন্য। আবদুল্লাহ তখন অনেক শিক্ষণীয় দৃশ্য চোখে পড়বে। তুমি দেখবে, সকল ফেরেশতারা সেজদায় পড়ে যাবে। আরশের ডান দিকে আরশের নিরাপদ ছায়ায় অবস্থানরত সমস্ত নবী-রাসূল, সিদ্দীকীন, শুহাদা এবং সালেহীন সবাই সেজদায় লুটিয়ে পড়বে। মনের অজান্তে আমি জিজ্ঞেস করে বসলাম–

"আর এখানে হাশরের মাঠে উপস্থিত লোকেরা?"

"গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় ব্যাপার এটাই। এখানে উপস্থিত কাফের, মুনাফেক এবং আল্লাহর নাফরমান ব্যক্তি সেজদায় যেতে পারবে না। এরা শত চেষ্টা করবে সেজদায় যেতে, কিন্তু তাদের কোমর ও গর্দান তক্তার মতো শক্ত হয়ে যাবে। জমিন তাদেরকে নিজের দিকে আসতে বারণ করবে।"

"আর বাকিরা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সালেহ বললো–

বাকিদের থেকে যাদের আমল বেশি গুনাহ কম তারা সেজদায় চলে যাবে। আর এজন্যই তাদেরকে তৎক্ষণাৎ হিসাব-নিকাশের জন্য ডেকে নেওয়া হবে। যার ঈমান যতটা মজবুত ও আমল যতটা ভালো হবে সে ততটাই ঝুঁকতে সক্ষম হবে। কেউ পূর্ণ ঝুঁকতে পারবে আর কেউ কেবল গর্দানটাই ঝোঁকাতে পারবে। যে যতটা কম ঝোঁকাতে পারবে সে ততো বেশি অপদস্ত হবে।"

কথা বুঝতে আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম–
"আচ্ছা এর মানে, মানুষ তখন নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নিয়ে নিতে পারবে।"
সালেহ বললো–
"না। সে কথা আমি তোমাকে বলছি। তাদের এ অনুমান করতে পেরে এক ধরনের প্রশান্তি অর্জিত হবে। তবে মানুষ এ কথা খুব ভালোভাবেই জেনে নিবে আল্লাহ কে? যে সত্তাকে ভুলে জীবন অতিবাহিত করেছিল তিনি কে? আজ সবার জানা হয়ে যাবে রাজাধিরাজ কে? প্রকৃত উপাস্য কে? তিনি কে যার ক্ষমতায় এ পৃথিবী পরিচালিত হয়? কোন সে সত্তা যার হাতে সমগ্র ভালো ও কল্যাণের চাবিকাঠি? কে তিনি যার ইশারায় ভাগ্য প্রসারিত এবং সংকুচিত হয়? কোন সে মহান যিনি প্রত্যেককে তার প্রতিটি আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে পারেন, কিন্তু তার কোনো ফয়সালার ব্যাপারে কেউ তাকে জিজ্ঞেস করতে পারে না? কে তিনি যিনি প্রতিটি প্রশংসা, প্রতিটি শুকরিয়া, প্রতিটি ক্বিয়াম, প্রতিটি রুকু, প্রতিটি সেজদা, প্রতিটি প্রার্থনা, প্রতিটি মিনতি, প্রতিটি ভালোবাসা, প্রতিটি তাসবীহ এবং প্রতিটি তাকবিরের উপযুক্ত সত্তা? তিনি সেই সত্তা যিনি বড় মহান। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার।"

"এ বাক্যগুলো বলতে সালেহের শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেল। সর্ব শেষ আল্লাহু আকবার বলে সে সেজদায় লুটিয়ে পড়লো। তখনই আমার অনুভব হলো, জমিনে বিশেষ এক ধরনের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। চারিদিকে নূর চমকাতে লাগলো। এর সাথে সাথেই তাসবীহ, তাহলীল, হামদ, শুকর, স্তুতি এবং বড়ত্ব বর্ণনার আওয়াজ আসতে লাগলো। আমার অনুভূত হয়ে গেল যে, আল্লাহর আরশের তাজাল্লীতে চারপাশ আলোকিত হয়ে গেছে। এত কিছু হওয়ার মাঝেও আমি দৃষ্টি অবনত করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভয়ে আরশের দিকে তাকাবার চেষ্টাটুকুও করিনি।
খানিকক্ষণ পরেই আমার কানে হযরত জিবরীল আমীন আলাইহিস সালামের কণ্ঠে অত্যন্ত পরিচিত; কিন্তু ভীতিসঞ্চারক ক্রমশ উঁচু হতে থাকা একটি আওয়াজ ভেসে এলো– لمن الملك اليوم (আজকের দিনে রাজত্ব কার?) জবাবে সকল ফেরেশতা গলা ফাটিয়ে বললো–لله الواحد القهار (পরাক্রমশালী এক আল্লাহর।) জিবরীল আলাইহিস সালাম বারবার এ প্রশ্ন আওড়াচ্ছিলেন। ফেরেশতারাও উচ্চ আওয়াজে প্রতিবার একই উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। এ কাজটি হাশরের মাঠে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করল যে, প্রতিটি হৃদয় কাঁপতে লাগল। সবশেষে একটি আওয়াজ উঁচু হলো–
"রহমানের বান্দারা কোথায়? বিশ্বপ্রতিপালকের গোলামরা কোথায়? আল্লাহ তায়ালাকে নিজেদের মাবুদ, নিজেদের বাদশাহ এবং নিজেদের প্রভু

স্বীকারকারীরা কোথায়? তারা যেখানেই থাকুক সবাই যেন বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।"

এটা শুনে আশেপাশের কোনো কিছু লক্ষ্য করা ছাড়াই সালেহের সাথে আমিও সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম।

হাশরের মাঠে সুনসান নীরবতা ছেয়ে গেল। পরিবেশ এতটাই নিস্তব্ধ ছিল যে, জমিনে একটি সুঁই পড়লেও তার আওয়াজ শোনা যেত। আমি সেজদারত অবস্থায় যতটা প্রশান্তি তখন অনুভব করছিলাম, জীবনে কোনো দিন তা অনুভব করিনি। অন্যরা সেজদায় কী বলছিল তা জানা ছিল না, তবে আমি তখন অনুনয় বিনয় করে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে আমার গুনাহ মাফ ও ক্ষমার প্রার্থনা করছিলাম।

না-জানি কতক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজমান ছিল! হঠাৎ উঁচু থেকে একটি আওয়াজ ভেসে এলো– "هو الله لا اله إلا هو"

এ অভিজ্ঞতা আমার পূর্বেই হয়েছিল যে, আরশ বহনকারীদের এ এলানের অর্থ হলো, উপস্থিত লোকদেরকে এ কথা বুঝানো যে, এখন আরশের মালিক কথা বলছেন। আওয়াজ এলো–

"আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।"

এগুলো ছিল সে সমস্ত শব্দ যেগুলো আমি আরশের নিকটে সেজদারত অবস্থায় প্রথমবার শুনেছিলাম। তবে এ আওয়াজও ঐ আওয়াজের মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। এ আওয়াজের মধ্যে যে বড়ত্ব, মাহাত্ম্য ও কঠোরতা ছিল তা বড় বড়দের অস্তিত্বকে পানি করার জন্য যথেষ্ট। কিছুক্ষণের জন্য চারদিকে ভীতিপ্রদ এক নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়লো। এরপর বজ্রনিনাদের চেয়েও বহুগুণ জোরে আওয়াজ হলো– انا الملك، اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ اين ملوك الأرض؟

"আমিই বাদশাহ, কোথায় আছে প্রতাপশালীরা? কোথায় আছে অহংকারীরা, আর কোথায় দুনিয়ার বাদশাহরা?"

মানুষ এর জবাব কোত্থেকে দিবে, চারদিকে বরং কান্নার রোল পড়ে গেল। এ আওয়াজে যেই কঠোরতা এবং ভীতি ছিল এর দ্বারা আমার মাঝে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল। জীবনে সে সমস্ত মুহূর্তগুলো আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠল যেগুলোতে আমি নিজেকে শক্তিশালী, বড়, প্রতাপশালী, দাপুটে মনে করতাম। ঐ সময় আমার খুব ইচ্ছে করছিল যে, জমিনটা ফেটে যাক আর আমি তাতে ঢুকে পড়ি। আমি কোনো ভাবে আল্লাহর ক্রোধের সামনে থেকে সরে যাই। চূড়ান্ত অবস্থায় আমার মুখ থেকে এ শব্দ বেরোল–

"হায়! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিত"

এটা বলতেই আমার ইন্দ্রিয়গুলো ক্রিয়াশূন্য হয়ে পড়লো আর আমি বেহুঁশ হয়ে জমিনে পড়ে গেলাম।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সাক্ষ্য

আমার চোখ খুলতেই নিজেকে আমি আবিষ্কার করলাম অতি উন্নত নরম তুলতুলে এক বিছানায়। নাঈমা আমার শিয়রে বসে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার চোখ খুলেছে দেখে ওর চেহারায় খুশি ঝিলিক দিয়ে ওঠলো। রাজ্যের কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলো–

"আপনি ঠিক আছেন তো?"

"আমি কোথায় আছি?" উত্তর না দিয়ে আমি উল্টো প্রশ্ন করে বসলাম।

"আপনি আমার কাছে তাঁবুতেই আছেন। সালেহ আপনাকে বেহুঁশ অবস্থায় এখানে রেখে গেছেন।"

"সে এখন কোথায়?"

"সে বাইরে আছে। আমি তাকে ভেতরে ডাকছি।"

নাঈমার কথা শেষ না হতেই সালেহ সালাম দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। তার চেহারায় ছিল মুচকি হাসির আভা। তাকে দেখে আমি ওঠে বসলাম এবং বললাম–

"কী হয়েছিল?"

"তুমি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলে।"

"কসম খোদার, আমি স্বীয় প্রতিপালকের এ রূপ প্রথমবার দেখেছিলাম। আল্লাহর ব্যাপারে আমার সমস্ত কল্পনা-জল্পনা ভুল ছিল। আমি যতটুকু কল্পনা করতাম তার থেকে তিনি বহুগুণ বড় ও মহান। এখন আমার জীবনের ওই মুহূর্তগুলোর জন্যে বড়ই আফসোস হয়, যেগুলোতে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের অনুভূতি আমার মাঝে ছিল না। আমার কথা শুনে সালেহ বললো–

"দৃশ্য ও অদৃশ্যের পার্থক্য এখানেই। দুনিয়াতে আল্লাহ অদৃশ্য থাকতেন। আজই প্রথমবার তিনি অদৃশ্যের পর্দা ওঠিয়ে দিয়ে মানুষকে সরাসরি সম্মোধন করছিলেন। তুমি বড় ভাগ্যবান, তুমি না দেখেই আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলে এবং নিজেকে তার সামনে নিরীহ অসহায় হিসেবে পেশ করেছিলে। এজন্যে আজ তোমার ওপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের দৃষ্টি রয়েছে।"

"কিন্তু তিনি বেহুঁশ কেন হয়েছিলেন?" কথার ফোঁড়ন কেটে নাঈমা বললো–

"মূলত ব্যাপারটা ছিল এই, আমরা আরশের বামে অপরাধীদের অঞ্চলে দাঁড়ানো ছিলাম। ওই সময়ই ফেরেশতারা নামতে শুরু করলো এবং হিসাব-নিকাশ আরম্ভ

হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু ক্রোধান্বিত অবস্থায় কথা বলা শুরু করেছিলেন, আর অসন্তুষ্টির মূল উদ্দিষ্ট ছিল বাম দিকের লোকেরাই। এজন্যে এ ক্রোধের প্রভাবটা সবচে' বেশি বাম পাশে পড়েছে। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় গুণ দ্বারা কখনো পরাভূত হন না। তাই এত ক্রোধ সত্ত্বেও তাঁর এ অনুভূতি ছিল যে, এ মুহূর্তে তাঁর এক প্রিয় বান্দা বাম দিকে অবস্থান করছে। এজন্যই তিনি আবদুল্লাহকে বেহুঁশ করে দিলেন। যদি এমনটি না করতেন তাহলে বাম দিকে অবস্থিত লোকদের মতো আবদুল্লাহকেও আল্লাহর এ ক্রোধ ও গোস্বার শিকার হতে হতো।'

সালেহের কথা শুনে মনের অজান্তেই রব্বে কারীমের কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ থেকে অশ্রু নেমে এলো। আমি বিছানা থেকে নেমে সেজদায় পড়ে গেলাম। আমার মুখ থেকে আপনা আপনিই এ শব্দগুলো বেরুতে লাগলো– 'খোদা হে! তুমি কখন আমাকে স্মরণ রাখনি। মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তোমার কোনো ব্যস্ততা আমাকে তোমার স্মৃতি থেকে বিস্মৃত করতে পারেনি। আর আমি? আমি কখনো তোমার মহান সত্তার কদর করিনি। আমি কখনো তোমার কোনো অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করিনি। আমি কখনো তোমার ইবাদতের হক আদায় করিনি। তুমি পূতপবিত্র। তুমি মহান। সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া শুধু তোমারই জন্য। আমাকে ক্ষমা করো এবং তোমার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করো। তুমি যদি ক্ষমা না করো তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব, আমি ধ্বংস হয়ে যাব।'

দীর্ঘক্ষণ আমি এ দুআটাই করতে থাকলাম। নাঈমা আমার পিঠে হাত রেখে বললো–

'এবার ওঠুন। আপনি তো সারাজীবন আল্লাহর মর্জি ও পছন্দ মাফিক কাটিয়েছেন। আমি আপনার ব্যাপারে খুব ভালো জানি।'

নাঈমার কথা শুনে আমি চুপচাপ উঠে দাঁড়ালাম। তার দিকে তাকিয়ে বললাম–

'তুমি এখানে আল্লাহর অনুগ্রহ ও বড়ত্ব সম্পর্কে কিছুই জান না। অন্যথা এ ধরনের কথা বলতে পারতে না।'

'আবদুল্লাহ ঠিক বলছে, নাঈমা।' আমাকে সমর্থন করে সালেহ বললো।

'মানুষের বড় থেকে বড় আমলও আল্লাহর অতি নগণ্য অনুগ্রহের সামনে কিছুই না। আল্লাহ আবদুল্লাহর বাকশক্তি ছিনিয়ে নিলে এ একটি কথাও সে বলতে পারতো না। হাত ছিনিয়ে নিলে লিখতে পারতো না। প্রতিটি কাজ তার তাওফীকেই সম্পাদিত হতো। তার তাওফীক ছাড়া মানুষের কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না।'

'আপনি ঠিক বলেছেন। আমি ব্যাপারটি নিয়ে কখনো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখিনি।' স্বীকারোক্তিমূলক মাথা নাড়াতে নাড়াতে নাঈমা বললো। 'এখন আমাদের কোথায় যেতে হবে?' আমি সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম।

'হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে গেছে। তোমাকে ওখানে যেতে হবে, কিন্তু আগে একটি খুশির সংবাদ শুনে নাও।'

'সেটা কি?'

'হিসাব-নিকাশ যখন শুরু হলো তখন আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম উম্মতে মুসলিমার হিসাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ওই হিসাব গ্রহণের সময় তোমার মেয়ে লায়লা মুক্তি পেয়ে গেছে।'

'কী?' রাজ্যের আশ্চর্য ও খুশিতে আমি চিল্লিয়ে উঠলাম।

'হ্যাঁ সালেহ ঠিক বলছে।' নাঈমা বললো।

'আমি তার সাথে দেখা করেছি। সে বাকি ভাই-বোনদের সাথে অন্য তাঁবুতে আছে। সেখানে সবাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'আর জমশেদ।' আমি সালেহকে আমার বড় ছেলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম।' জবাবে বিষণ্নতাপূর্ণ এক নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি বললাম–

'তাহলে আমি আবারো হাশরের মাঠে ফিরে যেতে চাই। হতে পারে কোনো একটা রাস্তা বেরিয়ে আসবে।'

'ঠিক আছে। সালেহ বললো এবং আমার হাত ধরে তাঁবুর বাইরে চলে এলো।

. . . . .

তাঁবু থেকে বেরিয়েই আমার সর্বপ্রথম প্রশ্ন ছিল–

'আমি জমশেদের জন্য কী করতে পারবো?'

'তুমি লায়লার জন্যে কিছুই করতে পারনি। তাহলে জমশেদের জন্যে কীভাবে করবে? তুমি কি আল্লাহ তায়ালাকে তার করণীয় বোঝাতে চাচ্ছ?'

'আস্তাগফিরুল্লাহ। আমার উদ্দেশ্য মোটেও এটা ছিল না।' আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম। সালেহের কথায় জমশেদকে বাঁচানোর আগ্রহ আমার ওঠে গিয়ে ছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম–

'আচ্ছা তা বলো, আমি বেহুঁশ হওয়ার পর হাশরের মাঠে কী হয়েছিল?'

'তোমার যখন হুঁশ ছিল তখনো তো তুমি পুরোপুরি জানতে না সেখানে কী হচ্ছিলো? তা যদি জানতে চাও তাহলে কোনো অপরাধীকে জিজ্ঞেস করো। এদিকে দলে দলে ফেরেশতা নামছিল আর ওদিকে অপরাধীরা কঠিন বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল। পরে যখন সেজদায় যাওয়ার ঘোষণা হলো তখন সমস্ত মানুষ সেজদায় লুটিয়ে পড়লো। কিন্তু হতভাগারা তখনো আল্লাহর সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে ছিল।'

'এটা কি তাদের কোমর তক্তা হয়ে যাওয়ার ফলাফল ছিল?' 'হ্যাঁ এটা ছিল তাদের শাস্তি। এরপর যখন আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করলেন, আমি বাদশাহ, আমি ছাড়া অন্য বাদশাহরা কোথায়? তখনো এ পাপিষ্ঠরা বুক টান করে তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। হায়! যদি তুমি দেখতে পারতে এ পাপিষ্ঠদের সাথে কীরূপ আচরণ হচ্ছিল। তাদের হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, কলিজা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। ভয় ও আতঙ্কে চোখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পাপিষ্ঠরা অসহায়ত্বের দরুন নিজেদের আঙুল কামড়াচ্ছিল। কিন্তু তারা অপারগ ছিল ফলে ওই সময়ও নিখিল বিশ্বের বাদশাহ আল্লাহ তায়ালার সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে ছিল।'

'এরপর কী হলো?'

'এটা তো স্পষ্ট যে, হিসাব-নিকাশ তো হওয়ার ছিল একজন একজন করে ভিন্নভাবে। কিন্তু ওই সময় পাপিষ্ঠদের সামনে তাদের শেষ পরিণাম বিলকুল পরিষ্কার করে দেওয়া হলো।' তা এভাবে যে, জাহান্নামের মুখ একদম খুলে দেওয়া হলো। এতে হাশরের মাঠের বাম দিকে বিভীষিকাময় এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। অতিরিক্ত গরমে জাহান্নাম যেন বলকা দিয়ে দিয়ে ওঠছিল। মনে হচ্ছিল যেন পাপিষ্ঠদেরকে দেখে রাগ ও ক্রোধে ফেটে পড়ছে। তার গর্জনের আওয়াজ দূর দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল। তার অগ্নিশিখা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এ অগ্নিশিখা এত বিশাল ছিল যে, তা থেকে সৃষ্ট অগ্নিস্ফূলিঙ্গ বড় বড় প্রাসাদের মতো লম্বা ও প্রশস্ত ছিল। এগুলো ওপরে ওঠার দ্বারা মনে হচ্ছিল যেন, আকাশে এক ঝাঁক সোনালি উট নৃত্য করে চলছে। এটা আর জিজ্ঞেস করো না। এসব কিছু দেখে মানুষের অবস্থা কেমন হয়েছিল? তখন তাদের কাছে অনুভূত হচ্ছিল, এর আগে হাশরের মাঠে যেই ভয়াবহতা ছিল তা এর তুলনায় কিছুই ছিল না।'

'হিসাব-নিকাশ কীভাবে শুরু হলো?'

'সর্বপ্রথম হযরত আদম আলাইহিস সালামকে ডাকা হলো, যিনি ছিলেন গোটা মানবজাতির পিতা এবং সর্বপ্রথম নবী।'

তিনি বললেন–

'লাব্বাইক, ওয়া সাদাইক। হে প্রভু! আপনার খেদমতে আমি হাজির। সকল মঙ্গল ও কল্যাণ আপনারই হাতে।'

'তোমার সন্তানদের থেকে জাহান্নামীদেরকে পৃথক করে ফেল।' নির্দেশ দেওয়া হলো।

'কী পরিমাণ পৃথক করবো?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

বলা হলো– 'প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন।'

'তুমি অনুমান করে সারতে পারবে না আবদুল্লাহ! এটা শুনে হাশরের মাঠে কী কান্নাকাটি আর আহাজারি শুরু হয়েছিল।'

'কিন্তু এত বিশাল সংখ্যায় মানুষের জাহান্নামের ফয়সালা কেন হয়েছিল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এটা ফয়সালা নয় বরং এ কথার বহিঃপ্রকাশ যে, হাশরের মাঠে যে সমস্ত লোক উপস্থিত আছে তাদের থেকে হাজারে মাত্র একজন জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত। মূলত মানবজাতি সামগ্রিক বিবেচনায় ঈমান ও আখলাকের পরীক্ষায় বড় আক্ষেপজনক ফেল করেছে। ফলে আল্লাহ তায়ালার ইনসাফের আদালতে এ পরিমাণ লোকই জাহান্নামের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো দুনিয়াতেই বলেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রহমতের শতভাগের একভাগ গোটা দুনিয়াবাসীর মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিলেন আর বাকি নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে আজকের জন্যে রেখে দিয়েছিলেন। তার রহমতের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো। তিনি ব্যর্থ ও অকৃতকার্য লোকদের ফয়সালা শোনানোর পরিবর্তে প্রথমে ওই সকল লোকদেরকে ডাকলেন যাদের কৃতকার্য হওয়া ও মুক্তি লাভের সম্ভাবনা ছিল সবচে' বেশি।'

'অর্থাৎ, সামগ্রিক বিবেচনায় ভালো লোক?'

'হ্যাঁ, প্রত্যেক উম্মতের ওই সকল লোক যাদের মুক্তি লাভ নিছক প্রথাগত একটি হিসাবের দাবি রাখে।

এ কাজটি শুরু হয়েছে উম্মতে মুসলিমা থেকে। এরপর অন্যান্য উম্মতের সিরিয়ালও জলদি এসে পড়বে। কেননা, এ ধরনের ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র এক শতাংশ। বাকি লোকদের ব্যাপারটা তিনি পরে দেখবেন। এর ফায়দা হবে এই যে, হাশরের ভয়াবহতা কারো গুনাহের বদলা যদি হতে পারে তাহলে যেন হয়ে যায়।'

এটা বলে সালেহ এক মুহূর্ত থামলো। এরপর আবারো আক্ষেপের গলায় বললো–

'এভাবে অন্য লোকদের জন্য মুক্তির সম্ভাবনা আমি খুব বেশি দেখছি না।'

'কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এর কারণ হলো, শিরক। শিরকের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা খুব আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী। তুমি তো জান, প্রত্যেক যুগে এ শিরকই ছিল মানবজাতির সবচে' বড় সমস্যা। এ শিরকের কারণেই আজ সবচে' বেশি মানুষ ফেঁসে যাবে। কেননা, শিরকের ক্ষমার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, পরিবেশ পরিস্থিতির বৈরীত্যের দরুন কেউ যদি এ থেকে বাঁচতে না পারে তাহলে ভিন্ন কথা, অন্যথা শিরককারী কোনো ব্যক্তির নূন্যতম সম্ভাবনাও আজ নেই।'

'যদি সে মুসলমান হয় তবু কি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ'। সালেহ উত্তর দিল।

'শিরক ছিল জাহান্নামের আগুনের শিখা। আজ তা অবধারিতভাবে প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিবে যে আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি, ক্ষমতা ও অধিকারের মধ্যে শরীক সাব্যস্ত করতো। গাইরুল্লাহর ইবাদত করতো। তার কাছে প্রার্থনা করতো। তাকে সেজদা করতো। তাকে আল্লাহর শরীক মনে করতো এবং গুণাবলি ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে তাকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করতো।'

'আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আপনিতেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

'একটি ব্যাপার আমার বুঝে আসেনি।' হাঁটতে হাঁটতে আমি সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম।

'কী সেটা?'

'শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল কোটি কোটি, বরং শত শত কোটি। তাহলে লায়লা কীভাবে একেবারে শুরুতেই এসে পড়লো?'

'তুমি কি মনে করছ আল্লাহ তায়ালা আই.ডি. কার্ড দেখে দেখে ফয়সালা করেন যে, কে মুসলমান আর কে মুসলমান না?'

'তোমার একথার মানে আমি বুঝিনি।'

'মানে, অধিকাংশ মুসলমান তার নিজের জন্যে 'মুসলমান' পরিচয়টাকে পছন্দই করেনি। বরং অধিকাংশেরই আসল পরিচয় ছিল তার দল, পূর্বসূরী এবং মতাদর্শ। ফলে আজ যখন উম্মতে মুসলিমার হিসাব-নিকাশ শুরু হলো, সর্বপ্রথম ওই সকল লোকদেরকেই ডাকা হলো যারা খাঁটি দিলে আল্লাহর তাওহীদকে স্বীকার করতো এবং সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার ওপরে উঠে নিছক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিজেকে সম্বন্ধিত করতো, সর্বপ্রকার বিদআত ও বাড়াবাড়ি থেকে নিজের দ্বীনকে হেফাজত করতো। এরা ছিল ওই সকল লোক যারা হকের ব্যাপারে নিজের গোঁড়ামি ও সম্পর্ককে কখনো পাত্তা দেয়নি। যখনই হক সামনে এসেছে উন্মুক্ত হৃদয়ে তা গ্রহণ করেছে। এ সকল লোকদের মাঝে আরশের ছায়াতলে অবস্থানরত সালেহীনরাও শামিল ছিল এবং তারাও শামিল ছিল যাদের নেক আমলের সাথে বদ আমলের মিশ্রণ ছিল এবং এজন্যে তারা হাশরের মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তাদের বদ আমলগুলো মাফ করে দিয়ে নেক আমলগুলোর ভিত্তিতে মুক্তির ঘোষণা দিয়ে দিলেন। এ ধরনের লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। এজন্যেই তোমার মেয়ে লায়লার সিরিয়াল জলদি চলে এসেছে। সে কমপক্ষে এ ব্যাপারটায় একদম পাক্কা ছিল। তার আমলী যে দুর্বলতা ছিল হাশরের ভয়াবহতা সহ্য করার ফলে তা আর শাস্তিযোগ্য বাকি থাকেনি; বরং রব্বে কারীম তার অসীম মেহেরবানিতে তাকে তোমাদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। অথচ তার আমল তোমাদের মতো ছিল না।'

'কিন্তু আমার হিসাব-নিকাশ ও ফয়সালা তো এখনো হয়নি।'

'তুমি এখন যেখানে আছ এর মানে এটাই যে, ফয়সালা হয়ে গেছে। তবে ঘোষণা এখনো হয়নি। নিশ্চিত থাকো।

'এমন কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। সালেহ ব্যাখ্যা করলো–

'আমি পূর্বেই তোমাকে বলেছিলাম, চার ধরনের মানুষের মুক্তির ফয়সালা মৃত্যুর সময়ই হয়ে যায়। তারা হলো– নবী-রাসূল, সিদ্দীক্বীন, শুহাদা ও সালেহীন।'

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ালাম। সালেহ তার কথা চালিয়ে যেতে থাকলো–

এদের মধ্যে নবী-রাসূল ও শুহাদাগণতো ওই সকল লোক যাদের মূল কাজ ছিল, সাধারণ মানুষের মাঝে সত্য দ্বীনের সাক্ষ্য প্রদান করা এবং তাওহীদ ও আখেরাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করা। আজ কেয়ামতের দিন এ উভয় দলের সদস্যরা নিজেদের সাক্ষ্যদান ও দাওয়াতের প্রতিবেদন আল্লাহর সামনে পেশ করবে যা তারা দুনিয়াতে মানুষদেরকে দিয়েছিল। এভাবে মানুষের এমন কোনো ওজর বাকি থাকবে না যে, হক কোনটা তার জানা ছিল না। কেননা, নবী-রাসূল ও শুহাদাগণ হককে খুলে খুলে বর্ণনা করতেন। এ সাক্ষীর ওপর ভিত্তি করেই মানুষের হিসাব-নিকাশ হবে এবং তাদের চিরস্থায়ী ভবিষ্যতের ফয়সালা করে দেওয়া হবে। এ ফয়সালা হতে হতে একসময় সমস্ত মানুষ শেষ হয়ে যাবে। আর সর্বশেষে তোমার মতো সকল শুহাদাদের ডেকে তাদের কামিয়াবির ঘোষণা দেওয়া হবে। এরপর কোথাও নিয়ে গিয়ে মানুষকে জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে রওয়ানা করা হবে।'

'তার মানে মানুষ তৎক্ষণাৎ জান্নাত বা জাহান্নামে যাবে না?'

'না তৎক্ষণাৎ যাবে না; বরং একেক জনের হিসাব হতে থাকবে; সে যদি কামিয়াব হয় তাহলে ইজ্জত ও সম্মানের সাথে ডান দিকে আর যদি কামিয়াব না হয় তাহলে লাঞ্চনা ও গঞ্জনার সাথে বাম দিকে তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। যখন সবার হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যাবে তখন মানুষকে দলে দলে জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'আর সবার আগে?'

'সবার আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের দরজা খোলাবেন। এরপর জান্নাতীরা ভরপুর অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

'এ মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায়?'

'এখন তিনি হাউযে কাওছারের পাশে আছেন। তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে যারই হিসাব-নিকাশ হয়ে যায় এবং সে কামিয়াব হয় তাকেই প্রথমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে কাওছার সুধা

দিয়ে মেহমানদারি করা হয়। এরপর সে না শুধু হাশরের তাবৎ ভয়াবহতা ও পিপাসা ভুলে যায়; বরং ভবিষ্যতে আর কোনো দিন পিপাসার্ত হবে না। আচ্ছা কাওছার সুধার কথা কি তোমার স্মরণ আছে?

'কেন নয়?' আমি জবাব দিলাম।

সালেহের কথা শুনে আমার মনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ সৃষ্টি হল। আমি সালেহকে বললাম–

'কেন আমরা প্রথমেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হব না?' আমার মুখ থেকে বাক্যটি শেষ হতে না হতেই একটি আওয়াজ উঁচু হলো–

'উম্মতে মুহাম্মদিয়ার কামিয়াব লোকদের হিসাব সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মতের হিসাব শুরু হতে যাচ্ছে। ঈসা ইবনে মারইয়াম, মাসীহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর রাসূল এবং বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ নবী বিশ্বপ্রতিপালকের আদালতে হাজির হন।

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে সালেহের দিকে তাকালাম। সে বললো–

এখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম স্বীয় সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সাক্ষী প্রদান করবেন। আল্লাহ তায়ালার প্রশ্নের জবাবে তিনি স্বীয় উম্মতকে প্রদত্ত তালীম-তরবিয়ত, শিক্ষা-দীক্ষার সারসংক্ষেপ তুলে ধরবেন। এটা হবে তার উম্মতের পাপিষ্ঠদের বিরুদ্ধে সাক্ষী আর সঠিক আক্বীদা পোষণকারী ও নেক আমলকারীদের জন্যে এক ধরনের সুপারিশ। এরপর তার উম্মতের যে সকল লোকের আক্বীদা অবিকল এ তালীম-তরবিয়ত অনুযায়ী হবে তাদের ভুলত্রুটিগুলো আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিবেন এবং নামেমাত্র হিসাব-নিকাশের পর তারা কামিয়াব সাব্যস্ত হবে।'

'মুসলমানদের ক্ষেত্রেও কি এমনটি হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ডাকা হয়েছিল। তিনি সাক্ষী দিয়েছিলেন। এ সাক্ষী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অস্বীকারকারী ও তার অবাধ্যদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে গিয়েছিল। হায়! যদি তুমি ওই দৃশ্যটা দেখতে যখন তাদের প্রত্যেকের বাসনা ছিল যে, জমিনটা বিদীর্ণ হয়ে যাক যেন সে তাতে ঢুকে পড়তে পারে। তবে এ সাক্ষী লায়লার মতো মানুষদের জন্যে সুপারিশ হয়ে গিয়েছিল। যদিও তার মুক্তি লাভের মূল কারণ ছিল, সামগ্রিকভাবে তার ঈমান ও আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষ্য অনুযায়ী ছিল।'

'এর মানে, এখনো পর্যন্ত উম্মতে মুসলিমার কেবল ওই সকল লোকেরা মুক্তি পেয়েছে যাদের আক্বীদা ও আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তালীম-তরবিয়ত, শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী ছিল?'

'হ্যাঁ, তাদের ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আর এমনটিই হবে অন্যান্য নবীদের উম্মতদের সাথেও। অর্থাৎ, অন্যান্য উম্মতদের থেকেও যাদের আক্বীদা ও আমল সামগ্রিক বিবেচনায় নবীদের শিক্ষা-দীক্ষার অনুযায়ী ছিল তারাও মুক্তি পেয়ে যাবে। এরপর হাশরের মাঠে কেবল পাপিষ্ঠ ও অবাধ্যরাই ফয়সালার অপেক্ষায় থাকবে।'

'তারপর কী হবে?

'তারপর সাধারণ হিসাব-নিকাশ শুরু হবে।'

'সাধারণ হিসাব-নিকাশ?' জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে আমি বললাম। সালেহ বললো–

সমস্ত উম্মতের হিসাব-নিকাশের প্রথম ধাপ সেটা যেটাতে সালেহীনদের কামিয়াবির ঘোষণা হচ্ছে আর লায়লার মতো লোকদের নামমাত্র একটা হিসাবের পর মুক্তি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরপর শুরু হবে সাধারণ হিসাব নিকাশ। তখন আমলের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফয়সালা প্রদান করা হবে। এর পরে সমস্ত পাপিষ্ঠরাই বিশাল এক চাপের মুখে পড়ে যাবে। তবে মুমিনদের অনেকেই নিজের অনেক গুনাহ সত্ত্বেও নিছক আল্লাহ তায়ালার রহমত ও অনুগ্রহে মুক্তি পেয়ে যাবে এবং তাদের মিযানের ডান পাল্লা ভারি হয়ে যাবে। হাশরের মাঠে তাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হওয়াটাই তাদের ক্ষমা লাভের উসিলা বনে যাবে। এটাকেই আমি বলছি সাধারণ হিসাব।

তবে কিছু লোক এমন হবে যাদেরকে সর্বশেষে সময়ের জন্যে রেখে দেওয়া হবে। এদেরকে হিসাব-নিকাশের জন্যে ডাকা হবে না। এরা হবে ওই সকল মুমিন যাদের গুনাহের বোঝা হবে অনেক। এদের অপেক্ষার এ পালা হাজার হাজার বরং লাখ লাখ বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে। এ সময়ে এদেরকে নিদারুণ কষ্ট, মুসিবত ও পেরেশানি সহ্য করতে হবে। এরপর কোথাও গিয়ে তাদের মুক্তির কোনো সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।'

'ওই সম্ভাবনাটা কী হবে?'

'ওই সম্ভাবনাটা আল্লাহ তায়ালার ওই রহমতের বহিঃপ্রকাশ যে, ইনসাফ অনুযায়ী তিনি মানুষকে পরিপূর্ণ শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে হাশরের শাস্তিকে তাদের গুনাহের কাফফারা বানিয়ে দেবেন। এরপর তাদের নবীদের, বিশেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ আবেদনকে তাদের মুক্তির কারণ বানিয়ে দেবেন যে, 'এদের হিসাব-নিকাশও নিয়ে নেওয়া হোক।'

'কিন্তু হাশরের এত কঠিন কষ্ট সয়ে অবশেষে মুক্তি লাভ করা তো কোনো ভালো পদ্ধতি হলো না।' আমি আফসোস করে বললাম, সালেহ উত্তরে বললো–

'ভালো সিস্টেম বলে দেওয়ার জন্যেই তো নবী-রাসূলগণ এসেছিলেন। তারা তো বলেছিলেনই ঈমান আনো, নেক আমল করো এবং কোনো গুনাহ হয়ে গেলে ক্ষমা চেয়ে নাও, তাহলে আখেরাতে কামিয়াব হবে। এটাই ছিল মুক্তির সবচে' সহজ উপায়। কিন্তু নবীদের কথায় কেউ কানই দেয়নি। ফলে আজ এর শাস্তি ভোগ করছে।'
আমি তার কথার সমর্থনে বললাম–

'তুমি ঠিক বলছো। এতো অনেক লাঞ্চনা ও গঞ্জনার পর মুক্তির ফয়সালা হয়েছে। আমি তো লায়লার পেরেশানির কিছুই দেখতে পারিনি। কারণ, সে শুরুতেই মুক্তি পেয়ে গেছে। ওই সকল লোকদের কী হবে যারা শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকবে এবং তাদের ওপর দিয়ে হাশরের ভয়াবহতা ও কষ্ট-মুসিবত বয়ে যাবে।'

'আরে ভাই তুমি লায়লাকে যে অবস্থায় দেখেছিলে তা তো অনেক ভালো ছিল। কিন্তু এখন হাশরের মাঠের অবস্থা বড় ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। এর কারণ হলো, জাহান্নামের মুখ সম্পূর্ণ খুলে দেওয়া হয়েছে, যার পর শুধু হাশরের গরম নয়; বরং জাহান্নামের ভীতিকর দৃশ্য এবং তাতে পতিত হওয়ার আশঙ্কাও মানুষকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে। আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ পাপিষ্ঠদের মাঝে অতিরিক্ত ভীতির সঞ্চার করেছে। মানুষ নিজেদের সামনে ধ্বংস ও লাঞ্চনার দরজা উন্মুক্ত দেখছে। এ সবকিছু এতটাই ভীতিপ্রদ যা মানুষের ধৈর্যের বাইরে। সবচে' বড় কথা হলো, কারো জানা নেই যে, তার সাথে কী আচরণ হবে? এজন্য তুমি এ মুহূর্তে হাশরবাসীদের ভয় এবং শারিরীক ও মানসিক কষ্ট ও যাতনার কোনো অনুমান করতে পারবে না।'

আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, এটাই কি সেই তরীকা যার দ্বারা মানুষ মুক্তির আশায় বুক বাঁধতো? হায়! মানুষ যদি দুনিয়াতেই বুঝে যেত, মুক্তি লাভ ঈমান ও আমলের ওপর সীমাবদ্ধ থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজীবন এরই দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ তার দাওয়াতকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলেছিল এবং নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো জীবনযাপন করেছিল। তাদের ধারণা ছিল, তারা কিছু না করলেও রাসূলের সুপারিশে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু আজ এটা একদম স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মুক্তি মিলবে ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে। প্রত্যেক ওই বড় গুনাহ যার তওবা করেনি তার শাস্তি আজ এখানে ভোগ করতে হবে। হায়! একথা যদি মানুষের আজ বুঝে আসার পরিবর্তে দুনিয়াতেই বুঝে আসত তাহলে তারা সারা জীবন তওবা করে করে কাটিয়ে দিত।

আমি আমার চিন্তার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম। এ অবস্থাতেই সালেহ আমার দিকে তাকিয়ে বললো–

'আমার খেয়াল, হাউযে কাওছারের পাশে যাওয়ার পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের সাক্ষীদানের দৃশ্যটা দেখে নেওয়া উচিত। এরপর আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে যাব।

. . . . . .

আমরা আরো একবার হাশরের মাঠে এসেছিলাম। কিন্তু এবার আমরা আরশের ডান দিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আরশের তাজাল্লিতে জমিন এবং আসমান আলোকিত ছিল।

কামিয়াব লোকদের জন্যে এ তাজাল্লি ছিল খুশি ও আনন্দের বিষয় আর পাপিষ্ঠদের জন্যে ছিল কষ্ট ও যাতনার কারণ। আরশের চারপাশে ফেরেশতারা হাত বেঁধে দলে দলে দাঁড়িয়ে ছিল। সর্বপ্রথম ছিল আরশ বহনকারীরা। আর তাদের পর ধাপে ধাপে অন্য ফেরেশতারা। এ ফেরেশতাদের মুখে ছিল আল্লাহ তায়ালার স্তুতি প্রশংসা, বড়ত্ব-মহত্ব। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর আদালতে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিলেন। আর সমস্ত ঈসায়ীদেরকে হাশরের মাঠে উপস্থিত ফেরেশতারা ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে আরশের নিকট নিয়ে এসেছিল। ঘোষণা হলো– ঈসা ইবনে মারইয়াম কাছে আসো।'

ফেরেশতারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্যে রাস্তা খালি করে দিল। তিনি হাঁটতে হাঁটতে আরশের একদম নিকটে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাত বুকের ওপর বাঁধা ছিল আর মাথা ছিল অবনত।

ঘোষণা হলো–

'ঈসা তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে আমার বাণী পৌছে দিয়েছিলে? তুমি কী উত্তর পেয়েছিলে?

'মালিক আমার কিছু জানা নেই। অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আপনার আছে।'

তার এ কথা ছিল এ বাস্তবতার বর্ণনা যে, ঈসা আলাইহিস সালামের জানা ছিল না তার উম্মত তার পরে কী কী করেছিল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর এ জবাবে হাশরের মাঠে এক ধরনের নীরবতা ছেয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর আকাশে একটি বিস্ফোরণ হলো। সবার দৃষ্টি আকাশের দিকে ওঠে গেল। আকাশে ফিল্মের মতো দৃশ্য চলতে লাগলো। এ ছবিতে ঈসায়ীরা হযরত ঈসা এবং হযরত মারইয়ামের মূর্তির সামনে মাথা ঠেকাচ্ছিল। বাজারসমূহে ক্রুশ নিয়ে মানুষ বিভিন্ন সভা-সমাবেশের আয়োজন করছিল। গির্জাগুলোতে মাসীহ এবং মারইয়ামের পূজা হচ্ছিল। মাসীহকে সমস্যার সমাধানকারী মনে করে তার কাছে

সাহায্য কামনা করা হচ্ছিল। তার প্রশংসায় সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছিল। পাদ্রীরা বক্তৃতার মাধ্যমে তাকে আল্লাহর ছেলে প্রমাণিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

এ সমস্ত দৃশ্য দেখে আমি চিন্তা করছিলাম, মানবইতিহাসে সবচে' বড় শিরকের জন্ম দিয়েছে এ ঈসায়ীরা। অথচ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় পয়গাম্বর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-কে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েই পাঠিয়েছিলেন। তার যমানায় ইহুদিরা মুসা আলাইহিস সালামের শরীয়তে বিভিন্ন ধরনের ফেকহী জটিলতা সৃষ্টি করে তার ওপর আমল করা অসম্ভব বানিয়ে দিয়েছিল। তারা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার ঈমানী ও প্রেমময় সম্পর্ককে একটি নিষ্প্রাণ সম্পর্কে আইনী সম্পর্কে পাল্টে দিয়েছিল। ফলে তারা কয়েকটি ভাসমান ও সাধারণ আমলের ওপর তো খুব জোর দিত; কিন্তু ঈমান ও আমলের সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত আখলাকি বিধিবিধানগুলোর ব্যাপারে চরম ঔদাসীন্যের পরিচয় দিত। এমন অবনতির মুহূর্তেই তাদের কাছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়। তিনি বড় কঠিনভাবে বনী ইসরাঈলের বাহ্যিক পূজা ও নৈতিক অবক্ষয়ের সমালোচনা করেন। স্বীয় যমানার মাযহাবী লোকদের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন–

'হে রিয়াকারী ফকীহ ও প্রতারণাকারী পণ্ডিতেরা তোমাদের ওপর আফসোস! তোমরা নিরীহ বিধবাদের ঘর দখল করে বসে থাক, আর মানুষকে দেখানোর জন্যে লম্বা লম্বা নামায পড়ো। তোমাদের শাস্তি হবে অনেক কঠিন.....। হে বাটপার ফকীহের দল তোমাদের জন্যে আফসোস! তোমরা পুদিনা, গুয়ামোরী এবং জিরার ওপর 'উশর (শস্যের যাকাত) দিয়ে থাক; কিন্তু শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান ইনসাফ, অনুগ্রহ এবং ঈমানকে ছেড়ে দিয়েছ। দরকার তো ছিল, এটাও করা, ওটাও না ছাড়া। হে অন্ধ পথপ্রদর্শনকারী! তোমরা একদিকে ক্ষুদ্র মশার স্বার্থরক্ষায় সবকিছু করতে রাজি; কিন্তু অপরদিকে উটের মতো বিশালাকার প্রাণীকেও গলাধঃকরণ করে ফেল নিঃসঙ্কোচে। হে রিয়াকারী ফকীহ ও বাহ্যিকপূজারীরা! আফসোস তোমাদের ওপর! তোমরা পাত্রের উপরভাগ তো পরিষ্কার কর; কিন্তু তার অভ্যন্তর অযাচিত ময়লা আবর্জনা ও বদদ্বীনিতে ঠেসে থাকে। হে অন্ধ পণ্ডিতেরা! প্রথমে পাত্রের অভ্যন্তর পরিষ্কার করে ফেল, বাইরের অংশ আপনিতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। হে রিয়াকারী ফকীহ ও বাহ্যিকপূজারীরা তোমাদের ওপর আফসোস! তোমাদের দৃষ্টান্ত হলো কারুকার্যমণ্ডিত কবরের মতো, যার বাহ্যিক সৌন্দর্য পথচারীর দৃষ্টি কেড়ে নেয়; কিন্তু তার ভেতরে পড়ে আছে মৃত ব্যক্তির পচে গলে যাওয়া হাড্ডি ও বিভিন্ন নাপাক বস্তু। তদ্রূপ তোমাদেরকেও মানুষ মনে করে, পাক্কা ঈমানদার অথচ তোমাদের অভ্যন্তর দ্বীনহীনতা ও মুনাফেকীতে ভরপুর।'

ঈসা আলাইহিস সালামের এ সমালোচনার কারণে ইহুদিরা তার ঘোর শত্রু হয়ে গেল। তাদের শত্রুতা এত চরমে পৌঁছেছিল যে, তারা তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হলো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা ঈসা আলাইহিস সালামকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচিয়ে নিজের কাছে তুলে নিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ঈসা আলাইহিস সালামের পর সেন্টপোল নামক এক কট্টরপন্থি ইহুদিবিদ্বেষীর আগমন ঘটলো। সে ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসরণে আলখেল্লা গায়ে জড়িয়ে তার তাবৎ তালীম-তরবিয়তকে বিকৃত করে দিয়েছে। একদিকে সে ঘোষণা করেছে, শরীয়তের অনুসরণ কেবল ইহুদিদের জন্যে জরুরি। অন্যদের জন্য নয়। অপরদিকে সে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার মাকে প্রভুত্বের মর্যাদায় সমাসীন করেছে। ফলে আস্তে আস্তে ঈসায়ী ধর্মে দুনিয়ার সবচে' বেশি শিরক চর্চা হতে লাগলো। এভাবেই ঈসায়ী ধর্ম হয়ে গেল পৃথিবীর সবচে' বড় শিরকী ধর্ম। ঈসায়ীরা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর ছেলে মনে করতো। সমস্যা সমাধানকারী মনে করে সকল বালা-মুসিবতে তার নাম নিত। কিন্তু তা মিথ্যা ছিল, যার অসারতা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে।

আমি এসব চিন্তা করছিলাম, হঠাৎ হাশরের মাঠে ঈসায়ীদের কান্নার আওয়াজ উঁচু হতে লাগলো। ঈসায়ীরা তাদের কৃতকর্ম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। এর ভয়াবহ পরিণতি জাহান্নামের আকৃতিতে মুখ হা করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ অনেক ঈসায়ী চিৎকার করতে লাগলো–

'আল্লাহ! আমরা ঈসার তালীম অনুযায়ী আমল করেছিলাম। তুমিই তো ঈসাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলে। তিনিই আমাদেরকে বলেছেন, তিনি তোমার ছেলে, যাকে তুমি আমাদের নাজাতের জন্যে পাঠিয়েছ।'

'প্রচণ্ড এক ধমক শূন্যে ভেসে এলো। সমস্ত মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। পরিবেশে সুনসান নীরবতা খেলা করতে লাগলো। ঈসা আলাইহিস সালাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো–

'ঈসা! তুমি কি এ সকল লোককে বলেছিলে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে মাবুদ বানিয়ে নাও।'

যদিও এটি একটি সরল প্রশ্ন ছিল। কিন্তু প্রশ্নটি শুনেই ঈসা আলাইহিস সালাম প্রচণ্ড রকম শিহরিত হলেন। তার পদযুগল তার অস্তিত্বের ভার আর বইতে পারছিল না। এ অবস্থা দেখে আল্লাহ তায়ালা বললেন–

'ঈসা তুমি আমার প্রিয় পয়গাম্বর। আমার পয়গাম্বর আমার সামনে ভয় পেতে পারে না। তুমি প্রশান্তচিত্তে আমার কথার জবাব দাও।'

এ বাক্যটির সাথে সাথেই দু'জন ফেরেশতা ঈসা আলাইহিস সালামের নিকট এলো এবং তাকে ধরে একটি আসনের ওপর বসিয়ে দিল।
দৃশ্যটি বড় শিক্ষণীয় ছিল। ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর খুব প্রিয় একজন পয়গাম্বর ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তাঁকেই সবচে' বড় পরিসরে আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার কাছে দুআ ও মুনাজাত করা হতো, তার হামদ ও তারীফ করা হতো, তার ইবাদত ও পূজা করা হতো। কিন্তু আজ আল্লাহর এক প্রশ্নে তার যে অবস্থা হয়েছিল তা তাকে খোদা জ্ঞানকারীদের চোখ থেকে রক্তাশ্রু বের করার জন্যে যথেষ্ট ছিল। আজ সবাই জেনে নিয়েছে, আল্লাহর মোকাবেলায় কারো কোনো মূল্য নেই।

আমি দিলে দিলে চিন্তা করলাম, এক এক করে আল্লাহর এমন আরো অনেক নেক বান্দা আসবে যাদেরকে দুনিয়াতে মানুষ এমন সব নাম ও সিফাতে ডাকতো যেগুলো কেবল আল্লাহকেই শোভা পায়। কিন্তু তাদের সবাই অস্বীকার করবে যে, আমরা মানুষকে এ ধরনের কোনো কথা বলিনি। প্রত্যেকের অবস্থা হবে এই যে, ঈসা আলাইহিস সালামের মতো কেউই আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর শক্তি পাবে না। হায়! তাদের নামে ধোঁকা খাওয়া লোকগুলো যদি আল্লাহর এ মহত্ব দুনিয়াতেই জেনে নিত।
এতক্ষণে ঈসা আলাইহিস সালামের মাঝে আল্লাহ তায়ালার ভয়ের প্রভাব খানিকটা হালকা হয়েছে। তিনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন–

'মনিব তুমি পবিত্র। আমার জন্যে কীভাবে সম্ভব ছিল যে, আমি এমন কথা বলবো যা বলার অধিকার আমার নেই। আমি যদি এমন কথা বলতাম তাহলে তুমি অবশ্যই তা জানতে। আমি তো তাদেরকে সে কথাই বলেছি যার নির্দেশ তুমি আমাকে দিয়েছ। অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমারও রব তোমাদেরও রব। আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম ততদিন যতদিন আমি তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলাম। এরপর তুমি যখন আমাকে তুলে নিয়েছ তখন থেকে তুমি ছিলে তাদের রক্ষক। আর তুমি তো প্রত্যেক জিনিসের সাক্ষী। তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তাহলে তারা তোমার বান্দা, আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তুমি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।'
এটা শুনে আল্লাহ তায়ালা বললেন–
'আজ সত্যবাদিতা কেবল সত্যবাদী লোকদেরকেই ফায়দা পৌঁছাবে।'
এরপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বিদায় করে দেওয়া হলো। আর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো–
'ঈসার উম্মতের মধ্যে যারই ঈমান ও আমল ঈসার পয়গামের অনুকূল হয় তাকেই আমার সামনে হাজির করো।'

হাউযে কাওছার

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাক্ষ্যদানের দৃশ্য দেখার পর আমরা দু'জন হাউযে কাওছারের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তায় আমি সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম- "হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে সুপারিশ করেছিলেন অর্থাৎ, তুমি যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও তবে তুমি পরাক্রমশীল এবং প্রজ্ঞাময় এর কোনো ফায়দা প্রকাশ পায়নি? সে বললো, "তুমি কি জবাবে আল্লাহ তায়ালার কথা শোনোনি যে, সত্যবাদীদেরকে আজ তাদের সত্যবাদীতাই উপকার পৌছাবে।"
"হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু এর দ্বারা তো বাহ্যিকভাবে মনে হচ্ছে তার সুপারিশ কবুল হয়নি।"

"না ব্যাপারটা আসলে তা না।" আল্লাহ তায়ালা তাঁর কানুনকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর কানুন হলো, নবী-রাসূলদের আনীত শিক্ষাকে সত্য স্বীকার করা এবং নিজের আমল দ্বারা তার সত্যায়ন করা কামিয়াবি ও মুক্তির প্রধান এবং মৌলিক শর্ত। আল্লাহর তায়ালার কথার উদ্দেশ্য ছিল, যে ব্যক্তিই এ মৌলিক শর্তটি পূরণ করবে তাকে এখন তিনি ক্ষমা করে দিবেন। অর্থাৎ, যে সমস্ত ভুলত্রুটি তাদের থেকে সংঘটিত হত, কিন্তু তারা এর থেকে তওবা করেনি, সেগুলো আলাহ তায়ালা স্বীয় রহমত দ্বারা মাফ করে দিবেন।

প্রত্যেক নবী স্বীয় উম্মতের জন্য এভাবেই সুপারিশ করেছেন এবং করবেন। কিন্তু এর ফলাফল এ মুহূর্তে এটুকুই প্রকাশ পাচ্ছে। এ মুহূর্তে কেবল ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে সাধারণ মনে করে তওবা করেনি তারা সেগুলোর কারণে অপদস্ততার শিকার হতে হবে। যেমন হয়েছিল তোমার মেয়ে লায়লা। আর যে সকল লোক সব সময় ঈমান, নেক আমল এবং তওবার ভেতর দিয়ে কাটিয়েছে তারা তো প্রথম থেকেই শান্তি ও স্বস্তিতে রয়েছে। আর যারা পুরোপুরি না-ফরমানি এবং বড় বড় গুনাহের পথে চলছে তারা এখন ভয়ঙ্কর শাস্তির সম্মুখীন হবে।

এ আলোচনা করতে করতে আমরা এমন এক জায়গায় এসে গেলাম যেখানে ফেরেশতারা মানুষদেরকে সামনে যেতে বারণ করেছে। সালেহ আমার হাত ধরে তাদের নিকটে চলে গেল। তাকে দেখেই ফেরেশতারা রাস্তা খালি করে দিল। একটু সামনে এগুতেই ঝিলের মতো কী যেন একটা আমাদের নজরে পড়লো। এটা দেখেই সালেহ বললো-
"এটাই হাউযে কাওছার।"
আমি বললাম–

"কিন্তু এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নেই।"

"তিনি সামনের দিকে আছেন। আমরা ভিন্ন দিক দিয়ে প্রবেশ করেছি। আমি তোমাকে এর সবকিছু ভালোভাবে দেখাতে চেয়েছিলাম এজন্যই এদিক দিয়ে নিয়ে এসেছি।"

সালেহের কথায় আমি চিন্তা করলাম তখন মনে হলো– এটা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত কোনো হাউয নয়। আমি খানিকটা আশ্চর্যের সুরে সালেহকে বললাম–"দোস্ত, এ তো দেখছি ঝিল; বরং সমুদ্রের মতো বড়, যার অন্য প্রান্ত আমার নজরেই আসছে না।"

"হ্যাঁ, এটা এমনই। তুমি কি দেখছ না কত কত লোক এর পাড়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করছে। ছোটখাটো কোনো হাউয যদি হত, তাহলে তো মুহূর্তেই শেষ হয়ে যেত।" সে ঠিক বলেছিল। এখানে প্রত্যেক স্থানে অনেক লোক উপস্থিত ছিল।

পেছনের দুনিয়াতেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী থেকে আমার এমনি ধারণা ছিল যে, এটা সাধারণ কোনো হাউয হবে না; বরং হবে সমুদ্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ দ্বারা তো বরং আমার মনে হত, এটা তো সেই জায়গা পেছনের দুনিয়ায় যেখানে আরব ও আফ্রিকার মাঝে বিভাজন সৃষ্টিকারী (Red Sea) লোহিত সাগর প্রবাহিত হতো।

সালেহের কাছে আমার এ ধারণার কথা উল্লেখ করলে সে বললো– "এ ধারণা অনেকটাই সঠিক। জমিন প্রসারিত হয়ে যদিও অনেক বড় হয়ে গেছে; কিন্তু এটা কম-বেশি সেই জায়গাই।"

"তার মানে, হাশরের মাঠ আরবের মাটিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে?" "হ্যাঁ, তোমার ধারণা সঠিক।"

আমি চুপচাপ চিন্তা করতে লাগলাম, কেমন সময় ছিল তখন, যখন দুনিয়া আবাদ ছিল। মানুষ তখন দুনিয়ার চাকচিক্য ও আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকতো। হায়! তাদের যদি ধারণা থাকতো যে, আসল দুনিয়া তো মৃত্যুর পর শুরু হবে। আল্লাহ তায়ালা তার নবীদের পাঠিয়ে পেছনের দুনিয়ার মানুষকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছেন। কিন্তু মানুষ তাদের কথা মানেনি, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এ নবীদের থেকে কাউকে কাউকে রেসালত দান করেছিলেন। এ রাসূলগণ না শুধু মানুষদেরকে সত্য পথের দিকে আহবান করেছেন; বরং এ থেকেও আরেক কদম অগ্রে বেড়ে মানুষদেরকে এ সতর্ক করেছেন যে, তাদের কথা না মানলে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের পূর্বেই এ জাতির ওপর শাস্তি পাঠাবেন। যারা তাদেরকে মানবে তারাই কেবল এ শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কওমে নূহ, কওমে আ'দ, কওমে ছামুদ, কওমে লুত, কওমে শুআইব, ফেরাউনের বংশধর এবং খোদ কুরাইশের সঙ্গে এমনটিই হয়েছে।

এ সমস্ত কওমের রাসূলগণ তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু তারা যখন মানেনি কেয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতেই তাদেরকে আযাব দেওয়া হয়েছে। কওমে নূহ এবং ফেরাউনের বংশধরদের পানিতে ডুবিয়ে, কওমে আ'দকে ভয়ানক তুফানের মাধ্যমে, কওমে ছামুদ এবং কওমে শুআইবকে বজ্রের মাধ্যমে, কওমে লূতকে পাথর বর্ষণকারী বাতাসের মাধ্যমে এবং মক্কার কাফেরদেরকে মুমিনদের তরবারির আঘাতে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মক্কার কাফেরদের মধ্যকার ব্যাপারটা তো ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে এবং কোরআনেও এর ইতিহাস সংরক্ষিত আছে। কারো জানা ছিল না, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সাহাবায়ে কেরামকে কীভাবে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ বানিয়ে দেওয়া হলো। এভাবেই পরকালীন শাস্তি ও পুরস্কারের একটি নমুনা দুনিয়াতে দেখিয়ে দেওয়া হলো যে, কেউ চাইলেই এটাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখে না। এরপরও মানুষ এ দিনের প্রস্তুতি নেয়নি।

সবচে' বড় কথা, আজ যেখানে হাশর অনুষ্ঠিত হচ্ছে এখানে একটি জাতির সাথে চার হাজার বছর পর্যন্ত শাস্তি ও প্রতিদানের ব্যাপার-স্যাপার ঘটেছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তানদের দুটি শাখা তথা বনী ইসমাঈল ও বনী ইসরাঈলের সাথে আল্লাহ তায়ালার নিয়ম এটা ছিল, যদি তারা আনুগত্য করতো তাহলে আল্লাহর রহমত তাদেরকে দুনিয়াতেই ঘিরে নিত, আর যদি অবাধ্যতা করতো তাহলে দুনিয়াতেই শাস্তি পেয়ে যেত। বনী ইসরাইলরা তাদের ইতিহাসে নিজেদের অপরাধের কারণে শাস্তি স্বরূপ দু'বার বড় ধরনের ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছিল। একবার ইরাকের বাদশাহ বুখতে নসরের হাতে আরেকবার রোমান জেনারেল টাইটসের হাতে। এমনিভাবে উম্মতে মুসলিমাকেও নিজেদের অপরাধের কারণে দু'বার মারাত্মক ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। একবার তাতারদের হাতে অন্যবার ইউরোপীয়ানদের হাতে।

এ শাস্তির পর যখনই তারা তওবা করতো এবং অপরাধকর্ম থেকে ফিরে আসতো তখনই তাদের জন্যে রাজত্ব এবং বিভিন্ন অনুগ্রহের দরজা খুলে যেত। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, তাতারদের হাতে মুসলমানরা একদম নাস্তানাবুদ হয়ে যাওয়ার পর যখন তাদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিল তখন এ বিধ্বস্ত মুসলমানরাই পৃথিবীর সুপার পাওয়ারে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু আফসোস! মানুষ শাস্তি ও উত্তম প্রতিদানের এ জ্বলন্ত প্রমাণগুলো দেখেও কেয়ামতের শাস্তি ও পুরস্কারকে গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখেনি। মনের অজান্তেই আমার মুখ থেকে একটি শীতল আহ বেরিয়ে এলো। আমি বললাম–

'হে আমার প্রভু! বুঝানোর মধ্যে তো তুমি কোনো কমতি করনি। কিন্তু মানুষ ছিল বড় অবাধ্য মাখলুক। এজন্যই আজ এ কঠিন দিন দেখতে হচ্ছে।'

সালেহ আমার কথা শুনে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, এরপর বললো–

'না, সকল মানুষ এমন ছিল না। দেখো! তোমার আশপাশে হাউযে কাওছারের পাড়ে কত কত লোক।'

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ালাম। কিন্তু মুখে কিছুই বললাম না। কারণ পরিষ্কার। সালেহ এখানে উপস্থিত লোকদেরকে দেখছিল আর আমি হাশরের মাঠে অবস্থানরত লোকদের কথা কল্পনা করছিলাম, যাদের মাঝে আমার ছেলে জমশেদও শামিল ছিল। তাকে খোঁজার জন্যে আমি হাশরের মাঠে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামের সাক্ষাতদানের দৃশ্য দেখে আমার হিম্মত ভেঙে পড়েছিল। এজন্য বর্তমানে আমি তার ব্যাপারটা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমরা সামনের দিকে যাচ্ছিলাম। এক জায়গায় গিয়ে সালেহ আমাকে বললো–

'চলো আমরা এখন কাওছারের ভি আই পি লাউঞ্জে যাব।''

আমি তার কথার কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিনি। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, সালেহ কী বলছে। এরপরও সে নিজেই তার কথার ব্যাখ্যা করে দিল–

'আখেরাতের কামিয়াবি অর্জনকারীদের দুটি স্তর। একটি স্তর তাদের যারা দ্বীনকে শতভাগ মেনে চলেছে। বান্দা এবং স্রষ্টার হকসমূহ আদায় করেছে। আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেকটি হুকুমের অনুসরণ করেছে। এ সকল লোকই জান্নাতের সফলতা অর্জনকারী। এদের মধ্যে কিছু লোক এমন ছিল যারা আরেকটু অগ্রসর হয়ে দ্বীনকে ত্যাগের সাথে গ্রহণ করেছে। কঠিন কঠিন পরিস্থিতি এবং অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মুহূর্তেও অসাধারণ ধৈর্য ও স্থিরতার পরিচয় দিয়েছে। নেক ও ভালো কাজে সর্বদা অগ্রে থেকেছে। সর্বাবস্থায় সত্যকেই আকড়ে রেখেছে এবং এর জন্য তাবৎ ঝড়-ঝাপটা হাসি মুখে বরদাশত করেছে। আল্লাহর দ্বীনের নুসরত (সাহায্য) নফল ইবাদত, আল্লাহর বান্দাদের ওপর খরচ এবং তাদের খেদমতকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে। এরাই ওই সকল লোক যাদেরকে আজ আখেরাতের দিনে ভি আই পি এ শামিল করা হবে। এদের নেয়ামতরাজি, এদের মান-মর্যাদা এবং আল্লাহর নৈকট্যশীলতা সবকিছু সাধারণ জান্নাতীদের থেকে অনেক বেশি হবে। এটা ঠিক তেমন যেমন দুনিয়াতে প্রত্যেক সমাজে একটা শ্রেণি থাকতো অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের। আজ কেয়ামতের দিনেও তাই হচ্ছে। কামিয়াব সাধারণ মানুষগুলোকে হাশরের মাঠের ভয়াবহতা থেকে বাঁচিয়ে হাউযে কাওছারের মনোরম এলাকায় অবস্থান করানো হয়েছে। জান্নাতেও তারা উত্তম জায়গা লাভ করবে। বলাই বাহুল্য, এটা মস্ত বড় কামিয়াবি ও সফলতা।

কিন্তু এদের থেকেও উঁচু একটি স্তর আল্লাহর নৈকট্যশীলদের জন্যে রয়েছে। এটা জান্নাতীদের সর্বোচ্চ স্তর। এর বাস্তবতা তো জান্নাতে প্রবেশের পরই প্রতীয়মান হবে। কিন্তু কাওছারের পাশেও এ ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, উঁচু স্তরের জান্নাতীদের অবস্থানগুলো ভিন্ন হবে। আমরা সেখানেই যাচ্ছি।'

সে মুহূর্তের জন্যে থামলো এবং আমার চোখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বললো–

'কেননা আমাদের আবদুল্লাহ সাধারণ জান্নাতী নয়। বরং একজন সর্দার এবং সর্বপ্রকার উঁচু মর্যাদার অধিকারী।'

তার কথা শুনে আমি আমার মাথা নিচু করে ফেললাম।

আমরা এমন এক জায়গায় প্রবেশ করলাম যার সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বরফের মতো শুভ্র, নির্মল ঝিলের পানি জমিনের বিছানার ওপর চন্দ্রালোকের মতো বিছানো ছিল। ঝিলের উপরিভাগ ছিল সমতল, মসৃণ এবং প্রশান্ত। তা দেখার দ্বারাই চোখগুলো আশ্চর্য ধরনের প্রশান্তি লাভ করতো। ঝিলের পাড়গুলো এমন চকমকে মোতি দ্বারা নির্মিত ছিল, যা ছিল ভেতরের দিক থেকে খালি। পাড় ঘেঁষে বিছানো ছিল অত্যন্ত মজবুত ও মোলায়েম গালিচা, যার ওপর চলার দ্বারা পায়ের তলা অবর্ণনীয় পুলক অনুভব করতো। এর ওপর বড্ড আরামদায়ক ও রাজকীয় আসন পাতা ছিল। আয়নার চেয়েও অধিক স্বচ্ছ টেবিলের ওপর স্বর্ণ-রৌপ্যের গ্লাস তারকারাজির মতো ঝকমক করছিল। ঝিল থেকে এমন খোশবু বিচ্ছুরিত হচ্ছিল যা দ্বারা মস্তিষ্ক সুবাসিত হয়ে যেত।

আমি একটি আসন বাগিয়ে নিতে নিতে সালেহকে বললাম- 'এত চমৎকার খোশবু কোত্থেকে আসছে?'

'হাউযের তলদেশে যে মাটি আছে তা দুনিয়ার সকল খোশবু থেকে অধিক সুবাসযুক্ত। তারই প্রভাব এটা।'

সালেহ ঝিল থেকে একটি গ্লাস ভরলো এবং আমার সামনে রেখে বললো 'মজা নাও।'

আমি এক ঢোক পান করলাম। দুনিয়াতে আমি কেবল এর উপমা শুনেছিলাম। দুধ, মধু ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ওই সব থেকে বহুগুণ বেশি সুপেয়। যদিও আমি পূর্বেও কাওছার সুধা পান করেছিলাম, কিন্তু এমন পরিবেশে পান করার মজাটাই ছিল ভিন্ন। বাইরে হাশরের মাঠে ছিল কাঠফাটা তীব্র রৌদ্র আর এখানে ছিল গোধূলি বেলার নয়নাভিরাম দৃশ্য। হালকা শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। শুভ্র আকাশে লালিমা ছড়িয়ে পড়েছিল। এ লালিমা কোথাও ছিল ঘন লাল, কোথাও লালচে আর কোথাও নীল। আকাশের এ রং ঝিলের স্বচ্ছ পানিতে এমনভাবে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল যে, যেন কোনো সুদর্শনা কিশোরী তার মাথায় রঙ-বেরঙের ওড়না ছড়িয়ে রেখেছিল। নিঃসন্দেহে তা ছিল বিষম চিত্তাকর্ষক এক অনিন্দ্য দৃশ্য।

আমি আমার চারপাশে চোখ বুলালাম। আমার কাছে মনে হচ্ছিল এ যেন আধুনিক সমৃদ্ধ কোনো বিনোদন কেন্দ্র। মানুষ একা একা এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের সাথে এ ঝিলের পাড়ে দাঁড়িয়ে এবং বসে নানা খোশগল্পে মত্ত ছিল। সবাইকে বেশ প্রফুল্ল ও প্রসন্ন মনে হচ্ছিল। তাদের চেহারায় ছড়িয়ে থাকা স্বস্তি ও প্রশান্তি দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, তারা পরিপূর্ণ কামিয়াব হয়ে গেছে। এ মৃত্যু, দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-বিসুখ এবং চিন্তা-পেরেশানির সমুদয় আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী ও প্রকৃত আনন্দের অকূল সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আছে।

চিরস্থায়ী কামিয়াবি, নির্মল আনন্দ, সার্বক্ষণিক স্বাদ, অনন্ত জীবন এবং অনিঃশেষ আরাম-আয়েশ আজ তাদের পদচুম্বন করছিল। কত স্বল্প মেহনতের বিনিময়ে কত মহান পুরস্কার তারা অর্জন করেছিল। এ কামিয়াবির উল্লাসে ফেটে পড়া তাদের হাসির আওয়াজ বহু দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল। তাদের চেহারার মুচকি হাসি পরিবেশকে আরো নান্দনিক করে তুলছিল। তাদেরকে দেখে আমার স্ত্রী-সন্তানদের কথা মনে পড়ে গেল।

আমার কল্পনাটা সালেহ আমার চেহারা দেখেই পড়ে ফেললো–

'এসো তোমাকে তোমার পরিবারের লোকদের সাথে মিলিয়ে দিচ্ছি। তাদেরকেও এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।'

....

আমাকে সবার আগে দেখল লায়লা। পরিবারের বাকিদের সাথে সে হাউয পাড়ে একটি আসনে বসা ছিল। কিন্তু তার অনুসন্ধানী চোখ বোধহয় আমাকেই খুঁজে ফিরছিল। দূর থেকে সে আমাকে দেখে ফেলল। আসন ছেড়ে ওঠে দৌড়ে আমার কাছে চলে এলো এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলো। সে কিছুই বলতে পারছিল না, শুধু কেঁদে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ আমি তার পিঠে স্নেহের হাত বুলাতে লাগলাম। অবশেষে তাকে আমি আমার থেকে পৃথক করে দিলাম এবং তাকে দেখতে থাকলাম।

সর্বশেষ যখন তাকে আমি হাশরের মাঠে দেখেছিলাম তখন তার অবস্থা ছিল বড় শোচনীয়। দেখতেও কেমন কুশ্রী কুশ্রী লেগেছিল। কিন্তু এখন আমার মেয়েকে পরিদের মতো সুন্দর লাগছিল। তাকে এভাবে দেখে আমি মনের অজান্তেই আল্লাহর ওই রহমতের শুকরিয়া আদায় করলাম যার ভিত্তিতে সে আজ আমাদের সাথে মিলিত হতে পেরেছিল। আমি তাকে বললাম–

'লায়লা! দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের দিন শেষ, এখন সর্বদা সুখ-শান্তি ও আরাম আয়েশে থাকবে।'

এতক্ষণে বাকিরাও আমার কাছে এসে পড়েছিল। আমার অন্য দুই মেয়ে আরিফা ও আলিয়াকে বরাবরের মতোই সুন্দর লাগছিল। আমার ছোট ছেলে আনোয়ার

তার মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি সকল ছেলে-মেয়েকে গলায় জড়িয়ে নিলাম। এরপর তাদেরকে বললাম–

'আমার সন্তানেরা! তোমাদেরকে নিয়ে আমার খুব গর্ব হয়। তোমরা দুনিয়ার চাকচিক্য ও রং-তামাশার ওপর আল্লাহর ওয়াদাকে প্রাধান্য দিয়েছ। তোমরা তুচ্ছ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ফায়দাকে ত্যাগ করে চিরস্থায়ী জীবনকে বেছে নিয়েছ। আজ তোমাদের চিরস্থায়ী সফলতার দিন। আসো সবাই এক সাথে কাওছার সুধা পান করে এ দিনের সফলতার সূচনা করি।'

এটা বলে আমি পাশের একটি আসনে বসে পড়লাম। বাকিরাও আমাকে ঘিরে বসে গেল, বসেই আমি লায়লাকে বললাম–

'বেটি। আমি তোমার বৃত্তান্ত শুনতে চাই। কিন্তু আগে আনোয়ার, আলিয়া ও আরিফা বলো, তোমরা কি ঠিকঠাক মতো তোমাদের মায়ের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলে।'

তিন জনই বললো, বিভিন্ন ফেরেশতা হাশর-দিবসের শুরুতেই তাদের অত্যন্ত নিরাপদে আরশের ছায়ার নিচে পৌঁছে দিয়েছিল। তাদের পরে লায়লা বললো–

'আব্বু আমি অনেক কঠিন মুহূর্ত দেখেছি। শিঙ্গার আওয়াজ শুনে আমি যখন কবর থেকে বের হলাম তখন সবখানে অদ্ভুত আতঙ্ক বিরাজ করছিল। সবাই এক দিকে দৌড়ে পালাচ্ছিল। তখন কারো শরীরেই কাপড় ছিল না। কিন্তু ভয়, আতঙ্ক ও পেরেশানি একটাই ছিল যে, কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছিল না, আর না কারো নিচের বস্ত্রহীনতার খেয়াল ছিল। আমি আপনাদের সবাইকে খুব তালাশ করেছি। কিন্তু আপনাদের কোনো হদিসই পেলাম না। অগত্যা আমিও সে দিকেই দৌড়তে লাগলাম যে দিকে সবাই দৌড়াচ্ছিল।

জানা নেই, কতক্ষণ আমি এভাবে দৌড়েছিলাম। তখন মনে হচ্ছিল, গন্তব্যে পৌছার এক উন্মাদনা সবাইকে তাড়া করে ফিরছিল। মানুষ আতঙ্কিত ছিল। ছিল পেরেশান। কিন্তু সবাই একই দিকে দৌড়ে পালাতে বাধ্য ছিল।'

আমি তার কথায় ফোঁড়ন কেটে বললাম–

'এটা ছিল ইসরাফীলের শিঙ্গার প্রভাব, প্রত্যেক মানুষ হাশরের মাঠের দিকে দৌড়াতে বাধ্য ছিল। মানুষ দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকুক, সবার মনোযোগ এক দিকে করে দেওয়া হয়েছিল।'

'জি আব্বু! আপনি ঠিক বলেছেন। সকল মানুষ একই দিকে যাচ্ছিল। চলতে চলতে আমার পায়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। তা থেকে রক্ত বেরোতে লাগলো। ক্লান্তি আর দুর্বলতায় শরীর ভেঙে পড়ছিল। কিন্তু ভেতরে কোনো এক বস্তু ছিল যা থামতে দিচ্ছিল না। পিপাসার কারণে অবস্থা বড় করুণ ছিল; কিন্তু কোথাও এক ফোঁটা পানি ছিল না।

'ভয়াবহ গরম ছিল' কিন্তু কোথাও কোনো গাছ বা ছায়া ছিল না। আব্বু! গোটা রাস্তা ছিল ধূ ধূ মরুভূমি। পাহাড়, সাগর, নদী-নালা, গাছপালা মোটকথা উঁচু নিচু কিছুই ছিল না। কী বলবো কত কষ্টকর সফর ছিল। দুনিয়া হলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ে যেতাম, মরে যেতাম। কিন্তু এখানে না তো পড়ে যাওয়া ভাগ্যে ছিল, না মৃত্যুবরণ করা। অগত্যা শুধু দৌড়াচ্ছিলামই।'

'এরপর কী হলো?' আনোওয়ার আফসোস মিশ্রিত গলায় জিজ্ঞেস করলো–

'এভাবে চলতে চলতে না জানি কত সময় পরে আমি হাশরের মাঠে এসে পৌঁছেছি। কিন্তু এখানে অন্য এক মুসিবত অপেক্ষা করছিল। সবখানে অদ্ভুত ভয়ানক ফেরেশতা ঘুরাফেরা করছিল। এদের আকৃতি দেখেই ভয় লাগছিল। আমার সাথে তো এরা কিছুই করেনি তবে অন্যদেরকে নির্মমভাবে বেধড়ক পেটাচ্ছিল। কিন্তু প্রহারের এ দৃশ্য দেখেই আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল।'

আছেমাকে তুমি কোথায় পেয়েছিলে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তাকেও হাশরের মাঠেই কান্নারত অবস্থায় পেলাম। আব্বু সে বড় আরাম আয়েশে লালিত-পালিত হয়েছিল। তাকে দেখে তো আমি আমার সকল কষ্ট ভুলে গেলাম। এরপর আমরা দু'জন একসাথে থাকতাম, যেন কিছুটা সাহস পাওয়া যায়; কিন্তু আপনার সাথে সাক্ষাতের পর তার সাহস ও মুক্তির আশা একদম ওঠে গেল।'

আলিয়া জিজ্ঞেস করলো–

'তার সাথে তোমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ কোথায় হয়েছিল?'

'যখন সেজদার হুকুম হয়েছিল আমি সেজদায় চলে গেলাম। তখন সে আমার পাশেই ছিল। কিন্তু সে সেজদায় যেতে পারলো না। দুনিয়াতে সে সর্বদা বলতো, আমাদের ইবাদত এবং আমাদের নামাযের কোনো প্রয়োজন আল্লাহর নেই। আর যদি থাকেও তবু তিনি বড় ক্ষমাশীল। তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। সে এই বলে রোযা ছেড়ে দিত যে, আমার সুন্দর তক নষ্ট হয়ে যাবে।'

'তুমি যখন সেজদা থেকে উঠেছ তখন সে কোথায় ছিল?' আফিয়া জিজ্ঞেস করলো।

'আমার পাশেই ছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন আদেশ দিলেন, প্রতি হাজারে নয়শো নিরানব্বই জনকে পৃথক করা হোক তখন ফেরেশতারা তাকে টেনে হেঁচড়ে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল। এরপর হিসাব-নিকাশের জন্যে আমাকে আল্লাহর সামনে পেশ করা হলো।'

'সেখানে কী হলো?' এবার নাঈমা জিজ্ঞেস করলো।

'আমার কাছে তো মনে হচ্ছিল, এখন আল্লাহ তায়ালা আমার আমলনামা আমার বাম হাতে দিয়ে আমাকে আযাবের ফেরেশতাদের হাতে তুলে দিবেন, কিন্তু রব্বে

কারীম বড় অনুগ্রহ করেছেন। ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করা হলো। আমি বলে দিলাম, আমি সব বিষয়ের ওপর ঈমান রাখতাম এবং সমস্ত ইবাদতও করতাম। এরপর মোটা মোটা নৈতিক বিষয়াদি, আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং হুকুকুল ইবাদ (মানুষের অধিকার) সম্পর্কে প্রশ্ন হয়েছে। আমি এরও জবাব দিয়ে দিলাম। এরপর আমার এ আশঙ্কা হলো, যদি আল্লাহ তায়ালা স্বাভাবিক জীবনে কৃত নাফরমানি এবং গুনাহগুলো সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করে বসেন। কিন্তু এরপর তিনি আমাকে কোনো প্রশ্নই করেননি।'

এটা শুনে আমি বললাম–

'বেটি লায়লা! যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে পরবর্তী প্রশ্ন করে ফেলতেন তাহলে তুমি ধরা পড়ে যেতে। তিনি যাকে ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন তাকে এমন কোনো প্রশ্ন করেন না যার উত্তর অবধারিতভাবে না বোধক আসবে। এ আচরণ কেবল তাদের সাথেই করা হয় যাদেরকে আটকানো উদ্দেশ্য থাকে। তিনি তোমাকে তাই জিজ্ঞেস করেছেন যার সঠিক উত্তর তোমার আমলনামায় প্রস্তুত ছিল। তোমার আমল নামায় যদিও গুনাহ ও নাফরমানিও ছিল, কিন্তু তিনি জেনে বুঝে ইচ্ছে করেই সেগুলো এড়িয়ে গেছেন।'

'হ্যাঁ আব্বু! তিনি শেষে আমাকে একটি কথা বলেছিলেন। তা হলো, তুমি আবদুল্লাহর মেয়ে। তোমার তো তার সাথেই থাকা উচিত। এরপর তিনি ফেরেশতাদেরকে বললেন, এর আমলনামা ডান হাতে দিয়ে তাকে তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দাও। তখন আমার খুশির যে অবস্থা ছিল, তা বলে বোঝাতে পারবো না।'

আমার পাশেই বসে থাকা সালেহ তার কথা শুনে বললো– 'তোমার ক্ষমা আবদুল্লাহর কারণে হয়নি। তবে তোমার পিতার কারণে তোমার মর্যাদা বেড়েছে ঠিক। এ মুহূর্তে তুমি হাউযে কাওছারের ভি আই পি লাউঞ্জে বসা আছ। জানো! তোমার ওপর, তোমার ভাইবোনদের ওপর এবং তোমার মায়ের ওপর এ মেহেরবানি কেবল তোমার পিতা আবদুল্লাহর কারণে। এটা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ যে, কামিয়াব লোকদের মাঝে যার মর্যাদা সবচে' উঁচু হবে তার কাছের মানুষদেরকে আল্লাহ তায়ালা তার নিকটে জমা করে দিবেন।'

এ কথা শুনে আলিয়া বললো–

'এজন্যেই তো আমাদের ভাই-বোনদের বংশের কোনো সদস্যকে এখানে আসার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কেবল আমার ভাই-বোন এবং আমার আম্মাকে ফেরেশতারা এখানে আসতে দিয়েছে। বাকিরাও এখানে আছে, কিন্তু তাদেরকে পেছনেই অবস্থান করানো হচ্ছে। এটা শুনে নাঈমার চেহারায় কষ্টের গভীর ছাপ ফুটে উঠল। তার ভেতর নাঈমা বললো–

"জমশেদ ছাড়া।"
একথা শুনে এক ধরনের নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। অবশেষে নিস্তব্ধতার পর্দা বিদীর্ণ করে আনোয়ার বললো– "আব্বু আমাকে আপনার উস্তাদ ফারহান সাহেবের ওই বয়ানটাই বাঁচিয়েছে, যা আমি আপনার থেকে অনেকবার শুনেছিলাম। ওই বয়ানটা আমি জীবনে শতভাগ বাস্তবায়ন করেছিলাম।"
আরিফা বললো–
"ভাই! ওই বয়ানটা কী ছিল? আমাদেরকেও শোনাও।"
আনোয়ার চোখ বন্ধ করে বলতে লাগলো–

"আমাদের যুগের মুসলিহীনরা মানুষদের ভেতর থেকে উন্নতির এ সহজতা ও চাহিদাকে মিটিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তায়ালা এমনটি করেন না। তিনি চান, এ চাহিদার মনোযোগটা দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতের দিকে ফিরে যাক। দুনিয়ার অভিজাত ও বিত্তশালী শ্রেণির মাঝে শামিল হওয়ার পরিবর্তে মানুষের মাঝে এ আগ্রহ সৃষ্টি হোক যে, সে আল্লাহর নৈকট্যশীল ও জান্নাতের অভিজাত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে। আপনি কোরআনের দাওয়াত পড়ে ফেলেছেন, তা মানুষের ভেতর এটা ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি করতে চায় না। কোরআনের সর্বপ্রথম সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ সাহাবায়ে কেরাম এ চিন্তা-চেতনার মানুষ ছিলেন। আবু বকর ও ওমরের দানশীলতা, আব্দুর রহমান ও ওসমানের বদান্যতা আর আলী ও আবু যরের যাপিত সরল জীবন আখেরাতের ওপর এ বিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল। আখেরাতের ওপর বিশ্বাস মানুষের মাঝে যে কী পরিবর্তন আনতে পারে তা বোঝার জন্যে কোরআনের এ আয়াতটি লক্ষ্য করুন– "তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা, আর যা আল্লাহর নিকট আছে তা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে সে কি ওই ব্যক্তির সমান যাকে আমি পর্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, যাকে পরে কেয়ামতের দিন হাজির করা হবে?" (সুরা কাসাস: ২৮, ৬০-৬১)

আপনি চিন্তা করুন, যার অন্তরে এ একটি মাত্র আয়াতের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে তার জীবনটা কীভাবে অতিবাহিত হবে? এ ধরনের ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের সময় কখনো আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে না। তবে অর্থ ব্যয়ের সর্বোত্তম খাত হবে, নিজের নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন সেরে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে সজ্জিতকরণ। সে দুনিয়ার কোনো নেয়ামত অর্জনের জন্য কখনো নিজের আখেরাতকে নষ্ট করবে না। সে দুনিয়ার বাড়ির আগে আখেরাতের বাড়ির কথা ভাববে, দুনিয়ার গাড়ির পূর্বে আখেরাতের বাহনের কথা চিন্তা করবে। নীতি-

নৈতিকতাহীন উলঙ্গ এবং অর্ধ উলঙ্গ মহিলাদের দিকে তাকানোর সাময়িক স্বাদের জন্য সে ওই সমস্ত হুরদের থেকে বঞ্চিত থাকাটা মেনে নিবে না যাদের চাঁদের মতো চেহারা, চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য এবং স্থায়ী যৌবন কখনো শেষ হবে না। পরিবারের প্রয়োজন এবং চাহিদা তাকে কখনো এমন রাস্তায় নিয়ে যেতে পারবে না, যা শেষ পরিণামে জাহান্নামের চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। স্ত্রী-সন্তানদের ভালোবাসা তাকে বাধ্য করবে যে, সে তাদেরকেও জান্নাতের রাস্তার মুসাফির বানিয়ে দিক, তাদের লালন-পালনে দিকনির্দেশনা প্রদান করুক, তাদেরকে সময় দিক এবং বলুক, বাঁচতে যদি হয় তাহলে জান্নাতের জন্যই বাঁচ। জান্নাতের সফলতাই তো প্রকৃত সফলতা। দুনিয়া ধোঁকার বেড়াজাল ছাড়া কিছুই না, সেখানে আমাদের পূর্বেও অগণিত মানুষের পরীক্ষা হয়েছে এবং আমাদেরও পরীক্ষা হচ্ছে। কয়েক বছরের ব্যাপার মাত্র। পরে না আমরা থাকবো, না পরীক্ষার মুহূর্ত। কিছু থাকলে আল্লাহর রহমত থাকবে। তার জান্নাত থাকবে। চিরস্থায়ী নেয়ামত থাকবে। সম্মান ও মর্যাদা থাকবে। সৎব্যক্তিদের সংশ্রব থাকবে। বন্ধু-বান্ধবের মনজুড়ানো সাহচর্য থাকবে। হীরে-মানিক্যের প্রাসাদ থাকবে। মেশক ও আম্বরের উদ্যান থাকবে। পাতলা রেশমি বস্ত্রের পরিধেয় থাকবে। দুধ ও মধুর নহর (নদী) থাকবে। নির্মল স্বচ্ছ পানির লহরি থাকবে। স্বর্ণ-রৌপ্যের বৃক্ষ থাকবে। পাখি ও মাছ দ্বারা কাবাব তৈরি থাকবে।

মোটকথা আরাম-আয়েশ এবং হুর-গিলমানের এ চিরস্থায়ী দুনিয়া, পানি ও শরাব এবং প্রাসাদ-অট্টালিকার এ চিরস্থায়ী দুনিয়া, স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং সুখ-শান্তির এ চিরস্থায়ী দুনিয়া এমন দুনিয়া হবে যেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না, কেনো চিন্তা-পেরেশানি থাকবে না, কোনো হতাশা ও নিরাশা থাকবে না, কোনো আফসোস ও অনুতাপ থাকবে না। কেউ বঞ্চিত হবে না। কোনো সীমাবদ্ধতা থাকবে না। হতভাগা সে নয় যে, ধ্বংসশীল দুনিয়া অর্জন করতে পারেনি; বরং হতভাগা সে, যে এ চিরস্থায়ী দুনিয়া খুইয়ে বসেছে। চিরকালীন সুখ-শান্তি যার হাতছাড়া হয়ে গেছে।"

শেষের কথাগুলো বলার সময় আনোয়ারের আওয়াজ ভারী হয়ে এসেছিল। তার বোধ হয় তার ভাই জমশেদের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে জানে না যে, এ বয়ান শুনিয়ে সে আমার জন্য জমশেদের আঘাতের সাথে সাথে উস্তাদ ফারহান সাহেবের আঘাতও তাজা করে দিয়েছে। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম– "সম্ভবত হাশরের মাঠেও আমাদেরকে কিছু না কিছু পেরেশানির শিকার হতে হবে। এটা শুধু জান্নাতই যেখানে প্রবেশের পর দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা-পেরেশানি চিরকালের জন্যে যোজন দূরে সরে যাবে।

নূহ সম্প্রদায় এবং ধর্ম পরিবর্তনকারী

উস্তাদ ফারহান আহমদ ও জমশেদের কথা মনে পড়ে হৃদয়টা বিষণ্ণতায় ভরে উঠেছিল। সালেহ তা ভালো করে বুঝতে পেরেছিল। আমার মনোযোগটা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সে বললো– "তুমি কি ভুলে গেছ, আমরা যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বেরিয়েছিলাম। মাঝ পথে এসে তুমি বসে পড়লে। এখন স্বয়ং তিনিই তোমাকে স্মরণ করেছেন।

"আব্বু কি এখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করেননি? আনোয়ার আশ্চর্য প্রকাশ করে বললো।

ব্যাপারটি খোলাসা করতে গিয়ে সালেহ বললো–

হাশরের মাঠে যেই কামিয়াব হয় সেই সোজা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে যায়। সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাকে কাওছারের পেয়ালা তুলে দেন। এ সুযোগে তার পরিবারকেও সেখানে ডাকিয়ে নেওয়া হয়। এরপর ওই সকল লোক আনন্দ উল্লাস করতে করতে এ "ঝিলের" পাড়ে কোথাও এসে বসে। কিন্তু তোমার পিতার হাশরের মাঠ ঘুরে দেখার আগ্রহ ছিল। এজন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে তারই আবেদনের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয়বার হাশরের মাঠে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

"ভালো। এ ডেকে পাঠানোর নির্দিষ্ট কোনো কারণ?" নাঈমা জিজ্ঞেস করলো। উত্তরে সালেহ বললো–

"কথা হলো, বিভিন্ন উম্মতের হিসাব হতে হতে এখন নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের হিসাব-নিকাশ শুরু হয়েছে। কিন্তু তার সম্প্রদায় এ কথা অস্বীকারই করে বসেছে যে, তিনি তাদের কাছে আল্লাহর কোনো বাণী পৌঁছিয়েছিলেন।"

'এটা কেমন কথা? এরা এটা কীভাবে বলতে পারে যে, তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছায়নি? তাদেরকে তো দুনিয়াতেই এ অপরাধে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল যে, তারা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। আল্লাহর এমন ফয়সালার পর তারা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে এটা কীভাবে বলতে পারে যে, নূহ আলাইহিস সালাম তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছাননি?' আশ্চর্য হয়ে আরিফা প্রশ্ন করলো।

লায়লা তার কথায় আরেকটু বাড়িয়ে বললো–

"তারা যদি নির্লজ্জ এ মিথ্যা কথা বলেই থাকে, তবু কোরআনে তো বলা হয়েছিল, তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়ে হাত-পা থেকে সাক্ষী নেওয়া হবে। এরপরও তারা এ মুহূর্তে এমন কথা কীভাবে বলতে পারে?"
তাদেরকে বুঝানোর জন্য সালেহ ব্যাখ্যা করলো–

"এ কথা যারা বলছে তারা নূহ আলাইহিস সালামের ওই কওম নয় যাদের ওপর আযাব এসেছিল। তারা তাঁর ওই সকল সন্তান যারা তার ওপর ঈমান এনেছিল। এবং পরবর্তীতে এ ঈমান আনয়নকারীদের সন্তানাদিরাই দুনিয়াকে আবাদ করেছিল। কিন্তু তাদের বড় একটি সংখ্যা এমন ছিল যাদের মাঝে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পর সরাসরি কোনো নবী আসেনি। ফলে তারা তাওহীদ ও আখেরাতের ক্ষেত্রে ওই দিকনির্দেশনাই মেনে চলতো যা মূলত; হযরত নূহ আলাইহিস সালাম দিয়ে গিয়েছিলেন.....। যদিও সময়ের বিশাল ব্যবধানের কারণে ওই দিকনির্দেশনা তাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছায়নি বা সেগুলোতে ব্যাপক বিকৃতি সাধিত হয়ে গিয়েছিল। মোটকথা ওই দিকনির্দেশনাগুলো তাদের কাছে যথাযথভাবে না পৌঁছার কারণেই তারা বিলকুল অস্বীকার করে বসেছে যে, তাদের কাছে নূহ আলাইহিস সালামের কোনো বাণী পৌঁছায়নি।'
আলোচনায় অনুপ্রবেশ করে সালেহের কথাকে আমি আরেকটু বিশ্লেষণ করলাম–

'দেখো কথা হলো, মানবজাতির বৃহৎ একটি অংশ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের বংশধর। এদের মধ্যে থেকে অনেকগুলো দল, বিশেষ করে ছামী ধারার লোকেরা বসবাস করতো দুনিয়ার মূল কেন্দ্রে তথা মিডল ইস্ট ও তার আশপাশে। আর নবুওয়ত ও রেসালাতের ধারাও এদের মধ্যেই জারি ছিল। কিন্তু আরো অনেকগুলো দল এমন ছিল যাদের মাঝে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পর কোনো নবী আসেননি। বিশেষ করে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পর তো তার বংশ ছাড়া অন্য কোনো বংশেই নবীর আগমন ঘটেনি। সুতরাং এরাই ওই সমস্ত অবশিষ্ট লোক যারা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সন্তানাদি বা তার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন উম্মতের হিসাব-নিকাশের মুহূর্তে এদেরকে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের উম্মতদের সাথে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এরা নূহ আলাইহিস সালামের তালীম-তরবিয়তকে সেভাবে জানতো না যেভাবে জানতো আহলে কিতাব ও মুসলমানরা। ফলে তারা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের বাণী পৌঁছানোকে অস্বীকার করে দিয়েছে। আর এদের কথাটা এক দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল নয়।'

আমার কথাকে আরেকটু আগে বাড়িয়ে সালেহ বললো– আবদুল্লাহ ঠিক বলেছে। বাস্তবতা হলো, নূহ আলাইহিস সালামের এ সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহর বাণী মূলত উম্মতের মুহাম্মদিয়া পৌঁছিয়েছিল। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের উম্মতের সকল শুহাদাদেরকে ডাকা হচ্ছে, যারা পেছনের দুনিয়ায় এ সমস্ত লোকদের মাঝে হকের সাক্ষী দিয়েছিল। শুহাদারা আজ বলবে, তারা কোনো-না-কোনোভাবে এ সমস্ত লোকদের মাঝে একত্ববাদের বাণী পৌঁছে দিয়েছিল, যা ছিল হযরত নূহ আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকারী এবং পরবর্তী যুগে এসে যা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ নবীর আবির্ভাবের পর কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে ওই বাণীকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। আর উম্মতে মুসলিমা তাওহীদের এ আমানতকে নূহ আলাইহিস সালামের সন্তানদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন।'

নাঈমা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো–

'তাদেরকে তাহলে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার সাথে কেন পেশ করা হলো না?' 'তারা যদি ইসলাম কবুল করে নিত তাহলে এমনই হত। কিন্তু তারা ইসলাম কবুল করেনি; বরং পূর্বপুরুষদের বিকৃত ধর্মের ওপরই প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। আজ প্রত্যেক উম্মতকে যেহেতু তাদের রাসূলের সাথে পেশ করা হচ্ছে তাই এ ধরনের সমস্ত লোককে কওমে নূহ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কারণ, তাদের বাপ-দাদারা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান এনেছিল।' আমি উত্তর দিলাম। এরপর আলোচনার সারাংশ করে বললাম–

'কওমে নূহের প্রথমাংশে আল্লাহর বাণী হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নিজে পৌঁছিয়েছেন আর শেষাংশে পৌঁছিয়েছে মুসলমানরা, যারা ছিল হযরত নূহ আলাইহিস সালাম সহ সকল নবী-রাসূলের বাণী রব্বানীর আমানতদার।'

'চলো ভাই এখন ডাকা হচ্ছে।' আমাকে সম্বোধন করে সালেহ বললো। সাথে সাথে আমরা দু'জন সেখান থেকে ওঠে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

. . . . .

আমরা আরো একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ছিলাম। সেই একই নূর, একই শ্রী আর একই মহত্ব। আমার এমন মনে হচ্ছিল যে, আমি শত শত বছর ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে চিনি। আরো মনে হচ্ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা আমার হৃদয়ে ক্রমশ বেড়েই চলছিল। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের পেছনের দিকে একটি আসনে বসা ছিলাম। অপলকনেত্রে তাকিয়ে ছিলাম তাঁর মুবারক চেহারার দিকে। তিনি তখনো পাশে বসা সাহাবীদের সাথে কথা বলছিলেন। এরই মধ্যে একজন সাহাবী এসে তাঁর কানে কানে কী যেন বললেন।

আমার পাশে বসা সালেহ ফিসফিস করে আমাকে বললো–

'ইনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমার ব্যাপারে অবগত করছেন।'

এরপরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা তুলে আমাকে দেখলেন এবং হৃদয়জয়ী মুচকি হেসে আমাকে কাছে ডাকলেন। এর দ্বারা সালেহের কথা সত্য প্রমাণিত হলো যে, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার আগমনের ব্যাপারেই তাঁকে অবগত করেছিলেন।

এরপর মুচকি হেসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিতদেরকে বললেন– 'মানবজাতির সম্মানিত দাদা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের উম্মতরা তার সাক্ষী গ্রহণ করতে এই বলে অস্বীকার করেছে যে, নূহ আলাইহিস সালাম তাদের কাছে সরাসরি কোনো বাণী পৌঁছাননি। বাস্তব কথা হলো, এ বাণী আমার উম্মতেরা কওমে নূহ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছিল। আপনারা যেহেতু সকল নবীকেই মানেন, আর আমার মাধ্যমে যে দ্বীন আপনারা পেয়েছেন সেটাই ছিল হযরত নূহ আলাইহিস সালামের দ্বীন। এজন্যে এটা আপনাদের দায়িত্ব যে, আপনারা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের পক্ষ হয়ে আল্লাহর আদালতে উপস্থিত হবেন এবং এ সাক্ষী দিবেন যে, ঈমান ও আমলের যে দাওয়াত নূহ আলাইহিস সালাম দিয়েছিলেন এবং আমি যা আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলাম তা আপনারা কোনো কমবেশি না করে কওমে নূহ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং আমার ও নূহ আলাইহিস সালামের দাওয়াতী মিশনকে পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন।
এটা বলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশে বসে থাকা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন–
আবু বকর দাঁড়িয়ে যান।
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে বললেন–
ইনি আমার বন্ধু আবু বকর। ইনি ছাড়াও আমার যমানা থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত আমার সকল প্রতিনিধিরা এখানে উপস্থিত। আপনারা সবাই আবু বকরের নেতৃত্বে আল্লাহর আদালতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং ওই হকের সাক্ষী দেন যা আপনাদের কাছে আছে।

এটা বলতেই উপস্থিত সবাই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্তদ্বয়ে চুমু খেয়ে সামনে বাড়লেন। তারপর উপস্থিত সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– এর হাতে চুমু খেল। আমার সিরিয়াল ছিল সবার শেষে। আমিও এ সৌভাগ্য অর্জন করলাম এবং আমরা সবাই সাইয়্যিদুনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু– এর নেতৃত্বে হাশরের মাঠের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। এ মহান ব্যক্তিদের মাঝে সবার পেছনে পেছনে আমি চলছিলাম। সালেহ আমার সাথে ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস থেকে ওঠার

সময় সে এই বলে আমার থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল যে, এ সাক্ষী দেওয়ার জন্যে তোমাকে একাই যেতে হবে। তবে সেখান থেকে ফিরে আসার পর আবারো তোমার সাথে আমার দেখা হবে। রাস্তায় আমি দিলে দিলে এ চিন্তা করছিলাম, আমি তো এর যোগ্য নই যে এমন মহান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার প্রতিনিধিত্ব করব। এই অনুভূতি আমার ওপর এতটাই প্রভাব ফেলল যে, আমি চিন্তা করলাম, এ কাফেলা থেকে আমি চুপেচুপে বেরিয়ে যাবো। কে জানবে আমার কথা? আর তখন আল্লাহ তায়ালা আমার সমকালীন অন্য কাউকে ডেকে নিবেন। এ চিন্তা করে আমি আস্তে আস্তে পিছু হটতে লাগলাম। এতটাই পিছু হটলাম যে, আমার এবং তাদের মাঝে যথেষ্ট দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেল। সুযোগটাকে গনিমত মনে করে যখনই আমি হাউযে কাওছারের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্যে মোড় নিলাম তখনই পেছন দিক থেকে একটি আওয়াজ এলো–
'আবদুল্লাহ! এটা কী করছ?'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে পেছনে তাকাতেই দেখি, সাইয়্যিদুনা আবু বকর আমার পেছনে দাঁড়ানো। আমি কিছুটা লজ্জিত হলাম। আমার অবস্থা এমন হয়ে গেল, যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা খেয়ে গেলাম। আমি প্রথমে চিন্তা করলাম, কোনো অজুহাত তুলে ধরব। কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হলো, এটা তো দুনিয়া না; হাশরের মাঠ। এখনই আল্লাহ তায়ালা আসল কথা সবাইকে জানিয়ে দিবেন। তখন মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাবে। এজন্যে সঠিক কথা বলে দেওয়াটাই আমি নিরাপদ মনে করলাম। সাথে সাথে আমি তাঁর কাছে এ দরখাস্তও করলাম, আমার পরিবর্তে আপনি অন্য কাউকে নিয়ে নিন।

আমার কথা শুনে আবু বকর হাসতে হাসতে বললেন- 'সাক্ষীর জন্য লোকদেরকে নির্বাচন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তিনিই এক ফেরেশতার মাধ্যমে বলে দিয়েছিলেন যে, আবদুল্লাহ কেন ফিরে যাচ্ছে?'

আলতো করে তিনি আমার হাত ধরলেন এবং সামনের দিকে চলতে লাগলেন। রাস্তায় তিনি আমাকে বোঝাতে লাগলেন–

'দেখো আবদুল্লাহ! এ কাফেলার সকল মানুষকে নির্বাচন করেছেন আল্লাহ তায়ালা। তুমি কি জান, তার কাছে এ নিবার্চনের মাপকাঠি কী?' চুপচাপ আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলেন–

'উগ্রপন্থা, আবেগপ্রবণতা এবং কুপ্রবৃত্তির তাড়নার উর্ধ্বে ওঠে যে ব্যক্তি হককে নিজের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে। তাওহীদ ও আখেরাতকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে তারাই আল্লাহর নিকট এ সাক্ষীর জন্যে যোগ্য। দেখো তোমার

যুগের মুসলমানরা কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে তো হয়তো মুক্ত ছিল, কিন্তু তারা অধিকাংশ গোঁড়ামি এবং আবেগপ্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। মানুষ বিভিন্ন ফেরকা ও মাসলাকের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। তারা কেবল ওই কথাই গ্রহণ করতো যা তার ঘরনার কোনো লোকে বলে। তারা মানুষদেরকে নিজের ফেরকার দিকেই আহ্বান করতো। তারা তাদের বড়দের বড়ত্বের অনুভূতি বুকে নিয়েই বেঁচে থাকতো। অথচ তুমি বেঁচে থেকেছ আল্লাহর বড়ত্বের অনুভূতি নিয়ে। সবকিছুকে তুচ্ছ করে তুমি সত্যকে কবুল করেছ এবং সব ধরনের গোঁড়ামি থেকে পবিত্র হয়ে তা গ্রহণ করেছ। আল্লাহর একত্ববাদই ছিল তোমার জীবনের সবচে' বড় উদ্দেশ্য। আর আল্লাহর সাক্ষাতের জন্যে মানুষদেরকে তৈরি করা ছিল তোমার জীবনের লক্ষ্য। তাছাড়া দাওয়াতের কাজ তুমি কেবল নিজ সম্প্রদায়ের মাঝেই করনি; বরং অমুসলিম সম্প্রদায়গুলোতেও তাওহীদ ও আখেরাতের বাণী পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আপ্রাণ মেহনত করেছ। এ সমস্ত বিষয়ই আজ তোমাকে নির্বাচন করার কারণ হয়েছে।'

. . . . .

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আরশের ডান পাশে বুকের ওপর হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা সবাই হযরত আবু বকরের নেতৃত্বে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সামনের দিকে জনসমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়েছে দৃষ্টিসীমার বাইরে। এদের প্রত্যেকেই ছিল মহা উদ্বিগ্ন আর অবস্থা ছিল বড় শোচনীয়। সবাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রচণ্ড ভয়ে এদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল, পুরো পরিবেশে হালকা ফিসফিসানির আওয়াজ ছাড়া কোনো আওয়াজই ছিল না। এরাই ছিল হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ওই সমস্ত উম্মত যারা মূলত তারই বংশধরদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিল।

খানিক বাদে একটি আওয়াজ উঁচু হলো–

'নূহের সাক্ষীরা আল্লাহর আদালতে উপস্থিত হও।'

আমার ধারণা ছিল, এখন আবু বকর সামনে গিয়ে কিছু বলবেন। কিন্তু ওই সময় আমি দেখলাম, পেছন থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং আরশে এলাহির সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন।

বলা হলো–

'বলো মুহাম্মদ! কী বলতে চাও?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন–

'প্রভু আপনি আমাকে নবুওয়ত দিয়েছেন এবং আপনার কালাম আমার ওপর প্রত্যাদেশ করেছেন। ওই কালামে আপনি আমাকে বলেছেন, নূহও ওই দ্বীনে

তাওহীদ নিয়েই এসেছিলেন যা আপনি আমাকে প্রদান করছেন। ওই সত্য দ্বীনের সাক্ষীই আমি আমার উম্মতের মাঝে দিয়েছি। আজ তারা আপনার সামনে উপস্থিত। তারা এ সাক্ষী দিবে যে, ওই সত্য দ্বীনকে তারা কোনো কমবেশি না করে নূহ সম্প্রদায় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল।'

বলা হলো–

'তুমি সত্য বলেছ। তোমার উম্মতদেরকে সামনে আসতে বলো।'

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সামনের দিকে পা বাড়াতে লাগলেন। আমরা সবাই তাঁর অনুকরণে তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আওয়াজ এলো–

'তোমরা কারা?'

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের পরিচয় দিলেন। এরপর একে একে আমাদের সবার নাম ও যমানা বলে বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, আমরা উম্মতে মুহাম্মদিয়া। আমাদের মাঝে আপনার শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হকের সাক্ষী দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, নূহও এ দ্বীন নিয়েই এসেছিলেন। নূহ ও মুহাম্মাদের এ দ্বীনকেই আমরা দুনিয়ার প্রত্যেক জাতির কাছে পৌঁছিয়েছি। নূহ আলাইহিস সালামের উম্মত হিসাবে যারা আজ আপনার সামনে দণ্ডায়মান তাদের কাছেও আমরা হক পৌঁছে দিয়েছিলাম।

এ সাক্ষীর পর নূহ আলাইহিস সালামের উম্মতের জন্য পালানোর রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। একথা স্পষ্ট হয়ে গেল, নূহ আলাইহিস সালামের দ্বীনও ওইটাই ছিল যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিল এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়া ওই দ্বীনকে দুনিয়াব্যাপী পৌঁছে দিয়েছিল। এখন নূহ আলাইহিস সালামের উম্মতের হিসাব-নিকাশ এ সাক্ষীর ভিত্তিতেই হবে। আমাদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এজন্যে আমরা ফেরার পথে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

ফেরার পথে আমাদের কাফেলা ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চলছিল। এবার কাফেলার আমীর ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ফেরেশতাদের সাথে আমাদের কাফেলা হাশরের মাঠ অতিক্রম করে হাউযে কাওছারের দিকে চলছিল। ইচ্ছে করেই আমি একটু পিছে পিছে হাঁটছিলাম। হঠাৎ কেউ এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললো–

'ভাই তুমি কোথায় পালানোর চেষ্টা করছ?'

পেছনে তাকিয়ে দেখি সালেহের ওষ্ঠদ্বয়ে মুচকি হাসি খেলা করছে। লজ্জায় আমি চুপ হয়ে গেলাম। সে হাসতে হাসতে বললো– 'আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো যে, তোমার কাফেলার আমীর ছিলেন আবু বকর। আজ তার জায়গায় যদি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতেন তাহলে তোমাকে দু'চারটে তো অবশ্যই লাগাতেন।'

তার কথা শুনে আমিও হাসতে লাগলাম। একটু পর আমি বললাম–

'আবু বকর বা ওমর বড় কথা নয়। ওমরও তাই করতেন যা আবু বকর করেছেন। কেননা, তাকেও তো একই সত্তা প্রেরণ করতেন– যিনি সারা জীবন আমার ভুলত্রুটিগুলো গোপন রেখেছেন।'

এরপর আমার মাথায় একটি আশঙ্কা জন্ম নিল। আমি সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম–

'তুমি আমার ব্যাপারে কীভাবে জানলে। সবাই কি ব্যাপারটি জেনে ফেলেছে?'

'না না। আবু বকর বড় সহনশীল মানুষ। তিনি কাউকে বলেননি। আর আমি! আল্লাহ তায়ালা তো আমার মাধ্যমে আবু বকরকে তোমার ব্যাপারে জানিয়েছিলেন। এজন্যেই আমি জেনে গিয়েছি। তাছাড়া তুমি তো সত্য বলেছ। তুমি কি জান আল্লাহ কী বলে আমাকে আবু বকরের কাছে পাঠিয়েছিলেন? আমার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে সে বললো–

'আমার বান্দাকে থামাও, বিনম্রতার দরুন সে তার দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছে।'

লজ্জা ও কৃতজ্ঞতার মিশ্র অনুভূতিতে আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। খানিক বাদে আমি সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম– 'এখানে হাশরের মুয়ামালাগুলো কীভাবে চলছে?'

'বিভিন্ন নবীদেরকে তাদের উম্মতদের ব্যাপারে এ সাক্ষীর কাজ চলছে। প্রত্যেক নবী ও রাসূল তার উম্মতের ব্যাপারে এ সাক্ষী দিচ্ছেন যে, তিনি তার উম্মত পর্যন্ত আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। এরপর প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যার আমল নবীর শিক্ষা অনুযায়ী হয়েছে তার ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিয়ে তাকে কামিয়াব ঘোষণা করা হচ্ছে।' সালেহ জবাব দিল।

আমার মনে পড়ে গেল। সালেহ বলেছিল, হিসাব-নিকাশের এ পর্ব শেষে সাধারণ হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। আমি আশায় বুক বাঁধলাম, হয়তোবা ওই ধাপে আমার ছেলে জমশেদের মুক্তির কোনো ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু এটা তো স্পষ্ট, আমার হাতে কিছুই করার ছিল না। আমি সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম–

'এখানকার কী অবস্থা?'

'অবস্থা জিজ্ঞেস করো না, কারো অবস্থা জিজ্ঞেস করার মতো কেউ নেই। সবাই চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। সবচে' বড় কথা হলো, কারো জানা নেই তার সাথে কী আচরণ হবে?'

আমরা দু'জন এ আলোচনা করতে করতে কাফেলার পেছনে পেছনে হাঁটছিলাম। সহসা জোরদার এক হুলস্থুলের আওয়াজ শুনতে পেলাম। হুলস্থুলের কারণ ছিল, মুসলমানদের বড় একটি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সাহায্য চেয়ে তার দিকে এগুতে চাচ্ছিল। এরা চিৎকার করছিল, কান্নাকাটি করছিল এবং ফরিয়াদ করে বলছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমরা আপনার উম্মত। আর ফেরেশতারা তাদেরকে চাবুক মেরে মেরে

সরিয়ে দিচ্ছিল। এরা হাশরের ভয়াবহতায় এতটাই ক্লান্ত ও সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, মার খেয়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবয়বে আশার ক্ষীণ একটি কিরণ আঁচ করতে পেরেছিল।

এ দৃশ্য দেখে রহমাতুল্লিল আলামীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতাদের সরদারকে কাছে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এরা তো আমার উম্মত, আমার নাম উচ্চারণকারী, আমার কালেমা পাঠকারী। এদের সঙ্গে এ আচরণ কেন হচ্ছে? ফেরেশতারা বড় আদবের সাথে জবাব দিল–

'হে আল্লাহর রাসূল! নিঃসন্দেহে এ সকল লোক আপনার নাম উচ্চারণকারী। কিন্তু আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে আপনার দ্বীনে কী কী নতুন বিষয় জন্ম দিয়েছিল।'

একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকে অসন্তোষের ছাপ দেদীপ্যমান হয়ে ওঠলো। তিনি বললেন–

'ধ্বংস হোক ওই সকল লোক যারা আমার পরে আমার আনীত দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছে।'

এটা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাউযে কাওছারের দিকে চলে গেলেন। কাফেলার অন্যান্য লোকেরাও তাঁর পেছনে পেছনে চলে গেল। আমিও সামনে যেতে চাচ্ছিলাম। এমন সময় সালেহ বললো–

'থামো এবং দেখো এখানে কী হয়?'

আমি দেখলাম, ফেরেশতারা ওই সকল লোকদের সঙ্গে অনেক কঠিন আচরণ করছে। ইত্যবসরে হাশরের মাঠে বাম দিক থেকে আরো কিছু ফেরেশতা চলে এলো। তারা অত্যন্ত নির্মমভাবে এ সকল লোকদেরকে মারধর শুরু করলো। ফেরেশতারা একেকটি চাবুক মারতো আর হাজারো লোক এ আঘাতের চোটে চিল্লাতে চিল্লাতে দূরে ছিটকে পড়তো। অল্পক্ষণের মাঝেই হাউযের পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিষ্কার হয়ে গেল।

ইসলাম ধর্মে নিত্য নতুন আক্বীদা ও আমল আবিষ্কারকারীরা মার খেয়ে ছটফট করতে করতে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

আমি সালেহের সাথে দাঁড়িয়ে এ ঘটনা দেখছিলাম। আমি চিন্তা করছিলাম, এরা তো ওই সকল হতভাগা যাদের জন্য কোরআনের হেদায়াত আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত যথেষ্ট ছিল না। এজন্য তারা এতে সংযোজন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে দ্বীনের চেহারাকে বিকৃত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে। তাদের কাছে তাদের প্রতিটি গুমরাহী ও বদ আমলের একটি খোঁড়া যুক্তি থাকত। যখন কেউ তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করতো তখন সে-ই তাদের জানের দুশমন

হয়ে যেত। যখন তাদের বলা হতো, কোরআনের বাইরে কোনো আক্বীদা আবিষ্কার করা যেতে পারে না। আর রাসূলের সুন্নতের বাইরে কোনো আমল কবুল হতে পারে না, তখন তারা এগুলোকে বাজে কথা মনে করতে থাকতো। কিন্তু এর ফলাফল তারা আজ ভোগ করে নিয়েছে।

আমি আনমনে এসব চিন্তা করে যাচ্ছিলাম। এরই মাঝে স্যালেহ আমাকে বললো–

'আবদুল্লাহ! আমি মানুষদেরকে এখনো বুঝে ওঠতে পারিনি। প্রত্যেক নবীর উম্মতরাই সুস্পষ্ট হেদায়াত পেয়ে যাওয়ার পরও বিদআতের প্রতি তাদের এত আকর্ষণ কেন ছিল?' 'তুমি অনেক উত্তম প্রশ্ন করেছ আমিও জীবনভর ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করতাম। আমার ধারণা মতে এর বড় কারণ হলো বাড়াবাড়ি।' মানুষ বড্ড আবেগপ্রবণ জাতি। এরা বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির শিকার হয়ে যায়। নবীদের নাম উচ্চারণকারীদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি এমন ঘটেছে। কিছু লোক বস্তুবাদিতার দিকে ঝুঁকে পড়ে নবীগণের শিক্ষাকে বিলকুল ছেড়ে দিয়েছে আর কিছু লোক নবী এবং সালেহীনদের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে মধ্যমপন্থা পরিত্যাগ করেছে। এ সীমালঙ্ঘন আর বাড়াবাড়িই বিদআতের কারণ হয়েছে।'

আমার কথায় মাথা নাড়িয়ে সালেহ বললো–

'এ বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি এবং সীমালঙ্ঘনের সবচে' বড় নমুনা ছিল খ্রিস্টানরা। একদিকে তারা মুসা আলাইহিস সালামের শরীয়তকে ছেড়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে বৈরাগ্যবাদ আবিষ্কার করে দ্বীনে এমন এমন ইবাদত, রিয়াজত-মুজাহাদা এবং বিদআত ঢুকিয়ে দিল যে, সাধারণ মানুষের জন্য ধার্মিক পরিচয়ে জীবনযাপন করা অসম্ভব হয়ে গেল। আমলের সাথে সাথে তাদের মাঝে আক্বীদার ব্যাপারেও চূড়ান্ত পর্যায়ের বাড়াবাড়ি ছিল। নবীগণের উম্মত হয়েও তারা আল্লাহর জন্য স্ত্রী ও ছেলে সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু বন্ধু! বাস্তবতা হলো, তোমরা মুসলমানরা এ কাজে কোথায় পিছিয়ে রইলে?'

সর্বশেষ কথাটা সে অনেক জোর দিয়ে বললো। আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম–

'আর আজ এর ফলাফলও তো ভোগ করে নিয়েছে। খ্রিস্টানরাও মুসলমানরাও। এটা বলার সময় একটু পূর্বে দেখা দৃশ্যগুলো আমার চোখের সামনে খেলা করছিল।

হিসাব-নিকাশ ও জাহান্নামী

বিদআতিদের পেটানোর ঘটনার পরে আমি অনেক মর্মাহত হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ, আমি ওই ঘটনায় আমার সমকালীন অনেক পরিচিত জনকেও দেখেছিলাম। আমাকে স্বাভাবিক করার জন্যে সালেহ হাউযে কাওছারের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানকার মনোরম পরিবেশে খানিকক্ষণ একাকী ও চুপচাপ কাটিয়ে আমি অনেকটা হালকা বোধ করলাম। এরপর সালেহ আবারো আমাকে হাশরের মাঠে নিয়ে এলো।

রাস্তায় সে আমাকে বললো, যে মুহূর্তটায় আমরা এখানে ছিলাম না সে মুহূর্তটায় সকল নবীদের সাক্ষীকার্য সম্পন্ন হয়ে গেছে। এরপর শুরু হয়েছিল সাধারণ হিসাব-নিকাশ। এরও সূচনা হয়েছিল উম্মতে মুহাম্মদিয়া দিয়ে, যাদের বড় একটি অংশ হিসাব-নিকাশ শেষে নিজের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই শুনে ফেলেছে। 'এর মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্তে আমি এখানে ছিলাম না?'

'হ্যাঁ, এমনই। তবে জান্নাতে যাওয়ার পর যখনই চাইবে এ হিসাব-নিকাশের অডিও, ভিডিও রেকর্ড দেখতে পারবে।'
হাসতে হাসতে সে আমার কথার জবাব দিল।
'কিন্তু ভাই লাইভ দেখা সে তো লাইভই।' আমিও মুচকি হেসে তার কথার জবাব দিলাম।

'এখানে ঘটে যাওয়া অত্যন্ত মজার একটি ঘটনা আমি তোমাকে বলছি, শোনো, ঘটনাটি হলো, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মুশরিকদেরকে তাদের শিরকের কারণে পাকড়াও করা হলো তখন তাদের বড় একটি অংশ পরিষ্কার অস্বীকার করলো, তারা কোনো শিরক করতো না। এ অস্বীকারকারীদের মাঝে কেবল পরবর্তী যমানার লোকেরাই ছিল না, মক্কার মূর্তিপূজক কাফেররাও ছিল।'
'এর কারণ?'
'এর কারণ ছিল, আজ সবাই স্বচক্ষে পরিলক্ষণ করেছে, আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা নেই। এ সমস্ত লোক প্রথম দিকে তো তাদের দেব-দেবীদেরকে ডেকেছে এবং তালাশ করেছে। এটা তো স্পষ্ট দেব-দেবীদের কেউ এখানে ছিল না, তাহলে জবাব কোত্থেকে আসবে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে সকল ফেরেশতা, সালেহীন এবং বুযুর্গদেরকে ডাকা হতো তারা এ সমস্ত লোকদের শিরককে

পরিষ্কার নাকচ করে দিল। এরপর একটি মাত্র উপায় বাকি ছিল। তা হলো, এরা সবাই নিজেদের শিরককে বিলকুল অস্বীকার করে দিবে। কিন্তু এর দ্বারা তো কোনো ফায়দা নেই। কারণ, এ সমস্ত পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে জাহান্নামের ফায়সালা হয়ে গেছে।"

"এ মুহূর্তে কার হিসাব-নিকাশ চলছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "এ মুহূর্তে তোমার সমকালীন লোকদের হিসাব চলছে। এজন্যেই আমি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। তুমি দেখতে পারবে, মানুষকে একজন একজন করে হিসাবের জন্য ডাকা হচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তি দু'জন ফেরেশতার সাথে আল্লাহর আদালতে হাজির হচ্ছে। একজন ফেরেশতা পেছনে পেছনে চলে এবং নিজের তত্ত্বাবধানে আরশ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর অন্যজন ফেরেশতা বান্দার আমলনামা বহন করে তার সাথে সাথে চলে। এদের মধ্যে পেছনে পেছনে চলা ফেরেশতাকে বলা হয় 'সায়েক্ব' আর আমলনামা বহনকারীকে বলা হয় 'শহীদ'। সায়েক্ব ওই ফেরেশতা যে বান্দাকে হাশরের মাঠ থেকে আরশ পযর্ন্ত পৌঁছে দেয়। আর শহীদ হলো ওই ফেরেশতা যে বান্দার আমলের সাক্ষী প্রদান করে। এরাই ওই দুই ফেরেশতা যারা জীবনভর বান্দার ডানে ও বামে বিদ্যমান থাকতো। ডানের জন নেক আমল আর বামের জন বদ আমল লিপিবদ্ধ করতো। এদেরকে কোরআন শরীফে কিরামান কাতেবীন বলা হয়েছিল।"

"কিন্তু এখানে এসে তাদের মাঝে কে 'সায়েক্ব' আর কে 'শহীদ' হয়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। তিনিই বান্দাকে আদালতে উপস্থিত করার আগে কিরামান কাতেবীনকে অবগত করেন, দু'জনের মধ্যে কে কি দায়িত্ব পালন করবে?"

আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন সহকারী এক অফিসারকে আল্লাহর আদালতে পেশ করা হয়েছিল? তাকে জিজ্ঞেস করা হলো–

"কী আমল করেছ?"

কাঁপতে কাঁপতে সে উত্তর দিল–

"প্রভু! জীবনে আমার কিছু ভুল হয়ে গিয়েছিল। তবে পরবর্তীতে আমি তোমার অনেক ইবাদত ও রিয়াজত-মুজাহাদা করেছি। নিজের জীবন তোমার দ্বীনের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছি।"

ইত্যবসরে তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকা ফেরেশতাকে ইশারা করা হলো, সে বললো–

"প্রভু! সে সত্য বলেছে।"

জিজ্ঞেস করা হলো–

"তুমি একজন সরকারি চাকুরিজীবি ছিলে। তুমি কি ঘুষ নিয়েছ? মানুষকে চাপ দিয়ে তাদের থেকে টাকা খেয়েছ? অবৈধ পন্থায় বিধিমালাকে কঠিন করে মানুষকে ঘুষ দিতে বাধ্য করেছ?"

সে বললো–

"এগুলো আমি করেছিলাম। কিন্তু পরে তওবা করে নিয়েছিলাম।"

"তুই তওবা করে নিয়েছিলি?" প্রচণ্ড ধমকীর সুরে প্রশ্ন করা হলো। জবাবে তার মুখ থেকে একটি শব্দও বেরোয়নি। ফেরেশতা সামনে অগ্রসর হয়ে তার আমলনামা পড়তে শুরু করলো। যা থেকে জানা গেল, হারাম উপার্জন দিয়ে সে বাড়ি বানিয়েছে এবং সারা জীবন তাতে বসবাস করেছে। ইনভেস্টমেন্ট করে অনেক অর্থ বাড়িয়েছে, ছেলে-মেয়েদেরকে এ টাকা দিয়েই উচ্চ শিক্ষা দিয়েছে, স্ত্রীকে প্রচুর গয়না-গাঁটি বানিয়ে দিয়েছে। এ অর্থ-কড়ি দিয়ে সে আমৃত্যু উপকৃত হয়েছে। তবে মুখে মুখে তওবা করেছিল ঠিক এবং রিটায়ারমেন্টের পর দাড়ি, টুপি ও নামায-রোযা সব শুরু করে দিয়েছিল।

ফেরেশতাদের বিবরণ শেষ হতেই নির্দেশ হলো–

তার আমলনামা মিজানে (পাল্লায়) রাখো।"

ডান হাতের ফেরেশতা তার নেকীগুলো পৃথক করে ইনসাফের পাল্লার ডান দিকে রেখে দিল আর বাম দিকের ফেরেশতা তার গুনাহগুলো বাম দিকে রেখে দিল। ওই সরকারি অফিসার বড় নিরুপায় ও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এসব কিছু অবলোকন করে যাচ্ছিল।

ফেরেশতারা তাদের কাজ শেষ করতেই ফলাফল সামনে চলে এলো। বাম দিকের পাল্লা পুরোপুরি ঝুঁকে পড়লো। সে জুলুম, বে-ইনসাফী এবং ঘুষের মাধ্যমে যত হারাম উপার্জন করেছিল এবং মানুষদের সাথে যে কঠোরতা করেছিল সেগুলো তার তাবৎ নেক আমলকে ছাপিয়ে গেছে। তা দেখে ওই ব্যক্তি চিৎকার, আর্তনাদ এবং একটু দয়ার দরখাস্ত করতে লাগলো। বলা হলো–

"যে সমস্ত লোকদের থেকে তুই ঘুষ নিতি এবং কঠোরতা করতি তাদের প্রতি কি তোর কখনো দয়া হতো। দেখ তোর কামাই-উপার্জন আজ তোর কোনো কাজে আসেনি। তোর ঠিকানা জাহান্নাম। এরপর একজন ফেরেশতা তার আমলনামা তার বাম হাতে ধরিয়ে দিল।"

ওই ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো–

"আমি নিজের জন্যে কিছুই করিনি। এ সব কিছু আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানাদির জন্যে করেছিলাম। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ছেড়ে দাও। ধরতেই যদি হয় আমার বিবি-বাচ্চাদের ধরো।"

ফেরেশতারা জবাব দিল–

"তোর বিবি-বাচ্চাদের হিসাব-নিকাশও হবে। আগে তুই তো চল।"

এরপর উভয় ফেরেশতা তাকে মারতে মারতে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে গেল।

পরবর্তী ব্যক্তি পুলিশের একজন সিনিয়র অফিসার ছিল। আল্লাহ তায়ালা তার সাথে কোনো কথাই বলেননি। তার সাথে আসা ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেন, এর আমলনামায় কী আছে? জবাবে ফেরেশতারা তার জীবনের আকাম-কুকাম তুলে ধরলেন। যার মাঝে নিরাপরাধ মানুষের ওপর জুলুম, কতক নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা, জুয়া ও অসৎ আড্ডার পৃষ্ঠপোষকতা, ব্যভিচার ও মদ্যপান, ঘুষ ও বিলাসিতার মতো মারাত্মক মারাত্মক গুনাহ শামিল ছিল। আর নেকীর মধ্যে ছিল কয়েকটি মাত্র। ঈদের নামায যেগুলো একান্ত বাধ্য হয়ে রাষ্ট্রকর্তাদের সাথে ঈদগাহে গিয়ে পড়তে হতো।

জিজ্ঞেস করা হলো–

"নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্যে তোমার কি কিছু বলার আছে?"

সে বললো–

"প্রভু আমার অবস্থাটাই এমন ছিল। সবদিকে ঘুষের ছড়াছড়ি ছিল। আমি এসব করতে চাইতাম না। কিন্তু উর্ধ্বতন অফিসারদের চাপ ও পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে আমি বাধ্য হয়ে পড়েছিলাম।"

অত্যন্ত রূক্ষ আওয়াজে বলা হলো–

"তাহলে কি তুমি বাধ্য হয়ে পড়েছিলে?"

এরপর হুকুম করা হলো, এর অধীনে কাজ করতো এমন একজন জুনিয়র অফিসারকে পেশ করা হোক। কিছুক্ষণের মধ্যেই অত্যন্ত সুন্দর দেহাবয়বের অধিকারী অনেক দামী ও উন্নত পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো।

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো–

"আমার বান্দা তুমিও তো পুলিশে চাকুরি করেছ কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে তুমি ঘুষের রাস্তা কেন অবলম্বন করনি?"

সে উত্তর দিল–

"হে আমার প্রভু। আমি আজকের দিনে তোমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করতাম। এজন্যেই আমি কখনো ঘুষ নেইনি। সহকর্মীরা যখন আমাকে বাধ্য করতো আমি পরিষ্কার অস্বীকার করে দিতাম। সারাজীবন আমি সাদাসিধেভাবে কাটিয়েছি। কিন্তু ঘুষ নিয়ে আমি আমার ইনসাফ নষ্ট করিনি।

উত্তর এলো–

“হ্যাঁ, এরই বদলাস্বরূপ তোমার স্বল্প আমলকে আমি অনেক বেশি কবুল করেছি এবং হাশরের মাঠে তোমাকে সফলতা দান করেছি।”

এরপর অন্য পুলিশকে বলা হলো–

“তোমার কাছে নির্বাচনের বিষয় এটা ছিল না যে, তুমি জুলুম করবে এবং ঘুষ নিবে, না সাদাসিধে জীবনযাপন করবে। বরং তোমার নির্বাচনের বিষয় ছিল, জুলুম ছাড়বে, নাকি জাহান্নামে যাবে। অবশেষে তুমি তো জাহান্নামকেই পছন্দ করেছ। এখন এটাই তোমার চিরস্থায়ী বদলা।”

ওই পুলিশ বেচারা হার মানতে রাজি ছিল না। কেঁদে কেঁদে সে বলতে লাগলো–

“প্রভু! শয়তান আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল।”

উত্তর দেওয়া হলো–

“না। মূলত তুমি নিজেই একটা শয়তান ছিলে। অথচ তুমি আমার সামনে সাধারণ একটি পিঁপড়ের চেয়েও দুর্বল ও অক্ষম ছিলে। হায়রে তুচ্ছ মানব! তুমি যখন মানুষের ওপর জুলুম করতে তখনো তুমি আমার সামনেই থাকতে, কিন্তু আমি তোমাকে সুযোগ দিয়েছি। ওই সুযোগটাকে তুমি কাজে লাগাওনি। তুমি ভেবেছিলে, আমার সামনে তোমাকে হাজির হতে হবে না। দেখো তোমার ধারণা আজ ভুল প্রমাণিত হলো।”

এদিকে রাগ ও ক্রোধের এসকল শব্দ ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। ওদিকে হাশরের মাঠের বাম দিকে জাহান্নামের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। এ আগুন জ্বলার তীব্র আওয়াজে প্রতিটি হৃদয় প্রকম্পিত হয়ে ওঠেছিল। সবার ওপর দিয়ে বিভীষিকা বয়ে যাচ্ছিল। কলিজা ছিল প্রায় ওষ্ঠাগত। চোখ ছিল বিবর্ণ। মানুষের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল। হৃদয় এত দ্রুত ও সজোরে স্পন্দিত হচ্ছিল, যেন বুক ভেঙে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আজ পালানোর কোনো জায়গা ছিল না। এক পাপিষ্ঠের ফায়সালা হচ্ছিল, আর অন্য পাপিষ্ঠদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে যাচ্ছিল। যুগের ফেরাউন, ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গ, প্রতাপশালী রাজা-বাদশাহ, অঢেল ধন-সম্পদের মালিক, প্রসিদ্ধতম সেলিব্রেটি, দুর্দান্ত ক্ষমতার অধিকারী সবাই সাধারণ গোলামের মতো; বরং ভেড়া-বকরির মতো নিরুপায় দাঁড়িয়ে নিজের ফয়সালার অপেক্ষায় ছিল। অথচ আজ তাদেরকে বাঁচানোর মতো কেউ ছিল না।

এরপর তাদের আমলনামা আনা হলো, যেখানে বাম পাল্লা ছিল ভারী। ফেরেশতারা সামনে এগিয়ে আমলনামা তাদের বাম হাতে ধরিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু ভয়ে তারা হাত পেছনে নিয়ে নিল। ফেরেশতাদের সাথে কি আর পেরে ওঠতে পারে? ফেরেশতারা তাদের হাতকে পেছনের দিক থেকেই বেঁধে, ওই বাঁধা অবস্থায়ই বাম হাতে আমলনামা ধরিয়ে দিল। এরপর উভয় ফেরেশতা

তাকে মারতে মারতে জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিয়ে গেল, যেখানে ভয়াবহ পরিণতি তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

পরবর্তী ব্যক্তি ছিল বিত্তশালী এক ধনকুবের। জিজ্ঞেস করা হলো 'তুমি তো দুনিয়ায় সম্পদের পাহাড় রেখে এসেছ। বলো, এত সম্পদ কীভাবে অর্জন করেছিলে আর কোথায় খরচ করেছিলে?'

সে জবাব দিল–

'প্রভু। আমি ব্যবসা করতাম। এর দ্বারা যে সম্পদ আমি কামিয়েছি তা গরিবদের মাঝে ব্যয় করেছি।'

ফেরেশতাকে ইঙ্গিত দেওয়া হলো। সে বিস্তারিত বর্ণনা করতে শুরু করলো। বর্ণনামতে ওই ব্যক্তি জীবনভর বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা কামিয়েছে। জীবনের শুরুর দিকে ক্ষুদ্র ব্যবসা দিয়ে পথ চলা শুরু করেছে। চিনি, আটা এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মিশ্রণ ও গুদামজাতের মাধ্যমে বহু মুনাফা অর্জন করেছে। এতে তার ব্যবসা দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করেছে। পরবর্তীতে সে আরো কয়েকটি ব্যবসা শুরু করলো। কিন্তু এবার সে অর্থোপার্জনের জন্যে কার্টেল তৈরি করেছে। কার্টেলের কাজই ঝিল, বাজার নিয়ন্ত্রণ করে নিজের মর্জি মাফিক মূল্যে জিনিস বিক্রি করা। অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এ কার্টেল নিজেদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং ঘুষের মাধ্যমে নিজেদের মর্জি মাফিক মূল্য নির্ধারণ করাত। এভাবে সাধারণ গরিবরা চড়া মূল্যের নির্মম চাকায় পিষ্ট হতে থাকল আর এদের পুঁজি লাখ থেকে কোটি, কোটি থেকে বিলিয়নে উন্নীত হতে লাগলো। সমাজে নিজের সুনামের জন্যে এরা এ বিশাল ধনভাণ্ডার থেকে দু'চার টাকা দান করতো এবং বস্তা বস্তা ওয়াহ ওয়াহ কামাতো।

ফেরেশতার বর্ণনার পর তার কোনো কিছু বলার সুযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ শিল্পপতি ছিল বড় চালাক মানুষ সে চিৎকার দিয়ে দিয়ে বলতে শুরু করলো, এ পুরো বিবরণ একদম ভুল। আমি কোনো খারাপ কাজ করিনি। সবকিছু আমি কানুন মোতাবেক করেছি। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবসা করেছি। আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই। এ ফেরেশতা মিথ্যা বলছে। সে লাগাতার চিৎকার করে যাচ্ছিল।

আওয়াজ এলো–

'তবে কি তোমার প্রমাণ দরকার? তাও দেখানো হবে।' এ কথাগুলোর সাথে সাথেই শিল্পপতির আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ তার হাত থেকে আওয়াজ আসতে শুরু করলো। মোটামুটি ঠিক সেই বিবরণটিই পুনরাবৃত্তি করা হলো, যা ফেরেশতা দিয়েছিল। পরে ঠিক একই ধরনের সাক্ষ্য তার পা থেকে আসতে শুরু

করলো। এভাবে একে একে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করলো। এমনকি তার সীনা তার দিলের ওই মন্দ নিয়তও বর্ণনা করে দিল যা ফেরেশতাদের রেকর্ড ছিল না।

এমন সাক্ষীর বিপরীতে কিছু বলার সুযোগ একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। তার সামনের ঠিক সেই পরিণামই এসে হাজির হলো যা প্রথমোক্তদের সামনে এসেছিল। তবে তার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটি বিষয় ছিল। তা হলো, ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হলো তারা যেন জাহান্নামে অন্যান্য আযাবের সঙ্গে তার ধন-সম্পদ ও অর্থ-ভাণ্ডারকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করে এবং এর দ্বারা তার পিঠ, ললাট ও কোমরে উপর্যুপরি দাগ দিতে থাকে। এরপর ফেরেশতারা তাকে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে গেল।

. . . . .

একজন একজন করে মানুষ আসছিল যাচ্ছিল আর তার হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হচ্ছিল। কয়েকজনের হিসাব-নিকাশটা বড় শিক্ষণীয় ছিল। তাদের মধ্যে থেকে প্রথম ব্যক্তি যখন এসেছে মনে হয়েছে তার আমলনামায় নেকীর পাহাড় পড়ে আছে। ইবাদত, রিয়াজত, নফল, যিকির, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব এবং ওমরার সারি লেগে ছিল, যা তার আমলনামা থেকে শেষ হচ্ছিল না। কিন্তু এরপর যখন ফেরেশতা তার আমলনামায় বিদ্যমান ওই আমলগুলো পড়তে শুরু করলো যার সম্পর্ক ছিল আল্লাহর সৃষ্টির সাথে, তখন দেখা গেল সে কাউকে গালি দিয়েছে। কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কাউকে অপবাদ লাগিয়েছে, কাউকে মেরেছে পিটিয়েছে। আদালত থেকে বলা হলো, সমস্ত মাজলুমকে ডেকে নিয়ে আসো। এরপর প্রত্যেক মাজলুমকে তার অংশ অনুপাতে ওই ব্যক্তির নেকী দিয়ে দেওয়া হলো। কিছু মাজলুম এরপরও রয়ে গেল যারা তার নেকীর কোনো অংশ পায়নি। তখন হুকুম করা হলো, এ মাজলুমের গুনাহের একটি অংশ ওই ব্যক্তির পাল্লায় রেখে দাও। এরপর যখন আমলকে ওজন করা হলো, বাম পাল্লা একদম ঝুঁকে পড়লো। ওই ব্যক্তি চিৎকার করতে থাকলো। কিন্তু এর দ্বারা কোনো উপকার হলো না। ফেরেশতারা টানতে টানতে তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে গেল।

এমন কিছু মানুষও এলো যাদের পরিণাম দেখে আমার নিজের ব্যাপারে আশঙ্কা সৃষ্টি হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিল আলেম। তাকে যখন আদালতে হাজির করা হলো, আল্লাহ তায়ালা তার সমস্ত নেয়ামত তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ সমস্ত নেয়ামতের শুকরিয়ায় তুমি কী করেছ? সে তার ইলমী ও দাওয়াতী কাজের ফিরিস্তি টানতে লাগলো। জবাবে তাকে বলা হলো, তুমি এসব মিথ্যা বকছো। তুমি তো এসব করেছিলে তোমাকে আলেম

বলার জন্যে। দুনিয়াতে তা তোমার বলা হয়েছে। ফয়সালার ফলাফল পরিষ্কার ছিল। ফেরেশতারা তাকে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে গেল। এমনই কাণ্ড ঘটেছে এক শহীদ ও এক বদান্য ব্যক্তির সাথে।

তাদেরকেও একই প্রশ্ন করা হলো। তারাও নিজেদের কৃতিত্ব শোনালো। কিন্তু প্রতিবার জবাব এসেছে, তোমরা যা কিছু করেছ দুনিয়ার মানুষকে দেখানো এবং তাদের দৃষ্টিতে বড় হওয়ার জন্যেই করেছ। সুতরাং সে প্রশংসা ও হাততালিই তোমাদের প্রতিদান। তোমরা না আমার জন্যে কিছু করেছ, না আমার কাছে তোমাদেরকে দেওয়ার জন্যে কিছু আছে।

হিসাব-নিকাশ ও ফয়সালা সমূহের মধ্যে কিছু অদ্ভুত ও অভাবিত বিষয়ও সামনে আসছিল। দুনিয়ায় সংঘটিত হওয়া সকল ষড়যন্ত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা, পারিবারিক, দাপ্তরিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর পেছনে কার্যকারক কারণসমূহ, এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, গোপন সাক্ষাতের সিদ্ধান্তসমূহ, রুদ্ধদ্বার বৈঠক গৃহিত ষড়যন্ত্রসমূহ, মোটকথা আজ সবকিছুই প্রকাশ করে দেওয়া হচ্ছিল। সম্মানী ব্যক্তিরা অসম্মানী হচ্ছিল, ভব্যজনেরা ব্যভিচারী সাব্যস্ত হচ্ছিল। নিষ্পাপ মানুষ গুনাহগার প্রমাণিত হচ্ছিল। মানুষ জীবনভর যে প্রভুকে ভুলে জীবনযাপন করেছে তিনি তাদের প্রতিটি মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন। এমন কোনো শব্দ ছিল না যা লিপিবদ্ধ হয়নি। কোনো নিয়ত বা ভাবনা এমন ছিল না যা আল্লাহর জানা নেই। সরিষার দানা পরিমাণ আমলও এমন ছিল না যা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এ সব কিছু আজ সকল মানুষের সামনে এমনভাবে প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন সকল মানুষ একদম বিবস্ত্র দাঁড়িয়েছিল।

আমি এসব কিছু চিন্তা করছিলাম আর মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছিলাম যে, আমার গুনাহ ও অপরাধগুলোও যদি আজ সামনে এসে যায় তাহলে কী হবে? আর কোনো শাস্তি না দেওয়া হোক, মানুষকে যদি কেবল বিবস্ত্র করে দেওয়া হয় তাহলে এটাই হয়ে যাবে আজকের সবচে' বড় শাস্তি। সালেহ সম্ভবত আমার কল্পনাসমূহ পড়ে ফেলেছিল। সে আমার পিঠ চাপড়ে বললো–

'রব্বে কারীম আজ তার নেক বান্দাদেরকে অপদস্ত করবেন না। তিনি তার নেক বান্দাদের গুনাহগুলোকে এমনভাবে গোপন করবেন যে, তাদের কোনো দোষ-ত্রুটি, কোনো ভুল, পদস্খলন বা গুনাহ মানুষের সামনে আসবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আল্লাহর চেয়ে অধিক ভদ্র ও ভব্য সত্তা তুমি আর কাউকে পাবে না।'

'অবশ্যই। কিন্তু এ মুহূর্তে তো আমি আল্লাহর পাকড়াও অবলোকন করছি। এভাবে যে, জাহান্নামের শাস্তি শুনানোর পূর্বে ব্যভিচার ও অসৎ লোকদের চেহারা

থেকে ভদ্রতা ও নিষ্পাপতার মুখোশ ছিড়ে ছুঁড়ে মারা হচ্ছে। এরপর তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করা হচ্ছে।' আমি শঙ্কিত কণ্ঠে জবাব দিলাম। সালেহ আমাকে আশ্বস্ত করতে বললো–
'এতো কেবল পাপিষ্ঠদের সাথে হচ্ছে। শারিরীক শাস্তির পূর্বে লাঞ্চনার মাধ্যমে তাদেরকে মানসিক শাস্তি দেওয়া হয়। নেককারদের সঙ্গে এমনটি কখনো হবে না।'
আমরা এ কথোপকথন করছিলাম। এরই মধ্যে আরো একজনকে আল্লাহর আদালতে নিয়ে আসা হলো। হাজির হয়েই সে আদালত সমীপে আরজ করলো–
'প্রভু! আমি অনেক দরিদ্র ঘরে জন্ম নিয়েছিলাম। শৈশব কেটেছে দারিদ্র্যের কষাঘাতে। যৌবনকালে এসে আমার কিছু অপরাধ হয়ে গিয়েছিল। তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও।'
ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করা হলো–
'সত্যিই কি আমি তাকে দারিদ্রতা দিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম?' ফেরেশতা আদবের সঙ্গে উত্তর দিল–
'মালিক! সে ঠিক বলছে। তবে সে যেগুলোকে অপরাধ বলছে সেগুলো তার মারাত্মক গুনাহ। সে ছিনতাইকারী হয়ে গিয়েছিল। সামান্য কিছু টাকা, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মোবাইলের মতো সাধারণ জিনিস ছিনতাই করার জন্যে কয়েকজনকে সে মেরে ফেলেছিল আর অনেককে আহত করেছিল।'
পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বললেন। 'আচ্ছা'!
এ আচ্ছা'তে যে ক্রোধ ছিল তাতে ওই ব্যক্তির শেষ পরিণাম স্পষ্ট ভেসে ওঠেছিল। এরপর আল্লাহর ক্রোধ আরো তীব্র হয়ে ওঠল।
'হে অভিশপ্ত! আমি তোকে গরিব বানিয়েছিলাম ঠিক। কিন্তু পরিপূর্ণ শারীরিক সুস্থতা ও সক্ষমতা দ্বারা এ সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলাম যে, তুই জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতির চেষ্টা করবি। তুই যদি তাই করতি তাহলে আমি তোকে অর্থ-সম্পদ দান করতাম। কেননা, তুই তো ওই পরিমাণ রিজিকই পেতি যা তোর জন্যে নির্ধারিত ছিল। কিন্তু তুই ওই রিজিক অর্জন করেছিস রক্ত প্রবাহিত করে আর অত্যাচার করে। আজ তোর বদলা এই যে, যাকে যাকে তুই হত্যা করেছিস এবং যাদের ওপর অত্যাচার করেছিস তাদের সবার গুনাহের বোঝাও তোকেই বহন করতে হবে। তোর ঠিকানা চিরস্থায়ী জাহান্নাম। অভিসম্পাত তোর ওপর। অনিঃশেষ মর্মান্তুদ শাস্তি তোর জন্যে।'
এ শব্দগুলো শেষ হতেই ফেরেশতারা তীরের গতিতে তার দিকে ছুটে গেল এবং বড় নির্মমভাবে পিটিয়ে পিটিয়ে ও টেনে হেঁচড়ে তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে গেল।

পরবর্তী ব্যক্তি হিসেবে যাকে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে তাকে দেখে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। সে আর কেউ নয়, আমার মেয়ে লায়লার বান্ধবী আছেমা। তার অবস্থা পূর্বের চেয়েও অনেক বেশি শোচনীয় ছিল। আল্লাহর আদালতে তাকে হাজির করা হলো—
প্রথম প্রশ্ন করা হলো—
'পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে নাকি পড়তে না?'
এর জবাবে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। দ্বিতীয়বার বলা হলো—

'তুমি কি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত ছিলে? তুমি কি আল্লাহকে মানতে না? তুমি কি নিজেকে মাবুদ মনে করতে? তোমার কাছে কি আমার জন্যে কোনো সময় ছিল না? নাকি আমি ছাড়া এমন কোনো সত্তা ছিল যিনি তোমাকে বিভিন্ন নেয়ামতরাজি দান করেছিলেন?'
নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্যে কোনো শব্দ আছেমা খুঁজে পাচ্ছিল না। তার পরিবর্তে ফেরেশতা বললো—
'প্রভু! সে বলতো আল্লাহর আমাদের নামাযের প্রয়োজন নেই।'

'ভালো! সে ঠিক বলেছিল। কিন্তু এখন সে জেনে ফেলেছে, নামাযের প্রয়োজন আমার ছিল না, তার নিজেরই ছিল। নামায জান্নাতের চাবি। তা ছাড়া কেউ জান্নাতে কীভাবে প্রবেশ করবে?'

এরপর আছেমাকে পরবর্তী প্রশ্নসমূহ করা হলো। জীবন কী কাজে কাটিয়েছ? যৌবন কীভাবে পার করেছ? মাল কোত্থেকে কামিয়েছ, কীভাবে খরচ করেছ? ইলম কতটুক অর্জন করেছ তার ওপর কী পরিমাণ আমল করেছ? যাকাত, মানুষকে সহযোগিতা, রোযা হজ্ব এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রশ্ন একের পর এক করা হচ্ছিল। কিন্তু প্রতিটি প্রশ্ন তার লাঞ্ছনা ও অপদস্ততাকেই বাড়িয়ে তুলছিল। অবশেষে আছেমা চিৎকার মেরে কাঁদতে লাগলো। সে বলতে থাকলো—

'প্রভু! আমি আজকের দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলাম। সারা জীবন প্রাণীদের মতো কাটিয়েছি। জীবনভর ধন-সম্পদ, মডেলিং, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং আনন্দ উল্লাসে মত্ত থেকেছি। তোমার বড়ত্ব আর এ দিনের সম্মুখীন হওয়াকে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। হে আমার রব! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। একবার মাত্র আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দাও। এরপর দেখো, সারা জীবন আমি তোমার বন্দেগিতে কাটাব। কখনো নাফরমানি করবো না। তুমি আমাকে আর একটি মাত্র সুযোগ দিয়ে দাও।' এটা বলে সে জমিনে পড়ে ছটফট করতে লাগলো।

'আমি যদি তোমাকে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় পাঠাই তাহলেও তুমি তাই করবে। তোমাকে যদি আরেকবার সুযোগ প্রদান করি তবু তোমার চাল-চলন পাল্টাবে না। আমি আমার বাণী তোমার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার চোখ বন্ধ ছিল। তুমি অন্ধ সেজে রয়েছিলে। এজন্য আজ তোমাকে জাহান্নামের অন্ধকার গুহায় নিক্ষেপ করা হবে। তোমাকে না ক্ষমা করা হবে, না দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া হবে।'
এরপর তার সাথেও তাই হলো যা তার পূর্বের লোকদের সাথে হয়েছিল।

.....

আছেমার পরিণাম দেখে আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। মনের অজান্তেই এ আশঙ্কা আমাকে প্রচণ্ড রকম তাড়া করে ফিরছিল যে, আমার ছেলে জমশেদের সঙ্গেও যদি এমনই হয় তাহলে এ দৃশ্য দেখে আমি সহ্য করতে পারবো না।
আমি সালেহকে বললাম–
'আমি এখন আর এখানে থাকার সাহস পাচ্ছি না। আমাকে এখান থেকে নিয়ে বিদায় হও।'

সালেহ আমার অবস্থা বুঝে ফেলল। সে কোনো কথা না বাড়িয়ে আমার হাত ধরে একদিকে রওয়ানা হয়ে গেল। রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে অনেক দৃশ্য ছিল। অগণিত শতাব্দী ধরে হাশরের মাঠের অসহ্য দুঃখ-কষ্ট পেতে পেতে মানুষের অবস্থা শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। বিত্তশালী, শক্তিশালী, প্রভাবশালী, মেধাবী, সুন্দরও ক্ষমতাবানসহ সব ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা এ ময়দানে অক্ষম ও নিরূপায় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দুনিয়াতে তাদের সবকিছু ছিল। ছিল না শুধু ঈমান ও নেক আমলের পুঁজি। সবকিছুর মালিক এরাই আজ সবচে' বেশি বঞ্চিত ছিল। স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের অধিকারী এরাই আজ বড় করুণ অবস্থায় ছিল। হাজার হাজার বছর যাবৎ লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হতে থাকা এ সকল লোক মৃত্যুর জন্যে দুআ করছিল, রহম ও অনুগ্রহের আশায় বুক বাঁধছিল, কোনো শাফায়াত ও সুপারিশের তালাশে অস্থির হয়ে ঘুরে ফিরছিল। কোথাও আযাবের ফেরেশতার হাতে মার খেত, কোথাও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে থাকতো, কোথাও তীব্র গরমে দিশেহারা হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতো। মুক্তির জন্যে এরা যে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত ছিল। নিজের সন্তান-সন্ততি, নিজের বিবি-বাচ্চা, নিজের তাবৎ সম্পত্তি এবং গোটা মানবজাতিকে ফিদয়া (মুক্তিপণ) স্বরূপ পেশ করে আজকের দিনের পাকড়াও থেকে বাঁচতে চাইছিল। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। সেই সময় তো হাতছাড়া হয়ে গেছে, যখন অল্প টাকা খরচ করে, কিছু মাত্র সময় ব্যয় করে জান্নাতের মহা নেয়ামতরাজি অর্জন করা সম্ভব ছিল। এ সকল লোক সারা জীবন

নিজের অবস্থান, সন্তান-সন্ততি ও অর্থকড়ির জন্যেই ইনভেস্ট করেছিল। হায়! এরা যদি আজকের এ দিনের জন্যেও কিছু ইনভেস্ট করে রাখতো তাহলে আজ এদের এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো না।

হাশরের মাঠে একের পর এক মানুষের নাম ঘোষণা করা হচ্ছিল। যারই নাম নেওয়া হতো দু'জন ফেরেশতা তার দিকে ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে যেত এবং তাকে ধরে এনে আল্লাহর সামনে হাজির করে দিত। মনে হচ্ছিল, ফেরেশতারা নিজেদের শিকারের ওপর শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, এবং কোটি কোটি মানুষের ভেতর থেকে নিজের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দ্বিধায় খুঁজে নিয়ে আসতো। আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি মনের অজান্তেই জমশেদকে খুঁজে ফিরছিল। কিন্তু সে কোথাও নজরে পড়লো না।

সালেহ আমার অবস্থা আঁচ করতে পেরে বললো–

"আমি জেনে বুঝেই তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি না। তার বিবি-বাচ্চা, শ্বশুর-শাশুড়ি, সবাইকে আরো আগেই জাহান্নামের ফয়সালা শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানা নেই, তার শেষ পরিণাম কী হবে? আল্লাহ তায়ালা কোনো ফয়সালা প্রদানের আগে তুমি যদি তার সাথে সাক্ষাৎ না কর তাহলেই ভালো হয়।"

তার একথা শুনে উচিত তো ছিল, আমি আরো চিন্তিত হবো, পেরেশান হবো। কিন্তু না জানি কেন আমার দিলে ভিন্ন এক অনুভূতি সৃষ্টি হলো। আমি সালেহকে বলতে লাগলাম–

"আমার প্রতিপালক যে ফয়সালা প্রদান করবেন আমি তাই মেনে নিব। আমি আমার ছেলেকে যতটুকু মুহাব্বত করি আমার মালিক আল্লাহ তায়ালা তারচে বহুগুণ বেশি মুহাব্বত করেন স্বীয় বান্দাদেরকে। বরং গোটা সৃষ্টিজীব নিজের সন্তান-সন্ততিকে যতটুকু ভালোবাসে আমার রব তারচে ঢের বেশি স্নেহ করেন নিজের বান্দাদেরকে। জমশেদকে ক্ষমা করার এক শতাংশ সুযোগও যদি থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর কোনো ভাবেই যদি সে ক্ষমাযোগ্য না হয় তাহলে প্রতিপালকের এমন অবাধ্যদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র দয়া নেই। যদিও সে আমার ছেলে হোক না কেন।"

আমার কথা শুনে সালেহ মুচকি হেসে বললো–

"তুমি বড় অদ্ভুত মানুষ। এতটা অদ্ভুত যে....... ।"

"না। অদ্ভুত আমি নই, আমার রব। তিনি আমার অন্তরকে শান্ত করে দিয়েছেন। এখন আমি কারো ব্যাপারে কোনো চিন্তা করি না। আচ্ছা আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

"আবদুল্লাহ শোনো। এখনো পর্যন্ত মানুষের মুক্তির সম্ভাবনা রয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা হাশরের মাঠের এ ভয়াবহতাকে অনেক মানুষের গুনাহ মাফের উসিলা

বানিয়ে তাদের নেকআমল সমূহের ভিত্তিতে তাদেরকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন। ঘটনাক্রমে তুমি অনেক পাপিষ্ঠের হিসাব-নিকাশ হতে দেখেছো; কিন্তু কিছু মানুষকে এখনো ক্ষমা করা হচ্ছে। কারণ, আল্লাহর ইনসাফে কোনো প্রকৃত নেকী কখনো নষ্ট হয় না।"

আমি সালেহের কথার জবাবে বললাম–

"নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক বড় গুণগ্রাহী। তিনি মানুষের গুণ ও আমলের যথাযথ মূল্যায়ন করে থাকেন। কিন্তু বলো, আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়?"

"আমরা এখন মূলত জাহান্নামের দিকে যাচ্ছি। আমি এ মুহূর্তে তোমাকে জাহান্নামীদের সাথে সাক্ষাৎ করাতে চাচ্ছি।"

"তাহলে কি আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করবো?"

"না না। ব্যাপার আসলে তা না। এ মুহূর্তে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের নিকটে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই যে মাঠটা তুমি দেখছ না। তার বাম দিকে একটি রাস্তা ক্রমান্বয়ে গভীর হয়ে পরিখার মতো রূপ ধারণ করছে। জাহান্নামের সাতটি দরজাই এ পরিখা থেকে বেরিয়ে গেছে। যেমন তুমি কোরআন শরীফে পড়েছ, এ সাতটি দরজা দিয়ে সাত ধরনের পাপিষ্ঠদেরকে প্রবেশ করানো হবে।"

সালেহ এগুলো সবিস্তারে আমাকে বলে যাচ্ছিল। আমি অনুমান করলাম, মাঠের নিম্নাঞ্চলের দিকে একটি রাস্তা নেমে যাচ্ছিল। আমরা ওই রাস্তায় গেলাম না। বরং এর পার্শ্ব ঘেঁষে যে উঁচু জমিন ছিল আমরা তার ওপর দিয়ে হাঁটছিলাম। খানিক পরেই রাস্তাটি শেষ হয়ে গেল এবং এরপর বিশাল পরিখা শুরু হয়ে গেল। ওপরে থেকেই আমরা নিচের দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। ওই রাস্তায় জায়গায় জায়গায় ফেরেশতা মোতায়েন ছিল, যারা পাপিষ্ঠদেরকে মারতে মারতে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

একটু সামনে গিয়ে এ সংকীর্ণ রাস্তা বা পরিখার ওপর স্তুপ পড়ে যেতে লাগলো। এখানে গাদাগাদি করা ভীড় জমে যাচ্ছিল। বিতিকিচ্ছি আর বিদঘুটে অবয়বের নারী-পুরুষ এখানে ঠাসাঠাসি করে পড়ে ছিল। এরা ওই সমস্ত জালেম, ফাসেক ও পাপিষ্ঠ লোক যাদের শেষ পরিণামের ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে তাদেরকে জানোয়ারদের মতো এক জায়গায় গাদাগাদি করে স্তুপ দেওয়া হয়েছিল।

থেমে থেমে জাহান্নামের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠছিল এবং স্ববেগে আকাশের দিকে ধেয়ে যাচ্ছিল। এর প্রভাবে এখানকার আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করছিল। আর অগ্নি প্রজ্বলনের ভীতিপ্রদ আওয়াজ পাপিষ্ঠদের হৃদয়ে তীব্র ভয়ের সঞ্চার করছিল। কখনো কখনো সুবিশাল প্রাসাদের ন্যায় বড় কোনো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

ওই পরিখায় গিয়ে পড়তো, আর তুমুল হুলস্থুল বেঁধে যেত। মানুষ আগুনের এ গোলা থেকে বাঁচার জন্যে একজন আরেক জনকে পায়ে দলে লাফিয়ে লাফিয়ে পালাতো। এমনটা বেশি তখন হতো যখন বড় কোনো পাপিষ্ঠকে ওই দলটির দিকে নিয়ে যাওয়া হতো। কারণ, আগুনের এ গোলা তাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য আসতো। ফলে ওই লোকদের কষ্ট ও যন্ত্রণা আরো ঢের বেড়ে যেত।

সালেহ একদিকে ইশারা করে আমাকে বললো– 'ওদিকে তাকাও।'

আমি ওদিকে তাকাতেই সেখানকার সমস্ত আওয়াজ পরিষ্কার আমার কানে আসতে লাগলো। সেখানে কিছু লিডার এবং তাদের অনুসারীরা পরস্পরে ঝগড়া করছিল। অনুসারীরা তাদের নেতাদেরকে বলছিল, আমরা তোমাদের কথায় হকের বিরোধিতা করেছিলাম, তোমরা বলতে আমাদের কথা মানো; যদি কোনো আযাব হয় তাহলে আমরাই বাঁচিয়ে দেব। আজ কি আমাদের আযাবের কোনো অংশ তোমরা সহ্য করতে পারবে? আর না হয় কমপক্ষে এখান থেকে বেরোবার কোনো রাস্তাই বলে দাও। তোমরা তো বড় মেধাবী এবং সকল সমস্যার সমাধানকারী ব্যক্তি ছিলে।

ওই নেতারা জবাব দিত– আমাদের যদি কোনো রাস্তা জানা থাকতো তবে তো প্রথমে আমরা নিজেরাই বাঁচতাম। তাছাড়া আমরা তো তোমাদেরকে বলিনি যে, আমরা যা বলেছি তা অবশ্যই মানো। আমরা তো জোর-জবরদস্তি করিনি আমাদের রাস্তায় চলার মধ্যে তোমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল। এখন আমাদের সবাইকে মিলেই এ আযাব ভোগ করতে হবে।

অনুসারীরা বলতো– হে আল্লাহ! আমাদের এ লিডাররা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও।

এতে ওই লিডাররা চটে গিয়ে বলতো– আমাদেরকে বদদুআ দিয়ে তোমাদের নিজেদের অবস্থা কি ভালো হয়ে যাবে? এ কথোপকথন শুনে সালেহ মন্তব্য করলো, তাদের প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ আযাব হবে। কারণ, যারা অনুসারী ছিল তারা পরবর্তীদের লিডার হয়ে গিয়েছিল এবং তাদেরকে একইভাবে পথভ্রষ্ট করেছিল। দেখো, তাদের অনুসারীরাও আসছে।

আমি দেখলাম বাস্তবেই সেখানে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেছে। কারণ, আরো কিছু লোক তাদের দিকে এসেছিল। তাদেরকে দেখে লিডাররা বললো, এ হতভাগাগুলিরও এখানে আসার দরকার ছিল? পূর্ব থেকেই জায়গার সংকুলান হচ্ছে না। আবার এ দুর্গন্ধময় লোকগুলোও চলে এসেছে। নতুন আগন্তুকরা এ তীর্যক উক্তি শুনে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে গেল। ফলে নতুন আরেক ঝগড়া শুরু

হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা মারামারিতে রূপ নিল। একজন আরেকজনকে ভালো-মন্দ বলতে বলতে এবং গালিগালাজ করতে করতে পরস্পরে তুমুল লড়াই বেঁধে গেল। লাথি, ঘুষি, ধাক্কাধাক্কি এবং চিৎকারের এ বদ্ধ পরিবেশে মানুষের কী অবস্থা হচ্ছিল তা আমি শুধু দেখে বা শুনে অনুমান করতে পারছিলাম না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ লোকগুলো নিজেদের দুনিয়ার জীবনের কথা স্মরণ করে নিশ্চিত কান্নাকাটি করছে, যেখানে তাদের কাছে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু জান্নাতের নেয়ামতরাজিকে ছেড়ে তারা নিজেদের জন্যে জাহান্নামের এ কষ্ট যাতনাকে পছন্দ করে নিয়েছে, মাত্র কয়েকদিনের মজা, আনন্দ-উল্লাস ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায়।

সালেহ আমাকে বললো–

'এখনো তো এ সকল লোক জাহান্নামে প্রবেশই করেনি। সেখানে তো এর থেকে অনেক বেশি আযাব হবে। গোলামী ও লাঞ্চনার আলামত হিসাবে তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে। পরিধানের জন্য থাকবে গন্ধক ও তারকুলের কাপড়, যা দূর থেকেই আগুনকে আকর্ষণ করবে। ওই আগুন তাদের চেহারা ও দেহকে ঝলসে দিবে। কষ্টে তারা ছটফট করতে থাকবে। কিন্তু তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে কেউ আসবে না। তাদের ঝলসে যাওয়া ত্বকের জায়গায় নতুন ত্বক জন্ম নেবে। এতে তাদের প্রচণ্ড রকম খোসপাঁচড়া হবে। আর চুলকাতে চুলকাতে নিজেই নিজেকে রক্তাক্ত করে ফেলবে। কিন্তু চুলকানি কমবে না।

যখনই তাদের খিদে পাবে তখনই তাদেরকে তিক্ত ও বিষাক্ত কাঁটাবিশিষ্ট যাক্কুম ফল প্রদান করা হবে। আর পান করার জন্যে দেওয়া হবে, নাপাক ও দুর্গন্ধময় পুঁজ, উত্তপ্ত পানি এবং গরম তেলের তলানী, যা পেটে গিয়ে আগুনের মতো সব পুড়িয়ে দিবে। আর পিপাসার অবস্থাও এমন হবে যে, মানুষ তীব্র পিপাসার্ত উটের মতো পান করতে বাধ্য হয়ে পড়বে। ওই পানি তাদের পেটের সকল নাড়িভুঁড়ি কেটে বাইরে বের করে দিবে।

জাহান্নামে ফেরেশতারা তাকে বড় বড় হাতুড়ি দিয়ে পেটাবে। এতে তাদের দেহ খুব বেশি ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়বে। ওই ক্ষত স্থানগুলো থেকে যে রক্ত ও পুঁজ বেরোবে তা অন্য পাপিষ্ঠদের পান করানো হবে। এরপর তাদেরকে শিকলে বেঁধে সংকীর্ণ কোনো জায়গায় ফেলে রাখা হবে। সেখানে সর্বদিক থেকে মৃত্যু ধেয়ে আসবে। কিন্তু তারা মরবে না। ওই সময়টায় তাদের জন্যে সবচে' বড় সুসংবাদ হবে মৃত্যু সংবাদ; কিন্তু সেখানে তো তাদের মৃত্যু হবে না। থেমে থেমে এ ধরনের অগণিত আযাব তারা ভোগ করতে থাকবে।'

বিস্তারিত এ আলোচনা শুনে আমি কেঁপে উঠলাম। সালেহ আরো বললো–

'জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পূর্বে এখানে উপরে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর হাঁটুর ওপর ভর করিয়ে জাহান্নামের আশপাশে বসিয়ে দেওয়া হবে। তাদের জন্যে সর্বপ্রথম আযাব হবে এই যে, তারা স্বচক্ষে সমস্ত আযাব অবলোকন করে নিবে। এরপর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের অন্ধকার ও সংকীর্ণ জায়গায় নিয়ে গিয়ে স্তুপ দেওয়া হবে এবং আমি পূর্বে আযাবের যে বর্ণনা দিলাম সেই আযাবের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যাবে।'

'তাহলে কি সমস্ত জাহান্নামীরাই এ পরিণতি ভোগ করবে?'

'না, এতো ভোগ করবে কেবল বড় বড় পাপিষ্ঠরা। অন্যদের সাথে মুয়ামালাটা একটু হালকা হবে। কিন্তু এ হালকা মুয়ামালাও অসহনীয় কষ্টকর আযাব হবে।' এরপর সে অন্য এক দিকে ইশারা করলো। সেখানে আমি কিছু কুৎসিত ও বিদঘুটে আকৃতির মানুষ দেখতে পেলাম। সালেহ এক এক করে বলতে লাগলো, তাদের কেউ কোনো রাসূলকে অস্বীকার করেছিল ও বিরোধিতা করেছিল। নমরুদ ও ফেরাউনকে আমি বিশেষভাবে দেখলাম। কারণ, এদের আলোচনা অনেক শুনেছি। তাদের সাথেই ছিল আবু জাহেল, আবু লাহাব এবং কুরাইশের অন্যান্য সর্দাররা। তাদের সবার অবস্থা এতই খারাপ ছিল, যা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়। যুগের দাপুটে সর্দাররাই এ মুহূর্তে তুচ্ছ একজন গোলামের চেয়েও শোচনীয় অবস্থায় ছিল। তাদের অপরাধ ছিল, সত্য তাদের সামনে পুরোপুরিভাবে উদ্ভাসিত হয়ে যাওয়ার পরও তারা তা কবুল করেনি। আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে এবং আল্লাহর সৃষ্টির ওপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে।

এই মুহূর্তে সালেহ আমাকে বড় অদ্ভুত এক জিনিস দেখালো। দেখলাম, তাদের সবার মাঝখানে দৈত্যের মতো বিশালাকার এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহ থেকে অগ্নিশিখা ঠিকরে পড়ছিল আর গোটা শরীর ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ। সে তাদের সবাইকে সম্বোধন করে বলছিল, দেখো আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সত্য ছিল, আর আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা ছিল মিথ্যা। আজ আমাকে গালিগালাজ করো না। আমি তোমাদের সকল আমল থেকে দায়িত্বমুক্ত। আমার কোনো দোষ নেই। তোমাদের ওপর আমার কোনো ক্ষমতা ছিল না। তোমরা যা করেছ নিজের ইচ্ছাতেই করেছ। তোমরা যদি আমার কথায় কান দিয়ে থাক তাতে আমার কী দোষ। তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না বরং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা করো। আজ না আমি তোমাদের জন্যে কিছু করতে পারব আর না তোমরা আমার জন্য।

এ কথাগুলো শুনে আমার অনুমান হয়ে গিয়েছিল, লোকটি কে? আমার অনুমানের সত্যায়নের জন্যে আমি সালেহের দিকে তাকাতেই সালেহ বললো–

'তুমি ঠিক বুঝেছ। এ ইবলিস শয়তান। আল্লাহর সবচে' বড় নাফরমান। আজ সবচে' বড় আযাবও সেই ভোগ করবে। কিন্তু বাকি লোকেরাও তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করবে।'

উপরে দাঁড়িয়ে আমি এ সমস্ত দৃশ্য দেখছিলাম। আর দিলে দিলে রব্বে কারীমের শুকরিয়া আদায় করছিলাম। যিনি আমাকে শয়তানের ধোঁকা ও অনিষ্টতা থেকে বাঁচিয়েছেন। আর না হয় অভিশপ্ত শয়তান তো কতবারই চেষ্টা করেছিল আমাকে গুমরাহ করার জন্য। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রহমতে আমাকে সব সময় আগলে রেখেছেন। আমি শয়তানের অনিষ্টতা থেকে সর্বদা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতাম। এ জন্যে আমার আল্লাহ আমার সম্মান বজায় রেখেছেন। কিন্তু যারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং শয়তানকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে তারাই কঠিন আযাবের সম্মুখীন হয়েছে।
ইতিমধ্যেই সালেহ আমার দিকে ফিরে বললো–
'আবদুল্লাহ! চলো তোমাকে ডাকা হচ্ছে।'
আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন?
'সে বললো, জমশেদকে এক্ষুনি হিসাব-নিকাশের জন্যে উপস্থিত করা হবে। তোমাকে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে ডাকা হচ্ছে।'
'আমার সাক্ষী?'
'হ্যাঁ, তোমার সাক্ষী।'
'আমার সাক্ষী তার পক্ষে হবে, না বিপক্ষে!?'

'দেখো, আল্লাহ যদি তাকে মাফ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তোমাকে এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন যার উত্তর তার পক্ষে যাবে। আর যদি তার গুনাহের কারণে তাকে পাকড়াও করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাহলে তিনি তোমাকে এমন কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করবেন যা তার বিপক্ষে চলে যাবে। অথবা হতে পারে তিনি অন্য কিছু করবেন। সুনিশ্চিত বিষয় কেবল তিনিই জানেন।'
আমার শান্ত অবস্থা আবারো অশান্ত হয়ে গেল। প্রকম্পিত হৃদয় এবং অস্থির পদক্ষেপে আমি সালেহের সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

শেষফল

জমশেদকে তখনো হিসাবের জন্য উপস্থিত করা হয়নি। দু'জন ফেরেশতা তাকে নিয়ে আরশের নিকটেই দাঁড়ানো ছিল। আর সে তার সিরিয়ালের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তার যন্ত্রণাক্লিষ্ট চেহারায় দুনিয়ার পঞ্চাশ-ষাট বছরের ধনাঢ্যতা বা আভিজাত্যের কোনো চিহ্নই ছিল না, কিন্তু হাশরের হাজার বছরের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার পুরো দাস্তান স্পষ্ট আকারে লিখা ছিল। তার কাছে যাওয়ার পূর্বে আমি আমার মনকে শক্ত বানানোর চেষ্টা করলাম। কাছাকাছি যেতেই তার পাশে থাকা ফেরেশতারা আমাকে সামনে যেতে বাধা দিল। কিন্তু সালেহের প্রচেষ্টায় তারা আমাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিল। জমশেদ আমাকে দেখে ফেলেছিল। সে নিজেই দৌড়ে এসে আমাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলো। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো–

'আব্বু আমি এত কেঁদেছি যে, এখন আর চোখ থেকে অশ্রু বেরোয় না।'

আমি তার পিঠ চাপড়ানো ছাড়া কিছুই বলতে পারলাম না। এরপর সে আস্তে আস্তে বললো–

'আব্বু আমি বোধহয় এতটা খারাপ ছিলাম না।'

'কিন্তু বেটা! তুমি তো চলতে খারাপ লোকদের সাথে। অসৎ লোকদের সঙ্গ দ্বারা কখনো ভালো কিছুর আশা করা যায় না। তুমি বিয়ে করেছিলে এমনই মেয়েকে যার একমাত্র গুণ ছিল সৌন্দর্য আর ধন-সম্পদ। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা কোনো গুণই না। তুমি আমাদের থেকে পৃথক হয়ে শ্বশুরের ব্যবসায় অংশীদার হয়ে গেলে, যার ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত জানতে যে, এতে হারামের সংমিশ্রণ আছে। কিন্তু বিবি-বাচ্চা ও অর্থ-কড়ির জন্যে তুমি হারাম কাজের সহযোগিতায় লিপ্ত থাকতে। এ জিনিসগুলোই তোমাকে এ অবস্থানে নিয়ে এসেছে।'

'আব্বু আপনি ঠিক বলছেন। কিন্তু আমি নেকীও তো করেছিলাম। কোনো সম্ভাবনা কি আছে?'

আমি চুপ রইলাম। এতেই সে আমার জবাব বুঝে ফেলল। হতাশ গলায় সে বললো–

'আমার ধারণা হয়ে গেছে আব্বু। আমার স্ত্রী-সন্তান এবং শ্বশুর-শাশুড়িকে জাহান্নামে যেতে দেখে আমার অনুমান হয়ে গেছে যে, আজ কারো কোনো ক্ষমতা নেই। সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার ওই রবের হাতে, যার আদেশ-নিষেধ আমি ভুলে থাকতাম। আজ যার আমল তাকে বাঁচাতে পারবে না তাকে দুনিয়ার

কোনো শক্তিই বাঁচাতে পারবে না। আমি হাজার বছর যাবৎ এ ময়দানে পেরেশান হয়ে ঘুরে ফিরছি। অগণিত মানুষকে আমি জাহান্নামে যেতে দেখেছি। এখন আমার মুক্তির কোনো আশা বাকি নেই। আমি আল্লাহর কাছে অনেক ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু আমি এও জানি, আজ ক্ষমা চাওয়াতে কোনো ফায়দা নেই। আব্বু! আল্লাহ হয়তো আমাকে ক্ষমা করবেন না। কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন। আপনি তো আমার পিতা, তাই না?'

এটুকু বলে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেছি আমার চক্ষু যেন অশ্রুসিক্ত না হয়। কিন্তু মনের অজান্তেই আমার চোখ অশ্রুপ্লাবিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই জমশেদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ফেরেশতারা তৎক্ষণাৎ তাকে আমার থেকে পৃথক করে আল্লাহর আদালতের সামনে পেশ করে দিল। সে হস্তদ্বয় বুকে বেঁধে অবনত মস্তকে সমগ্র জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর সামনে উপস্থিত হলো। এক ধরনের সুনসান নীরবতা বিরাজ করছিল। জমশেদ দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু তাকে কোনো প্রশ্ন করা হচ্ছিল না। আমার বুঝে আসছিল না, এ নীরবতার কারণ কী? খানিক বাদে কারণও প্রকাশ পেয়ে গেল। কিছু ফেরেশতার সাথে নাঈমা সেখানে এসে গেল। সালেহের ইঙ্গিতে আমি নাঈমার সাথে গিয়ে দাঁড়ালাম। নাঈমার চেহারায় অনেক জিজ্ঞাসা খেলা করছিল। সে আমাকে কিছু বলতে চাইছিল; কিন্তু আল্লাহর আদালতের ভীতি এতটাই তীব্র ছিল যে, তার আওয়াজ বেরুচ্ছিল না। খানিক পরে জমশেদকে প্রশ্ন করা হলো–

'আমাকে চেন, আমি কে?'

এ আওয়াজটিতে এত কোমলতা ছিল যে, আমি বুঝে ওঠতে পারছিলাম না– এটা কি কোনো প্রলয়ংকরী ঝড়ের অব্যবহৃত পূর্বের গুমোট পরিবেশ, না রব্বে কারীমের সহনশীলতার অভাবিত বহিঃপ্রকাশ।

'আপনি আমার রব। সকলের প্রতিপালক। আমার পিতা আমাকে এমন বলেছিলেন।'

তাকে দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করা হলো–

'তোমার পিতা কে?'

জমশেদ আমার দিকে তাকিয়ে বললো–

'এই তো দাঁড়িয়ে আছেন।'

তার এ কথার সাথে সাথে আমার হৃদয়টা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। আমার ধারণা হচ্ছিল, এবার জমশেদ ফেঁসে যাবে। কারণ, তাওহীদ ছাড়াও আরো অনেক বিষয়ে আমি তাকে নসীহত করেছিলাম। সেগুলোতে তার রেকর্ড ভালো ছিল না। এখন আমাকে এটাই জিজ্ঞেস করার ছিল যে, আমি কোন কোন বিষয়ে তাকে

নসীহত করেছিলাম। আর আমার এ সাক্ষীটাই তাকে পাকড়াও করার ছুতো হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। আল্লাহ তায়ালা আমাকে সাক্ষীর জন্যে ডাকেনই নি। তিনি জমশেদকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রশ্ন করলেন–

'এই মাত্র তুমি তোমার পিতাকে কী বলছিলে?' অর্থাৎ, আল্লাহ মিয়া হয়তো আমাকে ক্ষমা করবেন না। কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন। আপনি তো আমার পিতা, তাই না?'

খানিক পূর্বেও আশার যে ক্ষীণ আলোটি নিভু নিভু জ্বলছিল, এ প্রশ্নের সাথে সাথে তাও চট করে নিভে গেল। জমশেদও বুঝে ফেলেছিল যে, তার পাকড়াও শুরু হয়ে গেছে। ভয়ে তার চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো। তার হাত-পা কাঁপতে লাগলো। একথা তার চিন্তায়ও আসেনি যে, আল্লাহ তায়ালা অন্যদের হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তার কথা শুনছেন। শুধু শুনেছিলেন তাই না; বরং তার কথাগুলো আল্লাহকে নারাজ করার সকারণ হয়েছিল। সে বড় নিরুপায় হয়ে বললো–

'জী আমি একথা কলেছিলাম। কিন্তু আমার মতলব মোটেও তা ছিল না, যা আপনি বুঝেছেন।'

'আমি কী বুঝেছি তা তুমি কীভাবে জান?' জিজ্ঞেস করা হল, কিন্তু আওয়াজে এখনো সেই পূর্বের কোমলতাই বিদ্যমান ছিল।

'না না। আমার মোটেও জানা নেই আপনি কী বুঝেছেন? জমশেদ অপ্রস্তুত গলায় জবাব দিল। তাকে অতিরিক্ত কোনো প্রশ্ন করার পরিবর্তে নাঈমাকে জিজ্ঞেস করা হলো–

'আমার বান্দী! এ তো তোমার ছেলে। সে তোমার সাথে কীরূপ আচরণ করেছিল?' নাঈমা বললো–

'প্রভু! সে আমার সাথে অনেক উত্তম আচরণ করেছে। বার্ধক্য পর্যন্ত আমার খেদমত করেছে। মাল দ্বারা, নিজের হাত দ্বারা এবং অন্তর দ্বারা সে আমার অনেক দেখভাল করেছে। তার স্ত্রী সর্বদা তাকে বাধা দিত; কিন্তু সে আমার খেদমত থেকে কখনো বিরত থাকেনি। সে তার সম্পদ, তার জান নিঃসঙ্কোচে আমার জন্যে ওয়াকফ করে দিয়েছিল।'

জমশেদের জন্যে আর বেশি কিছু বলার ক্ষমতা নাঈমার ছিল না। কারণ, সে জানতো তাকে যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে তারচে অতিরিক্ত একটি শব্দ বললেও তার নিজেকেই পাকড়াও হতে হবে। এজন্যে বাধ্য হয়েই সে এতটুকু বলে থেমে গেল।

বিশ্বপ্রতিপালক ফেরেশতাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'এ মহিলা কি ঠিক বলছে?'

ফেরেশতা আমলনামা দেখে বললো–

'সে একদম সত্য বলেছে।'

এরপর যা হলো তা আমার মনের অস্থিরতাকে বাড়িয়ে তুললো। নির্দেশ এলো, তার আমলগুলো মিযানে (পাল্লায়) রাখো। প্রথমে রাখা হলো গুনাহ, এতে বাম দিকের পাল্লা ভারী হতে থাকলো। এরপর নেকী রাখা হলো, আমাদের সবার চেহারা ছিল বিমর্ষ। এক এক করে নেকীগুলো রাখা হলো। কিন্তু গুনাহের তুলনায় এগুলো এতটা হালকা ছিল যে, বাম দিকের পাল্লা পূর্বের মতোই ভারী রয়ে গেল। শেষে দুটি মাত্র নেকী বাকি ছিল। বাহ্যত ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল। হতাশা ও অসহায়ত্বের মিশ্র অনুভূতিতে নাঈমা তার চোখ বন্ধ করে ফেলল। জমশেদ মাথায় হাত দিয়ে নিরুপায় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

যখন থেকে আমি হাশরের মাঠে এসেছিলাম তখন থেকে একটি বারের জন্যেও আরশের দিকে তাকানোর হিম্মত করিনি। কিন্তু এবার প্রথম মনের অজান্তেই আমার চোখ মহাপরাক্রমশালী রবের দিকে চলে গেল ... এক মুহূর্তেরও কম সময়ের জন্যে। ওই মুহূর্তে আমার হৃদয় থেকে ঠিক সেই শব্দটিই এলো যা দুনিয়ায় প্রতিটি অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তে বেরিয়ে আসতো।

শব্দটি ছিল لا اله الا الله এরপর আমার দৃষ্টি ও মাথা উভয়ই অবনত হয়ে গেল।

ফেরেশতা প্রথম নেকীটি ওঠালো। এটা ছিল নাঈমার সাথে কৃত উত্তম আচরণ। আশ্চর্যজনকভাবে ডান পাল্লা নিচে নামতে শুরু করলো। আমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নাঈমাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললাম–

'নাঈমা চোখ খোলো।'

আমার আওয়াজ জমশেদও শুনে ফেলেছে। সে মাথা তুলে দেখল এবং আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে গেল। ডান পাল্লার অধোগতির সাথে সাথে আবারো সে আশায় বুক বাঁধলো। কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে ডান পাল্লা থেমে গেল। বাম পাল্লা এখনো পূর্বের মতোই ভারী ছিল। আমার হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলা আশার ক্ষীণ প্রদীপটিও নিভে যেতে লাগলো। ফেরেশতা সর্বশেষ নেকীটি উঠিয়ে উচ্চ আওয়াজে বললো– এটা তাওহীদের ওপর ঈমান। এটা রাখতেই অবস্থা বিলকুল পাল্টে গেল। ডান পাল্লা নিচে চলে এলো। নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে গেল।

মনের অজান্তে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো– الله اكبر ولله الحمد আল্লাহ সবচে' বড় আর তাবৎ প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে।

এর সাথে সাথে ক্ষীণ কণ্ঠে একটি আওয়াজ এলো–

'জমশেদ! তোমার পিতা তোমাকে আমার ব্যাপারে এত্ত বলেছিল যে, আমি মা-বাবার চেয়েও সত্তর হাজার গুণ বেশি মুহাব্বত করি স্বীয় বান্দাদেরকে। কিন্তু তুমি আমার কদর করোনি। এজন্যই হাশরের মাঠে তোমাকে এত কঠিন কষ্ট-যাতনা সইতে হয়েছে। আমার ইনসাফ বড় নিঃস্বার্থ। আর আমার দয়া ও রহমত সব জিনিসের ওপর প্রাধান্য পায়।'

ফেরেশতা নাজাতের ফয়সালা লিখে আমলনামা তার ডান হাতে দিয়ে দিল।

আনন্দের আতিশয্যে জমশেদের মুখ থেকে একটি চিৎকার বেরিয়ে এলো। সে জান্নাতের অনুমতিপত্র পেয়ে গিয়েছিল। হাজার বছরের দীর্ঘ ও কঠিন এ দিন থেকে সে মুক্তি পেয়ে গেল। বরং সর্ব প্রকার কষ্ট-যাতনা থেকেই সে পরিত্রাণ পেয়ে গিয়েছিল। সে দৌড়ে এসে আমাদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরলো। অব্যক্ত আনন্দ আর খুশিতে নাঈমা তীব্রভাবে পুলকিত হচ্ছিল। আর আমি আমার অস্তিত্বের প্রতিটি স্পন্দনে ওই রব্বে কারীমের হামদ ও ছানা পাঠ করছিলাম যিনি স্বীয় অনুগ্রহে জমশেদকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

. . . . . .

আমাদের গোটা পরিবার হাউযে কাওছারের ভি আই পি লাউঞ্জে একত্রিত হলো। আমার তিন মেয়ে লায়লা, আরিফা এবং আলিয়া ও দুই ছেলে আনোয়ার এবং জমশেদ তাদের মা নাঈমার সাথে অবস্থান করছিল, জমশেদের আগমনে আমাদের পরিবার পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এজন্য অবর্ণনীয় আনন্দ উল্লাসে ভাসছিল সবাই। এভাবে গোটা পরিবারকে এক সাথে দেখে এক পাশে বসে আমি সালেহকে বললাম– 'নিজেদের কোনো একজনও যদি বাকি থাকে তাহলে জান্নাতে কি কোনো আনন্দ আছে?'

জমশেদ আমার কথার জবাব দিল, যার বিবি-বাচ্চা, শ্বশুর-শাশুড়ি সবার ব্যাপারে জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল। 'হ্যাঁ আব্বু! এ বিষয়টি আমার থেকে বেশি কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না, আপনি বড় ভাগ্যবান।'

'তিনি সৌভাগ্যবান এজন্যে যে, পরিবারের সদস্যদের তরবিয়ত করাকে তিনি নিজের প্রধান কাজ বানিয়ে নিয়েছিলেন। আর তুমিই ছিলে একমাত্র হতভাগা। অন্যথায় বাকিদেরকে দেখো, সবার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করা হয়েছে।' এবার নাঈমা বললো।

'আম্মী আপনি ঠিক বলছেন। কিন্তু দুনিয়াতে আমি ভাবতাম, আব্বুর সুপারিশই আমাকে ক্ষমা করিয়ে দিবে। মূলত আমার শ্বশুরের একজন পীর সাহেব ছিলেন, যার ওপর শ্বশুরের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি সর্বদা আমার শ্বশুরকে বলতেন,

সর্বক্ষেত্রে আমাকে অনুসরণ করতে থাকো, কেয়ামতের দিন আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়ে দিব। তখন থেকেই আমার এ ধারণা সৃষ্টি হলো যে, আমার আব্বুর মতো ভালো মানুষ তো কেউ হতে পারে না। তার সুপারিশেই আমার কাজ হয়ে যাবে।'

তার কথা শুনে আমি বললাম–

'বেটা তুমি তো সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিলে। দেখো, তোমার শ্বশুরকে তার পীর সাহেব বাঁচাতে পারেনি। বাস্তবতা হলো এই যে, সুপারিশ বা শাফায়াতকে মুক্তির উসিলা মনে করার কথা না আমাদের নবী বলেছেন, আর না কোরআন মাজীদের কোথাও বর্ণিত আছে যে, তোমরা শাফায়াতকে মুক্তির উসিলা মনে করো। পরকালে মুক্তি কীভাবে মিলবে তা বর্ণনা করার জন্যেই তো কোরআন নাযিল হয়েছিল। কোরআন একথা বার বার স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যে, কেয়ামতের দিন মুক্তির একমাত্র মাপকাঠি হবে ঈমান ও আমলে সালেহ (নেক আমল)। কোরআন অবতরণের সময় সমগ্র সৃষ্টিজগৎ এ গোমরাহীর শিকার ছিল যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সুপারিশ তাদেরকে মাফ করিয়ে দিবে। আর মুশরিকরা মনে করতো তাদের প্রতিমাগুলো আল্লাহর সামনে তাদের জন্যে সুপারিশ করবে। এজন্যে কোরআন শরীফ বার বার একথা সুস্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে যে, শাফায়াত মুক্তির চূড়ান্ত কোনো উসিলা নয়। মানুষ তাই লাভ করবে যা সে কামাই করেছে।'

'কিন্তু কোরআনে তো শাফায়াতের কথা বলা হয়েছে এবং হাদীসেও এর আলোচনা এসেছে। জমশেদ প্রশ্ন করলো। আমি তার সামনে একটি প্রশ্ন রেখে বললাম–

'এটা বলো, পুরো কোরআন বা কোনো হাদীসে কি একথা বলা হয়েছে যে, তোমরা শাফায়াতকে নাজাতের উসিলা মনে করে এর ওপর ভরসা করে বসে থাক, না বলা হয়েছে, তোমরা এর জন্যে দুআ কর।'

'না এমন তো কোথাও বলা হয়নি।' জমশেদের জায়গায় আনোয়ার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে কথাটি বললো।

তার কথায় দ্বিমত পোষণ করে জমশেদ বললো–

'না ভাই আমরা প্রত্যেক আযানের পর শাফায়াতের দুআ করতাম।'

আমি জমশেদের কথার জবাব দিলাম–

'এটা তো রাসূলের কথার ওপর মানুষেরা নিজেরাই বাড়িয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এটুকু বলেছিলেন যে, আমার জন্যে মাকামে মাহমূদের (প্রশংসনীয় অবস্থান) দুআ করো তাহলে তোমাদের জন্যে আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে। এটা বলেননি যে, শাফায়াতের জন্যেও দুআ করো বা এর ওপর ভরসা করে নেক আমল ছেড়ে দাও ও মনের হরষে গুনাহ করতে থাক।

আমাকে সম্বোধন করে সালেহ বললো–

'আবদুল্লাহ থামো। শাফায়াতের ব্যাপারটা তাকে আমি বিস্তারিত বুঝাচ্ছি। দেখো, নাজাতের মূল মাপকাঠি হলো ঈমান এবং নেক আমল। এছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। আজ যারা নাজাত পাচ্ছে তারা কারো শাফায়াতে পাচ্ছে না। বরং আল্লাহ তায়ালার ইলম, কুদরত, দয়া ও অনুগ্রহে পাচ্ছে। কোরআনে এ কথাটি এভাবে বিবৃত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা কেবল শিরককেই মাফ করবেন না। তা ছাড়া যে গুনাহকে তিনি চাইবেন বা যে ব্যক্তিকে চাইবেন ক্ষমা করে দিবেন। ছোটখাটো গুনাহগুলো তো আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার কষ্ট-পেরেশানি এবং নেক আমলগুলোর উসিলায় ক্ষমা করে দিতেন। কিন্তু যে সকল লোক গুনাহের রাস্তায় বুঁদ হয়ে পড়ে থেকেছে এবং তওবা করেনি তারা তো ওই রাস্তায় চলার ফল সুনিশ্চিত ভোগ করছে। এতৎসত্ত্বেও কোনো মুমিন বান্দা যখন নিজের গুনাহের যথেষ্ট পরিমাণ শাস্তি ভোগ করে নেয়.... সালেহ এপর্যন্ত বলতেই জমশেদ ফোঁড়ন কাটলো– 'যেমন আমি ভোগ করেছি বা হাশরের মাঠের শুরুর দিকে লায়লা যেমন অপদস্ত হয়েছিল।'

'একদম ....'

সালেহ তাকে সমর্থন করে আবারো নিজের কথায় ফিরে এলো– 'আমি বলছিলাম, মুমিন বান্দা যখন লাঞ্ছনা ভোগ ও হাশরের মাঠের ভয়াবহতা সহ্য করার দ্বারা আল্লাহর ইনসাফের আদালতে নাজাতের উপযুক্ত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা কিছু নেক বান্দার সাক্ষীকে– যা মূলত তার নেক আমলগুলোর ব্যাপারেই হয়ে থাকে– তার নাজাতের বাহানা বা উসিলা বানিয়ে দেন। যেমন তোমার মা-বাবার সাক্ষী তোমার নাজাতের উসিলা বনে গেছে। অথবা লায়লা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই সাক্ষীর বদৌলতে মুক্তি পেয়ে গেছে যা তিনি শুরুতেই প্রদান করেছিলেন। কিন্তু দেখো, এক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত ঈমান ও ব্যক্তিগত আমলের প্রয়োজন পড়ে। আর শাস্তি তো সর্বাবস্থায় ভোগ করতেই হয়। তাহলে এবার বলো, শাস্তি ভোগ করে ক্ষমা পাওয়ার রাস্তা উত্তম নাকি শুরুতেই তওবা এবং নেক আমলের রাস্তা অবলম্বন করে কোনোরূপ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ছাড়াই মুক্তি পেয়ে যাওয়াটা উত্তম?'

'এটা তো স্পষ্ট যে, প্রথম থেকে তওবা ও নেক আমলের রাস্তাটাই উত্তম। কিন্তু একটু খোলাসা করে বলুন তো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতের বাস্তবতাটা তাহলে কী?' এবার আরিফা জবাব দিল, সেই সাথে সালেহকে একটি প্রশ্নও করলো।

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতের অর্থ যদি এ হতো যে, মানুষের কাছে কোনো নেক আমল না থাকলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম শাফায়াত করে তাদেরকে মাফ করিয়ে দিবেন তাহলে কোরআনের কোথাও নেক আমলের কথা বলা হতো না; বরং কোরআন শরীফ আল্লাহ তায়ালা রাসূলের ভাষ্যে বলে দিতেন, হে মানবকুল! তোমরা আমার ওপর শুধু ঈমান নিয়ে আস, তাহলেই পরকালে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দেব।'

'এ তো ছিল ঈসায়ীদের আক্বীদা। আর এর পরিণামও আজ তারা ভোগ করে নিয়েছে।' নাঈমা বিদ্রুপ গলায় বললো। তার সমর্থনে সালেহ বললো–

'আমরা জানি, কোরআনে এমন কোনো কথা বর্ণিত হয়নি। এর উল্টো পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে– ঈমান আনো, নেক আমল করো এবং সোজা জান্নাতে চলে যাও। আর বিভিন্ন হাদীসে শাফায়াতের ব্যাপারে যা কিছু এসেছে সেগুলো যদি কোরআনের আলোকে দেখা হতো– যা পরকালীন বাস্তবতা বর্ণনার মূল ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ, তাহলে বিষয়টি একদম পরিষ্কার হয়ে যেত।'

'ওই বিষয়টি কী ?' জমশেদ জিজ্ঞেস করলো।

'ওই বিষয়টি হলো, আজ গুনাহগাররা নিজেদের আমলের যথাযথ শাস্তি ভোগ করে ফেলেছে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরখাস্তের বিনিময়ে তাদের মুক্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এটা প্রথমবার তখন হয়েছে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার কাছে মানবজাতির হিসাব-নিকাশ শুরু করার দরখাস্ত করেছিলেন, যার দ্বারা মানুষ প্রতীক্ষার নিদারুণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। দ্বিতীয়বার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য নবী-রাসূলগণ তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়কে দেওয়া তালীম-তরবিয়তের সাক্ষী দিয়েছেন। এ সাক্ষী দ্বারা ওই সকল লোক নাজাত পেয়ে গেছে যাদের আমল সামগ্রিকভাবে ওই তালীম-তরবিয়তের অনুকূল ছিল।'

'যেমন আমি' লায়লা বললো।

'হ্যাঁ, যেমন তুমি। আর এখন তৃতীয়বার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সময় দরখাস্ত করবেন, যখন কিছু মানুষের হিসাব-নিকাশ বিলম্বিত করে দেওয়া হবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের হিসাব-নিকাশ টানা হবে না। তারা বরং নিজেদের গুনাহের বদলায় হাশরের মাঠে লাঞ্ছিত হতে থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে বার বার দরখাস্ত পেশ করবেন। অবশেষে যখন আল্লাহ তায়ালার ইলম ও প্রজ্ঞার আলোকে তাদের ফয়সালা যথার্থ মনে হবে তখন তাদের ব্যাপারে কথা বলার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনুমতি প্রদান করা হবে। এরপর তাঁর দরখাস্তের উসিলায় তাদের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হবে। তখন গিয়ে তাদের নাজাতের কোনো সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। আর তাও হবে সর্বশেষে যখন ওই সকল লোক তাদের সমস্ত

অপকর্মের নিদারুণ শাস্তি ভোগ করে নিবে এবং তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস ও নিজেদের সৎকর্মগুলোর ভিত্তিতে মুক্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে।'

'আমার একটি প্রশ্ন।' সালেহকে সম্বোধন করে আনোয়ার বললো।

'তা এই যে, সকল মানুষ শাস্তি ভোগের পরই যদি ক্ষমার যোগ্য হয়ে থাকে। তাহলে এখানে আল্লাহর রহমত কোত্থেকে এলো। এতো শুধু ইনসাফ হচ্ছে।'

'অনেক উত্তম প্রশ্ন।' আনোয়ারকে সাবাশ দিয়ে সালেহ জবাব দিল–

'দেখো, তিনি যদি শুধু ইনসাফ করতেন তাহলে এ সকল লোকের মূল শাস্তি ছিল জাহান্নামের আযাব, যা হাশরের মাঠের ভয়াবহতা থেকে হাজার কোটি গুণ বেশি কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক। ইনসাফের দাবি অনুযায়ী এ সকল লোকের জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ এই যে, তিনি হাশরের ভয়াবহতাকে জাহান্নামের আযাবের বিনিময় বানিয়ে দিয়েছেন। এভাবে একই সময়ে আল্লাহর ইনসাফ ও রহমত উভয় গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।'

সালেহ কথা শেষ করতেই জমশেদ বললো–

'তাহলে এটাই কি আসল কথা। আমি তো এ ভুলের মাঝে ছিলাম যে, শাফায়াতের অর্থ হলো আমরা যত খুশি গুনাহ করে নিব। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নেক বান্দাদের সুপারিশে আমাদের নাজাত মিলে যাবে।'

এ ধারণা আল্লাহ তায়ালার ইনসাফ গুণটির বিপরীত। কোরআন শরীফকে না বুঝে পড়ার কারণেই মানুষের মধ্যে এ ভুল ধারণার জন্ম হয়েছিল। নাজাত তো পাওয়া যায় কেবল ঈমান ও নেক আমল দ্বারা। আর ক্ষমা লাভ হয় আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা। আল্লাহ শুধু এটুকু করেন যে, কোনো নেক বান্দার সাক্ষী বা দরখাস্তকে ক্ষমার ঘোষণা ও উসিলা বানিয়ে দেন। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় ও নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে ইজ্জত দান করে থাকেন। নাজাত তো হয় তার নিয়ম মাফিক। আর এখন তোমার থেকে ভালো আর কে জানে যে, মানুষ জাহান্নামে যদি নাও যায় তবুও নিজের গুনাহের কত নিদারুণ শাস্তি হাশরের মাঠে ভোগ করতে হয়।'

'জাহান্নামে যাওয়ার পরও কি মুক্তির সম্ভাবনা আছে?' আলিয়া প্রশ্নটি করতেই এক পিনপতন নীরবতা পরিবেশটাকে ঢেকে নিল। খানিক বাদে এ নীরবতার চাদরকে ভেদ করে সালেহ বললো– 'কোরআন বলে না যে, আল্লাহ তায়ালা একমাত্র শিরককে ক্ষমা করবেন না। তাছাড়া যে গুনাহ ইচ্ছা বা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিতে পারেন।'

'মানে?' আনোয়ার জিজ্ঞেস করলো।

'মানে এই যে, কিছু গুনাহ জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত লোকের মাঝে বিন্দুমাত্র ঈমানও বাকি ছিল তারা এ গুনাহগুলো সত্ত্বেও শেষ পরিণামে ক্ষমা পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষমা কে পাবে, কখন পাবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর ভাই আমার! জাহান্নাম তো এক মুহূর্ত থাকার জায়গা নয়। যে সমস্ত লোক সেখান থেকে বেরোবে না-জানি তারা কত কত শতাব্দী অতিবাহিত করে নিজের শাস্তি ভোগ করে পরিত্রাণ পাবে। সেই সময়টা এত বেশি হবে যে, শত শত কোটি বছরও তার তুলনায় কয়েক মুহূর্তের সমান মনে হবে। সে ব্যাপারে তো কোনো চিন্তা ভাবনা না করাই ভালো।'

'ও আমার আল্লাহ!' আনোয়ার প্রকম্পিত হয়ে বললো।

'জাহান্নাম তো দূরের কথা, হাশরের মাঠে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকাই অসহনীয় আযাব।' অভিজ্ঞতার আলোকে জমশেদ বললো। লায়লা আরেকটু বাড়িয়ে বললো–

'এ গুনাহ কত বড় মুসিবত হয়ে সামনে আসে তা যদি আমরা দুনিয়াতেই বুঝে নিতাম।' আলোচনার সমাপ্তি টেনে সালেহ বললো–

'দুটি কারণে মানুষ বড় দুর্ভাগা। একটি হলো, হাশরের দিনের মৌলিক ধারণা ছিল হিসাব-নিকাশ। অর্থাৎ, সেদিন মানুষের ভালো-মন্দ কাজের হিসাব হবে, এবং সে অনুপাতেই তাদের জান্নাত জাহান্নামের ফয়সালা হবে। কিন্তু এ ধারণাটি পাল্টিয়ে তারা এমনটি বুঝে বসে আছে যে, হাশরের দিন মানেই শাফায়াত। শাফায়াতের মাধ্যমে সেদিনকার সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কারণটি হলো, মানুষের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা। মানবজাতির চাওয়া-পাওয়ার সবটাই ছিলেন তিনি। কিন্তু মানুষ আজ এ স্থানটায় গাইরুল্লাহকে অধিষ্ঠিত করেছে।'

সালেহকে সমর্থন করে আমি বললাম–

'কত সত্য কথা বলেছ তুমি সালেহ। হায়! মানুষ যদি এ বিষয়টি দুনিয়াতেই জেনে নিত।'

এরপর আমি আমার সন্তানদেরকে সম্বোধন করে বললাম–

'আমার সন্তানেরা ! দুনিয়ার জীবন আজ শুধুই ইতিহাস। এখন তোমাদের ঠিকানা চিরস্থায়ী জান্নাত। প্রশান্তি, স্বস্তি, পরিতৃপ্তি, ভালোবাসা, দয়া, স্বাদ ও আমোদ-প্রমোদ এখন থেকে তোমাদের নিত্য সঙ্গী। তোমরা দেখেছ, আমাদের রব কত দয়ালু মেহেরবান। আসো আমরা সবাই মিলে আমাদের রব্বে কারীমের প্রশংসা করি এবং সোচ্চার কণ্ঠে বলি–

الحمد لله رب العلمين

আমরা সবাই মিলে শ্লোগানের মতো উঁচু আওয়াজে বলে উঠলাম–

الحمد لله رب العلمين

'আবদুল্লাহ! হাশরের মাঠের মুয়ামালাগুলো ক্রমশ সমাপ্তির পথে এগুচ্ছে। হাশরের ব্যাপারগুলো দেখার কোনো অভিলাষ যদি তোমার এখনো বাকি থাকে তাহলে আবারো সেখানে চলো।' কিছুক্ষণ পর সালেহ আমাকে সম্বোধন করে বললো।

'এ মুহূর্তে হিসাব-নিকাশ কোন পর্যন্ত পৌঁছেছে?' নাঈমা জিজ্ঞেস করলো।

সবচে' অধিক সংখ্যক মানুষ শেষ যমানায় সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের সবার হিসাব হয়ে গেছে। মুসলমান, ঈসায়ী এবং তাদের সমকালীনদের সাধারণ হিসাব সম্পন্ন হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে ইহুদিদের হিসাব-নিকাশ চলছে। এভাবে বুঝে নাও যে, অধিকাংশ মানুষের তাকদীরের ফয়সালা হয়ে গেছে। অন্যান্য উম্মতে মানুষের সংখ্যা খুবই কম ছিল। এজন্য এখন আর খুব বেশি সময় লাগবে না।'

'আমার উস্তাদ ফারহান আহমদের কী হয়েছে তুমি কি কিছু জানো?'

'না তার সাথে আমার সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। এজন্য আমি তার ব্যাপারে কিছু জানতে পারি না। আমি এটুকু জানি যে, তিনি হাউযের কাছে নেই। বাকি আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, তার কী হবে। আচ্ছা, এবার তোমরা ওঠো।'

'ঠিক আছে। আমরা যাচ্ছি।' আসন ছেড়ে ওঠতে ওঠতে আমি বললাম।

নাঈমা এবং ছেলে-মেয়েরাও নিজ নিজ আসন ছেড়ে ওঠে গেল। ওঠতে ওঠতে নাঈমা বললো–

'আমি এ ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে তাদের পরিবারের কাছে যাচ্ছি। এখানে ভি আই পি লাউঞ্জে তো কেবল আপনার ছেলে-মেয়েরা আসতে পেরেছে। তাদের বাচ্চারা তো নিচে অপেক্ষা করছে। আমি তাদের কাছেই যাচ্ছি। আর সেখানে আমি জমশেদের জন্যে নতুন কোনো বধূও খুঁজে নেব।'

এ শেষ কথাটিতে জমশেদ ছাড়া আমরা সবাই হাসিতে ফেটে পড়লাম। সে বুঝে উঠতে পারছিল না, নতুন দুলহানের কথা শুনে হাসবে নাকি পূর্বের স্ত্রীর ধ্বংসের কারণে আফসোস ও অনুশোচনা করবে।

বনী ইসরাইল এবং মুসলমান

আমরা হাশর মাঠের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে নুহুর এবং শায়েস্তা'কে দেখলাম। তাদেরকে দেখেই আমার মাথায় দুষ্টুমি চেপে বসলো। সালেহকে বললাম–
"চলো না, এদেরকে একটু বিরক্ত করে যাই!"
তারা হাঁটছিল ঝিলের দিকে। কাছাকাছি চলে যাওয়ার পরও তারা আমাদের উপস্থিতি আঁচ করতে পারল না। আমি শায়েস্তার দিকে আগে বেড়ে চিৎকার দিয়ে বললাম–
"এই মেয়ে! চলো। তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। একজন পর পুরুষের সঙ্গে অবাধ মাখামাখির অপরাধে তুমি গ্রেফতার।"

শায়েস্তা আমার বিকট শব্দ আর কঠোর বাচনভঙ্গিমায় একদম ঘাবড়ে গেল। তবে নুহুর ছিল নির্বিকার নির্লিপ্ত। আমার কথা তার মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। শান্তভাবে সে আমাকে এক নজর দেখে নিয়ে বললো–
"তাহলে আমাকেও গ্রেফতার করে নিন। আমিও তো সমান অপরাধী।" বলেই সে হস্তদ্বয় আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। মুচকি হেসে বললো–
"সমস্যা তো হলো, এখানে না বন্দিশালা আছে, আর না শাস্তি দেওয়ার মতো কোনো জায়গা আছে।"
"বন্দিশালা নেই ঠিক। তবে শাস্তির ব্যবস্থা অবশ্যই হতে পারে। তা হলো, এ অবলা মেয়ের সাথেই আপনার বিবাহ করিয়ে দেওয়া হবে। জান্নাতে সারাটা জীবন একজন নারীকে নিয়ে কাটিয়ে দেওয়াও অনেক বড় শাস্তি।"

উদ্দাম হাসিতে নুহুর ফেটে পড়লো। শায়েস্তা আমার অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণে প্রথম দিকে ঘাবড়ে গেলেও এখন সে স্বাভাবিক। হাসতে হাসতে বললো– "অন্য সব বিষয়ে তো আপনাদেরকে 'একত্ববাদী'ই মনে হয়। কিন্তু এ বিষয়টায় আপনাদের চিন্তা-চেতনা এতটা অংশীবাদ আশ্রিত বা শিরকসুলভ কেন?"
নুহুর তার চেহারায় গাম্ভীর্যের কৃত্রিম রেখা টেনে বললো–
"আপনি জানেন আব্দুল্লাহ! মুশরিকদের পরিণতি হলো জাহান্নাম। এজন্যে ভবিষ্যতে কখনো শায়েস্তা'র সামনে এমন শিরকসুলভ কথা বলবেন না। এর অন্যথা হলে তা আপনার জন্যে মঙ্গলজনক হবে না।"
সালেহ এবার আলোচনায় যোগ দিয়ে বললো–

"শায়েস্তাজী! আপনি টেনশন নেবেন না। কার্যত তিনি নিজেও 'একত্ববাদী'; তার বেগম এক জন-ই।"
নুহুর এতে মুচকি হেসে বললো–
"এটা তার কোনো কৃতিত্ব নয়। এটা তার যুগের একপ্রকার বাধ্যবাধকতার ফলশ্রুতি। আচ্ছা, থাক এসব কথা। আগে বলুন তার বেগম সাহেবা আছেন কোথায়?"
তখনো আমি স্বাভাবিক হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তার দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম–
"অন্যদের মতো বেগম নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবসর তো আমাদের নেই।"
"অন্যদের অবসরে হিংসাত্মক দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ তো অবশ্যই আছে।" একই ভঙ্গিতে নুহুর মুখের ওপর উত্তরটা দিয়ে দিল।
"আমরা ভালো মানুষ। কারো প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া আমাদের কাজ নয়।"
"আপনি কিন্তু আমার প্রতি হিংসাত্মক দৃষ্টি দিয়েছেন।" এরপর ব্যাপারটা আরেকটু স্পষ্ট করে বললো–
"আমার নবী ইয়ারমিয়া'কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে ডাকা হয়েছে। আমি যেহেতু তার ঘনিষ্ঠ একজন সহচর ছিলাম, তাই সেখানে আমার উপস্থিত থাকাটা আবশ্যক।" শেষ কথাটি বলতেই তার চেহারায় গাম্ভীর্য ফুটে ওঠল।
"আপনি তাহলে চলে যাচ্ছেন?" শায়েস্তা প্রশ্ন করলো।
"হ্যাঁ, তুমি পরিবারের লোকদের কাছে চলে যাও। আমি সেখানে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ব্যস্ত থাকব।"
এরপর সে তাকে নিতে আসা দু'জন ফেরেশতার সাথে রওয়ানা হয়ে গেল।
"নবীগণ তো তাদের উম্মতদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েই ফেলেছেন। ইয়ারমিয়া' আলাইহিস সালাম এখন কীসের সাক্ষ্য দেবেন?" সালেহের দিকে ফিরে আমি জানতে চাইলাম।
"যে হতভাগারা তার সাথে সীমালঙ্ঘন করেছিল, তাদেরকেও নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছতে হবে। এজন্যই তার সাক্ষ্য গ্রহণ।" সালেহ উত্তর দিল। এরপর আমরা আবারো হাশরের মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

.....

আরশের সামনে ইয়ারমিয়া' আলাইহিস সালামের যুগের সকল ইহুদি উপস্থিত ছিল। এ সময়টা ইহুদিদের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইহুদি বা বনী ইসরাইল হলো, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পৌত্র ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশোদ্ভূত। 'ইসরাইল' হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উপাধি। তার সন্তান ছিল বারো জন। তাদের সন্তানরাই 'বনী-

ইসরাইল' নামে পরিচিত। এ বারো জনের মধ্যে সবচে' প্রসিদ্ধ হলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম। হযরত ইয়াকুব ও তার অপর বারো সন্তানের বসবাস ছিল ফিলিস্তিনে। হযরত ইউসুফের শাসনামলে তারা মিসর চলে যান। কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত তারা মিসরে বসবাস করেন। এ সময়ে তাদের সংখ্যা লাখ পেরিয়ে যায়।

হযরত মুসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের সময় তারা ছিল ফেরাউনের সেবাদাস। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদেরকে ফেরাউনের নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেন। বনী ইসরাইল একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়। কিন্তু কয়েক শতকের দাসত্ব তাদেরকে কাপুরুষতা, শিরক এবং অন্যান্য চারিত্রিক ব্যাধিতে আক্রান্ত করে দিয়েছিল। যার ফলে তারা আল্লাহর নির্দেশ সত্ত্বেও দখলদার মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে ফিলিস্তিন বিজয়ে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীতে হযরত মুসার স্থলাভিষিক্ত হন হযরত ইউশা ইবনে নূন। তার সময়ে ফিলিস্তিন অঞ্চল বিজিত হয়। এভাবে বনী ইসরাইল আবার নতুন করে এ অঞ্চলে বসবাস শুরু করে।

তারপর হযরত দাউদ এবং হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের যুগে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে একটি শক্তিশালী রাজত্ব দান করেন। গোটা দুনিয়ায় যার দাপট কার্যকর ছিল। কিন্তু এর কিছুকাল পরই তাদের মধ্যে শুরু হয় নৈতিক অবক্ষয়। সকল প্রকার চারিত্রিক ব্যাধি আর শিরকপ্রীতি ছড়িয়ে পড়ে তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। প্রতিটি রক্তকণিকায়। নবীগণ তাদেরকে অনেক বুঝানোর পরও তারা নিবৃত্ত হয়নি। এজন্যে তাদের ওপর আবার চাপিয়ে দেওয়া হয় পরাধীনতা। আশপাশের দেশগুলোর উপর্যুপরি আক্রমণে ধ্বংসের মুখে পতিত হয় তাদের রাজত্ব।

হযরত ইয়ারমিয়া' আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের সময় বনী ইসরাইল সেকালের পরাশক্তি ইরাকের দুর্ধর্ষ শাসক বুখতে নসরকে ট্যাক্স দিয়ে চলতো। বনী ইসরাইলের চারিত্রিক অবক্ষয় তখন সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাদের মধ্যে শিরক ব্যাপক ও প্রকট আকার ধারণ করে ছিল। ব্যাভিচার ছিল তাদের সাধারণ বিষয়। স্ব-ধর্মাবলম্বীদের ওপরও তারা অকথ্য নির্যাতন চালাতো। সুদ এবং দাসপ্রথা রূপ নিয়েছিল মামুলি বিষয়ে। এ তো ছিল তাদের চারিত্রিক অবস্থা। অপর দিকে তারা ছিল রাজনৈতিকভাবে সম্ভাব্য সফলতার দোরগোড়ায়। চতুর্দিকে বুখতে নসরের বিরুদ্ধে ঘৃণার তুফান বইতে শুরু করেছিল। তাদের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাজনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি লাভ। জাতির সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং ঈমানী শক্তি বৃদ্ধির মতো

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে তাদের কোনো ভাবনা-ই ছিল না। ধর্ম ছিল নামেমাত্র লোক দেখানোর মতো ব্যাপার। ঈমান এবং নেক আমলের কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে ছিল না।

এমনই একটি সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে হযরত ইয়ারমিয়া' আলাইহিস সালাম প্রেরিত হন তাদের মাঝে। তিনি ঈমান ও আখলাকের প্রতি মানুষকে মনোযোগী করার জন্যে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করেন। তিনি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতৃবর্গের এমন কর্মনীতির গঠনমূলক সমালোচনা করেন। চারিত্রিক অবক্ষয়, শিরক-আশ্রিত ধ্যান-ধারণা এবং অন্যান্য মরণব্যাধির বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করেন। সাথে সাথে তিনি জাতিকে কঠোর হুঁশিয়ারি শুনিয়ে দেন, তারা যেন বুখতে নসরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চিন্তা কিছু দিনের জন্যে মাথা থেকে সরিয়ে দেয়। তিনি তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেন, তারা যদি আবেগ তাড়িত হয়ে এমন নির্বুদ্ধিতার পথে পা বাড়ায়, তাহলে বুখতে-নছর তাদের জন্য ঐশী গযব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু জাতি এতে ক্ষান্ত হয়নি। তারা তাঁকে কুয়ার মধ্যে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখে। জেলখানায় বন্দি করে রাখে। এক সময় তারা বুখতে নসরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। বুখতে নসরও তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে ছয় লাখ ইহুদিকে হত্যা করে এবং ছয় লাখ ইহুদিকে দাস হিসেবে বন্দি করে নিয়ে যায়। শহরে রক্তের বন্যা বয়ে যায়। গোটা জেরুজালেম তছনছ হয়ে যায়। এ ঘটনা কোরআন মাজিদেও বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, আক্রমণকারীরা ছিল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আরোপিত শাস্তি। কারণ, বনী ইসরাইল পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে চলে ছিল।

আমি এসবের মধ্যেই ডুবে ছিলাম। সালেহ আমার ভাবনার বিষয়টি বুঝতে পেরে বললো–

"তোমার যুগেও ঠিক এ কাজটিই করেছিল তোমার জাতি। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং ঈমান ও আখলাকের দিক থেকে তারা ছিল চরম বিপর্যয়ের শিকার। কিন্তু তাদের কথিত নেতৃবর্গ এটাই বুঝানোর চেষ্টা করছিল যে, আমাদের সকল বিপর্যয়ের মূল কারণ বর্তমান পরাশক্তি ও তার ষড়যন্ত্র। ঈমানী সংশোধন ও চারিত্রিক পুনর্গঠনের পরিবর্তে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও প্রভাব সৃষ্টি-ই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। অথচ ভালো-মন্দ পণ্যের সংমিশ্রণ, অবৈধ মুনাফা গ্রহণ, কপটতা এবং শিরকই ছিল তাদের মৌলিক সমস্যা। নবীদের আগমনের পরিক্রমা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদের দায়িত্ব ছিল গোটা দুনিয়ায় ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু জাতির সংশোধন এবং অমুসলিমদের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছানোর পরিবর্তে অমুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকেই

তারা নিজেদের স্বভাবে পরিণত করে নিয়ে ছিল। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহের নীতি অবলম্বন করে রেখেছিল। ঠিক যেমনটা করেছিলো বনী ইসরাইল। নিজেদের সংশোধনের বিষয়টি উপেক্ষা করে বুখতে নসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধকেই তারা তাদের কর্তব্য মনে করত। যার ফলে বনী ইসরাইলের মতো তাদেরকেও নিজেদের কৃতকর্মের কুফল ভোগ করতে হয়েছিল।"

ইতিমধ্যেই ঘোষণা হলো–

"ইয়ারমিয়া'কে উপস্থিত করা হোক।"

ঘোষণার অল্পক্ষণের মধ্যেই ইয়ারমিয়া' আলাইহিস সালাম কয়েক জন ফেরেশতাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি আরশের সামনে বিনম্র ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রইলেন। কোনো কথা বললেন না।

সালেহ বললো–

"আল্লাহ তায়ালা নিজেই তার নবীর অভিযোগ পেশ করবেন।"

সালেহ কথাগুলো বলা মাত্রই আকাশের বিশাল পর্দায় মুভির মতো সব ভেসে ওঠতে লাগল। দৃশ্যগুলো দেখার জন্যে সকলের দৃষ্টিই ওপরের দিকে নিবদ্ধ হয়ে গেল।

. . . . . .

এ ছিল এক ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের দৃশ্য। চতুর্দিকে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল। চলছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মাতাল নৃত্য। জ্বলন্ত ঘর-বাড়ি এবং আসবাব-সামগ্রীর কালো ধোঁয়া আকাশের উচ্চতা ছুঁইছুঁই করছিল। আর্তনাদ ও আর্তচিৎকারের করুণ শব্দ আকাশ-বাতাস ভারি করে তুলেছিল। নিরাপরাধ ও অপরাধীদের রক্ত একাকার হয়ে ভূপৃষ্ঠ রঙিন করে তুলেছিল। নির্দয়ভাবে চলছিল মানুষ নিধনের মচ্ছব। ঘর-বাড়ি লুটপাট করা হচ্ছিল। গলিতে গলিতে নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছিল। জেরুজালেমের অলিগলিতে ছিল ইরাকের দর্পী রাজা বুখতে নসরের সৈন্যদের অহংকারী পদচারণা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটিই; বনী ইসরাইলের এ পবিত্রতম শহর ও এখানকার অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করা।

এমন দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর হুলস্থুল পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঘোড়সওয়ার এক দল সিপাহি একজন কমান্ডারের নেতৃত্বে দ্রুত গতিতে এক দিকে ছুটে চলছিল। শহরের কোণায় নির্মিত জেলখানার কাছে গিয়ে তারা থেমে গেল। এরপর তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে গেল। কমান্ডার আগে বেড়ে জেলখানার কয়েদীদেরকে লক্ষ্য করে বললো–

"তোমাদের মধ্যে ইয়ারমিয়া' কে?"

তার প্রশ্নের কোনো উত্তর এলো না। কিন্তু একসাথে কয়েদীদের সকলের দৃষ্টি একটি ছোট্ট খাঁচায় গিয়ে নিবদ্ধ হলো। সেখানে একজন কয়েদীকে নির্মমভাবে রশি দিয়ে কষে বেঁধে রাখা হয়েছে। কমান্ডার তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন। তিনি সিপাহিদের দিকে ফিরতেই তারা ঐ খাঁচার দিকে এগিয়ে গেল। খাঁচা খুলে তারা হযরত ইয়ারমিয়াকে বাঁধন মুক্ত করলো। তিনি এতটাই দুর্বল ছিলেন যে, মাটিতে পড়ে গেলেন। এবার কমান্ডার নিজেই তার দিকে অগ্রসর হলেন। তার সামনে দাঁড়িয়ে বিনীত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন–

"ইয়ারমিয়া! কেমন আছো?"

বন্দি ইয়ারমিয়া ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। পিটপিট করে তাকালেন কমান্ডারের দিকে। কিন্তু প্রচণ্ড দুর্বলতায় তার চোখ আবার বন্ধ হয়ে গেল। কমান্ডার তার দিকে তাকিয়ে গর্বভরে বললেন–

"ইয়ারমিয়া! তোমার ভবিষ্যৎ-বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের মহামান্য সম্রাট বুখতে নসর জেরুজালেম তছনছ করে দিয়েছেন। মোট জনসংখ্যার অর্ধেককে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে। আর অর্ধেককে দাস হিসেবে আমাদের সাথে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার ব্যাপারে সম্রাটের বিশেষ নির্দেশনা হলো, তোমার যেন কোনো প্রকার ক্ষতি না হয়। তুমি একজন সত্যবাদী মহামানব। তুমি জাতিকে অনেক বুঝিয়েছো। কিন্তু তারা নিবৃত্ত হয়নি। এখন তারা তাদের কৃতকর্মের সাজা ভোগ করুক।"

এরপর সে পেছনে ফিরে সিপাহিদেরকে নির্দেশ দিল–

"ইয়ারমিয়াকে ছেড়ে দাও এবং অন্যদেরকে হত্যা করে দাও। এরপর শহরের লোকদের খুন দিয়ে তেষ্টা মেটাও। নারীদের দিয়ে শরীরের উত্তপ্ত খুন শীতল করো। অর্থ-সম্পদ যা পাও নিয়ে নাও। যা নিতে পারবে না তাতে আগুন লাগিয়ে দাও।"

কমান্ডারের নির্দেশে কয়েদীদেরকে হত্যা করে দেওয়া হলো। সিপাহিরা অর্থ-সম্পদ লুটতে অন্য দিকে চলে গেল। ইয়ারমিয়া আলাইহিস সালাম শক্তি সঞ্চয় করলেন। খাঁচার দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে ওঠে বসলেন। চোখের সামনে তার শহর জ্বলছিল। শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরায় তিনি এর দহন অনুভব করছিলেন। এরচে' আরো যন্ত্রণাদায়ক ছিল স্ব-জাতির ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য।

এরপর স্ক্রীনে তাদের জীবনাচার এবং তাদের যুগের কতগুলো দৃশ্য একের পর এক আসতে থাকলো। তিনি জাতির নেতৃস্থানীয় এবং সাধারণ প্রত্যেককেই বুঝানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করছিল না। বনী ইসরাইল তখন ইরাকের শক্তিধর শাসক, আশুরি সাম্রাজ্যের দুর্ধর্ষ সম্রাট বুখতে

নসরের অনুগত হয়ে দিনাতিপাত করছিল। বুখতে নসরকে সময় মতো বার্ষিক ট্যাক্স দিয়ে দেওয়াই ছিল তাদের জন্য নিরাপদ।

এ দাসত্বের মূল কারণ ছিল তাদের চারিত্রিক অধঃপতন, যা তাদের শিরায় উপশিরায় প্রবিষ্ট হয়েছিল। 'একত্ববাদ' লালনকারীদের মধ্যে শিরক ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল। ব্যাভিচার ও জুয়াবাজি ছিল তাদের কাছে সাধারণ বিষয়। বদ-দ্বীনি এবং স্ব-গোত্রীয়দের ওপর জুলুম নির্যাতন ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রি এবং প্রতিবেশীদের ওপর সীমালঙ্ঘন তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। মোটা অংকের সুদের বিনিময়ে তারা মানুষকে ঋণ দিত। কোনো ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে তার সন্তানদেরকে দাস বানিয়ে নিত। শিক্ষিত শ্রেণি সাধারণ জনতাকে সংশোধনের পরিবর্তে তাদের মধ্যে 'জাতীয়তাবাদ ও আত্মগৌরবে'র বিষক্রিয়া ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ঈমান, আখলাক ও শরীয়তের পরিবর্তে তারা উৎসবে উৎসবে পশু জবাই করাই প্রকৃত দ্বীন মনে করে বসে ছিল। শাসকগোষ্ঠী ছিল অত্যাচারী ও সুদখোর। ন্যায়-নীতির পরিবর্তে জীবনের আরাম-আয়েশকেই তারা তাদের প্রধান লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিল। এসব কিছুর পরও পুরো জাতি এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, বুখতে নছরের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই বিদ্রোহ করতে হবে। মূলত এটা ছিল তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আযাব। কিন্তু তাদেরকে তা বুঝানোর পরিবর্তে জাতীয় গৌরব, হযরত দাউদ ও সুলায়মান আলাইহিস সালামের হৃত সম্মান ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখানো হচ্ছিলো। দুনিয়ার কর্তৃত্বের জন্য প্রলুব্ধ করা হচ্ছিল। অথচ তারা ছিলো ঈমান ও চারিত্রিক দিক থেকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের শিকার।

এরপর স্ক্রীনে ওই দৃশ্যটি ভেসে ওঠলো যখন হযরত ইয়ারমিয়া' আলাইহিস সালামের প্রতি প্রত্যাদেশ করা হলো যে, তুমি তোমার জাতিকে সংশোধন করো। তাদেরকে রাজনীতি থেকে ফিরিয়ে দ্বীনের দিকে নিয়ে আসো। আল্লাহর ইবাদতে পূর্ণ মনোনিবেশ এসে গেলে রাজনৈতিক কর্তৃত্বও তোমাদের হাতে এসে যাবে। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, বিয়ে করে ঘর সামলানোর পরিবর্তে জাতিকে অত্যাসন্ন বিপর্যয় সম্পর্কে সচেতন করো। ইয়ারমিয়া' আলাইহিস সালাম যখন তাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছাতে গেলেন তখন তারা তার বিরোধিতায় লেগে গেল। আল্লাহর প্রেরিত এ নবী সমকালীন সাধারণ মানুষ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সবাইকে সত্যের দিকে আহ্বান করেছেন। কিন্তু হাতেগোনা কয়েকজন মানুষ ছাড়া কেউ তার কথায় কর্ণপাত করেনি। তার আহ্বানে কঠিন

কিছু ছিল না। বুখতে নসরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিবর্তে নিজেদের ঈমানী ও চারিত্রিক সংশোধনের দিকে মনোযোগী হও।

স্ক্রীনে ভেসে ওঠা সবচে' নাটকীয় ও অভিনব দৃশ্যটি ছিল হযরত ইয়ারমিয়া আলাইহিস সালামের কাঠের 'জোঁয়াল' কাঁধে বাদশাহর দরবারে উপস্থিতি। এটা ছিল তাদেরকে বুঝানোর সর্বশেষ প্রচেষ্টা। অর্থাৎ, এখন তোমাদের কাঁধে আছে কাঠের জোঁয়াল। এটা ভাঙার চেষ্টা করলে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে লোহার জোঁয়াল। কিন্তু বাদশাহর ইসরাইলি সভাসদ ও দরবারি আলেমরা তাঁকে বুখতে নসরের প্রতিনিধি বলতে লাগল। তাদের প্ররোচনায় বাদশাহ তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হলো। বাদশাহ তরবারি দিয়ে তার কাঠের জোঁয়ালটি ভেঙে দিল এবং নির্দেশ দিল এখন থেকে তাদের গলায় লোহার বেড়ি পরানো হবে।

জালেমরা আল্লাহর নবীকে বুখতে নসরের প্রতিনিধি আখ্যায়িত করে তাকে শাস্তি দিল। প্রথমে কুয়ার মধ্যে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখলো। এরপর এক অপ্রশস্ত অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তাকে বন্দি করে রাখলো। অপর দিকে তারা বুখতে নসরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে দিল। প্রতিবাদে বুখতে নসর তাদের ওপর পূর্ণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যা ছিল তাদের ওপর ঐশী গযবের এক অনন্য প্রকাশ। এরপর স্ক্রীনে আবার সেই প্রথম দৃশ্যটি ভেসে ওঠে। যখন গযবের বৃষ্টিতে জেরুজালেম স্নাত হচ্ছিল। ইয়ারমিয়া আলাইহিস সালাম চোখ খুলেই আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাফন বিহীন লাশগুলো দেখলেন। নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞের দৃশ্যগুলোর ওপর আক্ষেপের দৃষ্টি বুলিয়ে কলজে ছেঁড়া আর্তচিৎকার দিয়ে বললেন–

"হায়! তোমাদেরকে বুঝানোর জন্য কত চেষ্টাই না করলাম। কিন্তু তোমরা ধূর্ত রাজনৈতিক নেতা এবং মূর্খ ও উগ্র ধর্মগুরুদেরই অনুসরণ করেছিলে। হক-বাতিলের ব্যাপারটি তোমরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছ। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালনে সর্বদাই উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছ। শেষ পর্যন্ত এসবের পরিণামও তোমরা স্ব-চক্ষে অবলোকন করেছ।"

এরপর তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন–

"পরিপূর্ণ ইনসাফের দিন আসন্ন। সেদিন অবশ্যই আসবে তোমাদের সামনে। তবে এর জন্যে খানিকটা অপেক্ষা করতে হবে।"

. . . . .

এর সাথে সাথেই সকল দৃশ্য উবে গেল। বিকট শব্দে বেজে ওঠা ধমকি-নিনাদে পরিবেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে।

তার প্রেরিত নবীর সাথে বনী ইসরাইলের ঘৃণ্য আচরণের যে শাস্তি বুখতে নসরের আকৃতিতে এসেছিল, তা ছিল নিতান্তই নগণ্য। চূড়ান্ত শাস্তির সময় তো এখন। এরপর, যারা কোনো না কোনোভাবে নবী ইয়ারমিয়ার সাথে কৃত সীমালঙ্ঘনে জড়িত ছিল তাদেরকে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং ধর্মীয় নেতাদের একটি বিশাল দলকে উপস্থিত করা হলো। এ মহা ধ্বংসযজ্ঞের দায়দায়িত্ব ছিল তাদের কাঁধে, যারা ইয়ারমিয়া' আলাইহিস সালামকে শাস্তি দিয়েছিল। তাদের সাথে সাথে যারা তাঁকে সম্রাটের প্রতিনিধি আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে জনমত তৈরিতে সহায়তা করেছিল তারাও এ দলভুক্ত ছিল। তাদের সকলকে জাহান্নামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেওয়া হলো। এরপর এক এক করে ঐ যুগের সাধারণ মানুষের হিসাব-নিকাশ শুরু হলো। নবীর সাথে সীমালঙ্ঘনকারীদের কৃতকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেওয়া হলো। অপরাধীদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির ফায়সালা হলো।

এবার আমি হাশর মাঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষের হিসাব-নিকাশ দেখতে থাকলাম। সত্য কথা হলো, এর আগে আমি অল্প কিছু মানুষেরই হিসাব গ্রহণ দেখেছিলাম। এবার আমার অনুমান হলো, আল্লাহ তায়ালার হিসাব গ্রহণ একেবারেই পুঙ্খানুপুঙ্খ। শতভাগ ইনসাফপূর্ণ। প্রত্যেকের পরিবেশ পরিস্থিতি এবং লালনপদ্ধতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মন ও মননের আলোকে তার কৃতকর্মের মূল্যায়ন হচ্ছিল। সরষে দানার মতো তুচ্ছ আমলও মানুষের আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে। মানুষের নিয়ত, প্রবণতা ও আমল প্রতিটি বিষয়ই পরখ করা হচ্ছিল। ফেরেশতাদের লিপিবদ্ধ, অন্যান্য মানুষ, ঘর-বাড়ি ও দালান-কোঠাগুলোকেও সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হচ্ছিল। সবচে' বড় বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো এখানে বাকময় হয়ে ওঠেছিল। প্রত্যেকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই তার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছিল। এসবের ভিত্তিতে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়ে কারো জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের ফায়সালা হচ্ছিল। কারো প্রতি সরষে দানা পরিমাণও অবিচার হচ্ছিল না। সামান্য কিছুর অজুহাতেই অনেকের মুক্তির ফায়সালা হয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ তায়ালার অসীম দয়া ও ন্যায়পরায়ণতার এ চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

আমি এগুলো নিয়েই ডুবে ছিলাম। সালেহ আমাকে ফিসফিস করে বললো—

"নাঈমা ব্যাকুল হয়ে তোমাকে খুঁজছে।"

"কেমন আছে নাঈমা? আমি জানতে চাইলাম।

"মজার ব্যাপার। নাঈমা ভালোই আছে। জলদি চলো।"

বলেই সালেহ খপ করে আমার হাত ধরে চলতে লাগলো। অল্পক্ষণের ব্যবধানেই আমরা নাঈমার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমি নাঈমা'র সাথে পরির মতো রূপসী এক মেয়েকে দাঁড়ানো দেখে বিস্মিত হলাম। পুরোনো স্মৃতিগুলো আঁতিপাঁতি করে হাতড়িয়েও তাকে খুঁজে পেলাম না। নাঈমা নিজেই তার পরিচয় করিয়ে দিল–

"এ হলো আমুরা। হযরত নুহ আলাইহিস সালামের উম্মত। এখানেই তার সঙ্গে পরিচয়। তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, শেষ নবী বা তাঁর উম্মতের বিশিষ্ট কারো সঙ্গে সাক্ষাত করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তো আর আমি নিয়ে যেতে পারব না, তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। আপনিও তো বিশিষ্টদের-ই একজন।"

এরপর সে এভাবে বাড়িয়ে বাড়িয়ে আমার পরিচয় বলতে লাগল। মানুষকে আকৃষ্ট করার মতো রাজ্যের সব বৈশিষ্ট্য আমার সঙ্গে যুক্ত করতে লাগল। নাঈমাকে থামানোর জন্যে অবশেষে আমাকেই মুখ খুলতে হলো।

আমি বললাম–

"নাঈমা হলো আমার স্ত্রী। এজন্যেই সে আমার ব্যাপারে এতটা বাড়িয়ে প্রশংসা করছে। অবশ্য এতটুকু বাস্তব যে, আমি আপনাকে এ উম্মতের বিশিষ্ট কারো সঙ্গে বা চাইলে আমার নবীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারি।"

আমার কথাগুলো নাঈমার খুব একটা পছন্দ হলো না। কিছুটা উত্তেজনার স্বরেই সে বললো–

"আমি যদি বাড়িয়েই বলে থাকি তাহলে বলুন, সালেহ আপনার সঙ্গে কেন? কেন আপনাকে নিয়ে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে?"

ঝগড়া মিটানোর জন্য আমি বললাম–

"ঠিক আছে, মানলাম আমি হেরে গেছি। এখন আমুরা'র ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দাও।"

মুচকি হেসে আমুরা বললো–

"হাজার বছরের ব্যবধানেও মানুষের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। বরং দ্বিতীয়বার জীবিত হয়েও আগের মতোই রইল। আপনারা দু'জন যেভাবে তর্ক করছেন আমার আব্বা আম্মাও ঠিক সেভাবেই তর্ক করতেন।"

"তার আব্বা আম্মার সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।"

নাঈমা কথায় ফোঁড়ন দিয়ে বললো। এতে ছিল তার বাড়তি আনন্দের ঝিলিক। আমুরাকে পেয়ে সে কেন এতটা আনন্দিত, আমার বুঝতে বাকি রইল না। এভাবে আমাকে হাশরের মাঠ থেকে ফিরিয়ে আনার কারণও স্পষ্ট হয়ে ওঠলো।

"আমুরার স্বামী নেই।"
সালেহ আমার ধারণাকে সত্যায়ন করে কানে কানে বললো–
"নাঈমা মূলত হবুপুত্রবধূর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে আপনাকে ডেকেছে।"
আমার ধারণা একদম সঠিক ছিল। নাঈমা জমশেদের জন্যে পাত্রীর অনুসন্ধান করছিল। শেষ পর্যন্ত তার এ প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখেছে। পাত্রী পছন্দ হয়েছে। কিন্তু পাত্র-পাত্রী একে অপরকে পছন্দ করেছে বা দেখেছে কি-না তা আমার জানা ছিল না। অবশ্যই এ বিষয়টি নিয়ে নাঈমার তেমন মাথা ব্যথা নেই। তার ধারণা, তার পছন্দই এ বিবাহের জন্যে যথেষ্ট ছিল।
আমি জিজ্ঞেস করলাম–
"আমুরা! তোমার স্বামী কোথায়?"
আমুরা লজ্জালু ভঙ্গিতেই বললো–
"দুনিয়াতে পনেরো বছর বয়সেই আমার মৃত্যু হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই আমি ভীষণ অসুস্থতায় ভুগতাম। আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি করুণা করেছেন, প্রতিদানে হিসাব-কিতাব শুরু হওয়া মাত্রই আমার জান্নাতের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে গেছে।"
"আর পরবর্তী কাজগুলো তোমার হবু শাশুড়িই সম্পন্ন করছেন।" আমি মনে মনে বললাম।
সালেহের চেহারায় মুচকি হাসির রেখা ফুটে ওঠল। আমুরা আরো বললো,
"আপনাদেরকে পেয়ে সত্যিই আমি অনেক আনন্দিত। জান্নাতে আমরা মাঝে মাঝেই মিলিত হবো। আচ্ছা, এখন আমি চলে যাচ্ছি। আব্বা-আম্মা হয়তো আমাকে খুঁজছেন।"
নাঈমাও তার সাথে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো। আমি বললাম–
"তুমি দাঁড়াও, জরুরি কথা আছে।"
নাঈমা আমুরাকে বললো–
"যেখানে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেখানে তুমি একটু অপেক্ষা করো; আমি আসছি।"
আমি একটু রসিকতা করেই বললাম–
"আমুরার মোবাইল নাম্বারটা নিয়ে নাও! এ জনসমুদ্রে কোথায় ওকে খুঁজে বেড়াবে।"
"মোবাইল আবার কি জিনিস?" আমুরা বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল।
"এটা এমন এক মুসিবত, যা এসে গেলে তুমি আর নাঈমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।" আমি উত্তর দিলাম। কথার ফাঁকে সালেহ বললো–
"আমার মনে হয়, আমুরা একা ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। আমি তাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।"

আমুরা সালেহ চলে যাওয়ার পর আমি নাঈমাকে নিয়ে লেকের পাড়ে এক জায়গায় বসে পড়লাম। আমি তাকে বললাম–

"তুমি কি করছো, তা কি তুমি জানো?"

"হ্যাঁ, আমি জমশেদের জন্যে আমুরাকে পছন্দ করেছি।"

"তা আমার জানা আছে। কিন্তু তোমার পছন্দে যে কিচ্ছু হবে না, এটা কি তুমি জান?"

"আমি ভালো করেই জানি, দুনিয়ার যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা আমার আছে; জমশেদ আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবে না। আর আমুরার বাবা-মা'র সঙ্গেও আমি কথা বলেছি।"

"যাদেরকে নিয়ে এত কিছু, সেই বর-কনেরই কোনো খবর নেই। তাদের সম্মতি নেওয়ার নাম নেই; আর তুমি সব কিছু চূড়ান্ত করে ফেলেছ। নাঈমা! একটু বোঝার চেষ্টা করো, এটা দুনিয়া নয়। এখানে মা-বাবার সম্পর্ক প্রতীকী। এখানে তারা যা ইচ্ছে করবে, তাই হবে। এজন্যে মনে মনে আশার জাল না বুনে তাদের মতামত জেনে নাও।"

"যদি তারা অসম্মতি প্রকাশ করে?"

"আরো অনেক মেয়েই তো আছে। এখানে কোনো কিছুর অভাব নেই। এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

নাঈমা নীরব হয়ে গেল। কিন্তু তার চিন্তার জগৎজুড়ে ছেয়ে থাকল পছন্দের হবু পুত্রবধূ আমুরা। তার এ অবস্থা দেখে আমি বললাম–

"নাঈমা! আজ প্রথম বারের মতো আমাদের একান্তে বসার সুযোগ হলো। তুমি কিছুক্ষণের জন্যে মাতৃস্নেহ ভুলে গিয়ে এখানকার মনোরম পরিবেশটা একটু অনুভব করার চেষ্টা করো।"

এরপর তাকে বললাম–

"তোমার কি মনে আছে নাঈমা! আমরা কত কঠিন মুহূর্তে একে অপরকে সঙ্গ দিয়েছি? আল্লাহ তায়ালার বার্তাগুলো তার বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে তো আমি পুরোটা জীবন ব্যয় করে দিয়েছি। আমার অবস্থান, যৌবন, প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস এ কাজের জন্যে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলাম। দেখো নাঈমা! আমি যে সওদা করেছিলাম, তাতে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইনি। আমি না তোমাকে দুনিয়াতে বলতাম, আল্লাহর সাথে যে সওদা করে তার কোনো লোকসান হয় না! দেখো, সত্যিই আমরা লোকসান থেকে বেঁচে গেছি। কী চমৎকার সাফল্যই না আমরা পেয়েছি! আমরা জিতে গেছি নাঈমা! ....সত্যিই আমরা বিজয়ী। প্রকৃত জীবন তো এটাই। এ জীবনে মৃত্যু বলতে কিছু নেই। এ যৌবনকে আর বার্ধক্য কুড়ে কুড়ে খাবে না। এ সুস্থতায় আর রোগের ঝাপটা আসবে না। দারিদ্র্যের দিন

শেষ, এখন শুধু ধনাঢ্যতা। এখানকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ চিরস্থায়ী। দুঃখ-কষ্ট বিদায় চিরকালের জন্যে।"

"দুনিয়ার কোনো কষ্টের কথা তো আমি এখন মনেই করতে পারছি না।"

"হ্যাঁ, আজ না কোনো জান্নাতীর কোনো দুঃখের কথা মনে আছে, আর না কোনো জাহান্নামীর কোনো সুখের কথা মনে আছে। দুনিয়া তো ছিল মরীচিকার মত কল্পনার এক জগত, অবাস্তব স্বপ্নের ঘূর্ণিপাক। বাস্তবতার শুরু তো এখানে। প্রকৃত জীবনের সূচনা তো এখন।"

"আরে দেখো! আসমানের রং কেমন বদলাচ্ছে?"

নাঈমার কথায় আমি ওপরে তাকালাম। আমার মনে হলো, সত্যিই এখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। একটু পরেই সূর্য ডুবে যাবে। আমার মনে হলো, এ কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আগামবার্তা।

পেছন থেকে একটি আওয়াজ ভেসে এলো–

"হ্যাঁ, তোমার অনুমান সঠিক।"

এটা ছিল সালেহের কণ্ঠ। কাছে এসেই বললো–

"এ পরিবর্তনের অর্থ হলো এখন হিসাব গ্রহণ সমাপ্ত হচ্ছে। সমস্ত মানুষের হিসাব গ্রহণ সম্পন্ন হয়ে গেছে।"

"আগে বলো, আমুরাকে রেখে তুমি কোথায় গিয়েছিলে? তোমার না পানি পানের প্রয়োজন আছে, আর না অন্য কোনো প্রাকৃতিক প্রয়োজন! তাহলে তুমি ছিলে কোথায়?"

"আমি ইমছাইল এর সঙ্গে ছিলাম।"

এর সাথে সাথেই ইমছাইল পেছন থেকে এসে সালাম দিয়ে আমার সামনে দাঁড়াল। এ ছিল আমার বাম কাঁধের ফেরেশতা। আমি তার সালামের উত্তর দিলাম। হাসিমুখে সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম–

"এখন তার আসার কারণ?"

"হিসাব গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এখন আপনাকে পেশ করা হবে। আমরা উভয়ে মিলে আপনাকে আল্লাহর সামনে হাজির করব।"

উপস্থাপনের কথাটি শুনে আমি প্রথম দিকে আঁতকে উঠলাম। আতঙ্কের সুরে জিজ্ঞেস করলাম–

"অন্যদের হিসাব গ্রহণ এত দ্রুতই শেষ হয়ে গেল?"

"আমি না বলে ছিলাম, এখানকার সময় খুব দ্রুত গড়িয়ে যায়, আর হাশরের মাঠের সময় অতিবাহিত হয় বড্ড মন্থর গতিতে। আপনারা যতক্ষণ এখানে ছিলেন, ততক্ষণে সেখানের হিসাব-নিকাশ শেষ।"

"আমি চলে আসার পর সেখানে আর কী কী হলো?"

"সব উম্মতের হিসাব পুরোপুরি শেষ হওয়ার পর হাশরের মাঠে শুধু তারাই রয়ে গেল, যারা ঈমান এনেছিল। কিন্তু তাদের গুনাহের আধিক্য তাদেরকে আটকে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশে তাদেরও হিসাব হয়ে গেল। এখন সকল নবী ও শহীদকে পেশ করা হবে।"

"শহীদ কি যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তারা?" নাঈমা সালেহকে প্রশ্ন করলো।
"না এরা ঐ শহীদ না। তারা অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আরো আগেই হয়ে গেছে। এরা হলো, যারা সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে। যারা আল্লাহর দ্বীনের সাক্ষী হয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে নিজেদের শেষ করে এসেছে। যারা নবীগণের পর তাদের দাওয়াতী কার্যক্রম আগে বাড়িয়েছে।"
"তাদেরও কি হিসাব হবে?" আমি জানতে চাইলাম। কারণ, হিসাবের বিষয়টি নিয়ে তখনো আমার মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছিলো।

"না না, তাদেরকে শুধু আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে। এরপরই তাদের মুক্তির ঘোষণা হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তো সব কিছুর প্রতিপালক। সকল ক্ষমতার অধিকারী। তিনি চাইলে যে কারো হিসাব নিতে পারেন। কেউ তাকে বাধা দেওয়ার নাই।"
মনের অজান্তেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো–
"রাব্বিগফির ওয়ারহাম। প্রভু দয়াময়! ক্ষমা কর আমাকে, তোমার দয়ার ভিখারী আমি।"

"আমি আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার কথা বলছি। এটা তো বলছি না যে, আল্লাহ তায়ালা তা করবেনই। মূলত জান্নাত এবং জাহান্নামে প্রবেশের সময় ঘনিয়ে আসছে। জান্নাতী এবং জাহান্নামী সকলকে এখন হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে। সকলের সামনে নবী ও শহীদগণের চূড়ান্ত সফলতা ঘোষণা করা হবে। এরপরই দলে দলে সৎ ও অসৎ লোকদেরকে জান্নাত কিংবা জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এরপরই শুরু হবে অনন্তকালীন জীবন, যে জীবনের কোনো শেষ নেই।"

চিরস্থায়ী জীবনের পথে

অন্যান্য শহীদ এবং নবীগণের সাথে আমি আরো একবার আ'রাফের সর্বোচ্চ জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। উঁচু এ জায়গা থেকে হাশরের মাঠ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বিস্তৃত ময়দানে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত দেখছিলাম। ময়দানের ডান দিকে যত দূর দেখা যাচ্ছিল, মানুষগুলো ছিল সুশৃঙ্খল শ্রেণিবদ্ধ। এরা ছিল জান্নাতি। তাদের চেহারায় ছিল ঔজ্জ্বল্য, চোখে আনন্দের ঝিলিক এবং ঠোঁটে মুচকি হাসি। উন্নত পোশাকে তাদেরকে মনে হচ্ছিল, মনটা তাদের আনন্দে থৈ থৈ করছে। তাদের আত্মাগুলো কৃতজ্ঞতায় ডুবে আছে। তারা ছিল ডান দিকে। এ ডান দিকের লোকগুলোর সৌভাগ্য কি আর বলে বুঝানো যায়!

ময়দানের বাঁ দিকে আরো বহু মানুষের ভিড় দেখলাম। যারা বিক্ষিপ্তভাবে হাঁটুর ওপর ভর করে বসা ছিল। তাদের হাত ছিল পেছন দিক থেকে বাঁধা। জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য তাদের সামনে ভেসে ওঠছিল। এরা ছিল জাহান্নামী। যাদেরকে চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্যের সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা অপেক্ষায় ছিল, কখন তারা চূড়ান্ত পরিণতির কল্পনাতীত আযাবের মধ্যে পতিত হবে। তাদের চেহারার গোশত বের হয়ে গিয়েছিল। চোখগুলো বন্ধ হয়ে আসছিল। ললাট ছিল ঘর্মাক্ত আর মাথা ছিল অবনত। গাত্রবর্ণ একদম কালো হয়ে গিয়েছিল। গায়ে ধূলোবালির আস্তর পড়ে গিয়েছিল। এরা হলো বাঁ দিকের লোক। তাদের দুর্ভাগ্যের কি আর শেষ আছে।

সামনেই ছিল আল্লাহর আরশ। তার বড়ত্ব ও মহত্বের কথা তো বলাই বাহুল্য। আরশের চতুর্দিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল অসংখ্য ফেরেশতা। তাদের মধ্যখানে ঠিক আরশের সাথে লাগোয়া আটজন ফেরেশতা ছিল। তারা ছিল অসাধারণ ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের অধিকারী। তারাই হলো আরশবাহী। ফেরেশতাদের মুখে ছিল আল্লাহর স্তুতি, প্রশংসা ও পবিত্রতার ঘোষণা। অপর দিকে আরশের পেছনে কিছুটা উচ্চতায় জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্যাবলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ডান দিকে ছিলো জান্নাত, যেখান থেকে ভেসে আসা সুগন্ধি হাশরের মাঠের ডান দিকটাকে সুরভিত করে রেখেছিল। জান্নাত থেকে অনুরণিত হওয়া সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি মানুষের মনোজগৎ নাড়িয়ে দিচ্ছিল। জান্নাতের স্বপ্নীল ভুবনের সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা মাঠ ও তৃণভূমি, চিত্তাকর্ষক উদ্যান, মনোরম পরিবেশ, বহমান নদী-নালা এবং অপেক্ষমান সেবকদের চিত্র চোখের পাতায় পরিষ্কার ভেসে উঠছিল। জান্নাতের এমন অপরূপ দৃশ্যে প্রত্যেকেরই লোভাতুর

দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। জান্নাতীরা ছিল নিজেদের এ মহা সৌভাগ্যের জন্যে ঈর্ষান্বিত। এমন জান্নাত পেয়ে তারা মনের আনন্দে একে অপরের সঙ্গে খোশগল্প আর আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিল।

অপর দিকে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য চিত্রিত হচ্ছিল আরশের বিপরীত দিকে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সাপের জিহ্বার মতো বারবার বাইরে বেরিয়ে আসছিল। জাহান্নামের বিভিন্ন ধরনের শাস্তির চিত্রগুলো মানুষের হৃদয় প্রকম্পিত করে তুলছিল। উৎকট দুর্গন্ধ, বিকট আওয়াজ, উত্তপ্ত আগুন, বিষাক্ত পোকা-মাকড়, আযাবের জন্যে নিয়োজিত হিংস্র প্রাণী, তিক্ত বিস্বাদ ফল, কাঁটাযুক্ত গাছের ঝোপ-ঝাড়, পুঁজ ও রক্তমিশ্রিত খাদ্য, ফুটন্ত পানি, জ্বালানো তেলের গাদ এবং এ জাতীয় আরো অসংখ্য আযাব। সর্বোপরি কথা হলো, তাদের অপেক্ষায় ছিল চরম কুৎসিত কদাকার ও ভয়ানক চেহারার ফেরেশতা, যাদের হাতে ছিল শিকল, ডাণ্ডাবেড়ি এবং হাতকড়া।

সরাসরি যখন জাহান্নামীরা এসব দৃশ্য দেখছিল, তখনই তাদের দুরাবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের ভেতর কালবৈশাখী ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। এসব দেখে তারা একদম হিম্মতহারা হয়ে যায়। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তারা দৃশ্যগুলো দেখছিল। প্রত্যেকের পরম আকাঙ্ক্ষা ছিল, কোনো না কোনো উপায়ে তাকে মৃত্যুর ফায়সালা শুনিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, জাহান্নামে মৃত্যু ব্যতীত সব শাস্তিরই ব্যবস্থা আছে। জাহান্নামীদের পরম শান্তি হলো মৃত্যু। আর জাহান্নাম শাস্তির জায়গা, শান্তির জায়গা নয়।

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝে ছিল একটি স্বচ্ছ পর্দা, যা দিয়ে উভয় দল একে অপরকে দেখছিল এবং কথা বলছিল। কিন্তু তা অতিক্রম করার কোনো সুযোগ ছিল না। জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করছিল, আমাদের সাথে আমাদের রবের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তা তো আমরা পুরোপুরি পেয়েছি। তোমরাও কি জাহান্নামের প্রতিশ্রুত সকল শাস্তির বিবরণ সত্য পেয়েছ? প্রতিউত্তরে জাহান্নামীদের স্বীকারক্তিমূলক মাথা ঝুঁকানো আর 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

তীব্র ক্ষুধা এবং তেষ্টায় তারা কাতরাচ্ছিল। তাদের চোখের সামনেই জান্নাতীদের জন্য পরিবেশিত ফল-ফলাদি, গোশতের তশতরিগুলো পড়ে ছিল। জান্নাতীদের সুরাপাত্রের আয়েশী ঢোক দেখে জাহান্নামীরা বলত, আমাদেরকেও একটু দাও না খাবারপানি। আল্লাহ তায়ালা তো তোমাদেরকে অনেক দিয়েছেন। বরাবর একই উত্তর আসত, 'আল্লাহ তায়ালা এগুলো জাহান্নামীদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন।'
আমরা উপরে দাঁড়িয়ে এসব দৃশ্য দেখছিলাম এবং তাদের কথোপকথন শুনছিলাম। যদিও আমাদের হিসাবের ফল ঘোষণা ছিল নিয়ম রক্ষা মাত্র। তারপরও আমার ভেতরটা অজানা আশঙ্কায় কাঁপছিল। বারবার আমি আল্লাহর

কাছে তার দয়া এবং ক্ষমার প্রার্থনা করছিলাম। দুআ করছিলাম, মেহেরবান পরওয়ারদেগার! আমাকে জাহান্নামীদের সঙ্গী বানিও না। জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য আমাকে দান করো। আমার মতো আরো অনেকেই এমন দুআ করছিল।

এ ছিল আমার অবস্থা। পক্ষান্তরে অন্য শহীদগণ এসব দেখে তীব্র আবেগের কারণে সামনে অগ্রসর হয়ে জান্নাতীদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছিল। তাদেরকে বলছিল, আপনাদের ওপর আল্লাহর দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক। এক পর্যায়ে নবীগণও সামনে অগ্রসর হন। স্ব-জাতির কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে তিরস্কারের সুরে বলতে থাকেন, কোথায় আজ তোমাদের বাহাদুরি? কী হলো আজ তোমাদের ঐক্য ও আত্মগৌরবের? এরপর জান্নাতীদের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এরাই কি তারা, যাদেরকে তোমরা দুনিয়াতে নগণ্য মনে করে দূরে সরিয়ে দিতে? ভাবতে, খোদার করুণার ছিটে-ফোঁটা না তারা একালে পেয়েছে, আর না পরকালে পেতে পারে? দেখে নাও, আজ তারা কেমন উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন! ইতিমধ্যেই ঘোষণা হলো, আমার নবী ও শহীদদের হাতে তাদের আমলনামা দিয়ে দাও। এখানে তাদের কোনো হিসাব-নিকাশ বা বিচারের মুখোমুখি হতে হলো না, যা ছিল আমার ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং প্রত্যেককেই সামনে দিকে ডাকা হত, যেখানে দাঁড়ালে জান্নাতী ও জাহান্নামী সকলেই তাদেরকে দেখতে পেত। সে তার সঙ্গে থাকা ফেরেশতাদের সাথে আগে বাড়ত। ফেরেশতারা তাকে পূর্ণ মর্যাদায় আরশের সামনে নিয়ে যেত, যেখানে তার দুনিয়ার কর্মতালিকা এবং আখেরাতের সফলতা ঘোষণা করা হত। যখনই কাউকে উপস্থিত করা হত, তখন তার সময়ের পরিবেশ-পরিস্থিতি, তার শ্রোতাদের পূর্ণ বিবরণ, মানুষের প্রতিক্রিয়া এবং এর বিপরীতে তার শ্রম-সাধনা সবিস্তারে বর্ণনা করা হত। শ্রোতারা এসব শুনে তাকে বাহবাহ দিচ্ছিল। সর্বশেষ যখন তার সফলতা ও সৌভাগ্যের ঘোষণা হত, মারহাবা মাশাআল্লাহ ধ্বনিতে তখন আশপাশ প্রকম্পিত হত। জান্নাতীরা হাত তালি দিচ্ছিল। কেউ আবার দাঁড়িয়ে যেত, সীমাহীন আনন্দে নেচে ওঠত। কেউ শিস বাজিয়ে বা অন্য কোনো ভাবে হর্ষধ্বনি দিয়ে যাচ্ছিল।

আমার নাম ঘোষণা হতেই আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা সকলে আমাকে মোবারকবাদ দিল। আমি সালেহ এবং ইমছাইলকে সাথে নিয়ে ঐ জায়গায় পৌঁছে গেলাম, ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকা সকলের দৃষ্টি যেখানে নিবদ্ধ ছিল। ইমছাইল আমার আমলনামা উঁচু করে ধরে রেখেছিল। অপর দিকে সালেহ আমার আগে আগে চলছিল। সেখানে পৌঁছে আমি অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে গেলাম। আওয়াজ এলো—

"আব্দুল্লাহ! মাথা নুইয়ে রাখার সময় শেষ। মাথা ওঠাও। উপস্থিত সবাই তোমাকে দেখতে চায়।"

আমি মাথা ওঠালাম। কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে আমার চক্ষুদ্বয় ভিজে ওঠলো। আমার ঠোঁটে ছিল সফলতার মুচকি হাসি। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর বিচার সভার অনুমতি পেয়ে সালেহ এবং ইমছাইল আমার জীবন বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করতে শুরু করলো। আমি হাশরের মাঠের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। আমার পরিবারের লোকজন, বন্ধু-বান্ধব, আমার দাওয়াতি কার্যক্রমে সঙ্গ দেওয়া আল্লাহর বান্দাগণ, আমার ডাকে সাড়া দিয়ে যারা ঈমান এনেছিল তারা এবং তাওহীদ ও আখেরাতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তওবাকারী মুসলমান নারী-পুরুষ সকলে হাত নেড়ে আমাকে অভিবাদন জানাচ্ছিল। প্রতিউত্তরে আমিও হাত নেড়ে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। তবে আমার দৃষ্টি ছিল নাঈমার দিকে। সে সন্তানদের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখ অশ্রুজলে সিক্ত হলেও ওষ্ঠদ্বয়ে হাসির রেখা স্পষ্ট ফুটে ওঠছিল। যখন সে বুঝতে পারল, আমি তাকে লক্ষ্য করছি, তখনই দৃষ্টি নামিয়ে ফেলল। লায়লা তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাকেই সবচে' বেশি উচ্ছ্বসিত মনে হচ্ছিল। চেয়ারে বসে আয়েশী ভঙ্গিতে তালি বাজাচ্ছিল। অপর দিকে আরিফা, আলিয়া, আনোয়ার এবং জমশেদও নিজ নিজ আসনে বসে আবেগ ও উচ্ছলতায় হাত নেড়ে যাচ্ছিল।" আমি পুরোটা ময়দান পর্যবেক্ষণের জন্যে বাম দিকে ফিরে দেখলাম। এ দিকের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, পরিতাপ-অনুতাপ, হতাশা-নিরাশা, আক্ষেপ-অনুশোচনা, দুঃখ-কষ্ট এবং তিরস্কার ও অভিশাপের এক ভয়াল কালো রাত জাহান্নামীদের ওপর ছেয়ে ছিল, যা কখনো শেষ হবার নয়। খুঁটিহীন বিশাল আকাশের যদি বাকশক্তি থাকত, তাহলে পরকালের ব্যর্থদের দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করত। বিস্তৃত জমিন যদি কথা বলতে পারত, তবে জাহান্নামীদের দুরাবস্থার জন্যে বিষাদ-সঙ্গীত গাইত। 'শব্দে'র যদি অনুভূতি প্রকাশের শক্তি থাকত, তাহলে এ অভাগাদের অবস্থা প্রকাশে হাত জোড় করে নিজের অপারগতা স্বীকার করে নিত। আমার মন চাচ্ছিল, সময়ের চাকা ঘুরে আবার ফেলে আসা দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারলে আমি মানুষকে এসব দৃশ্য দেখাতে পারতাম। দুনিয়া কামানোর পরিশ্রমে জীবন খুইয়ে দেওয়া এবং সম্মান লাভের প্রতিযোগিতায় মত্ত থাকা লোকদের চিৎকার করে বলতে পারতাম, প্রতিযোগিতা যদি করতেই হয়; তবে এ দিনের সফলতার জন্যে করো। সম্পদ ও উপায়-উপকরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যস্তদের বলতে পারতাম, প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি করতেই হয়, তবে জান্নাত অর্জনের জন্যে করো। দুনিয়ার জন্যে বড় বড় পরিকল্পনাকারীদের বলতাম, প্লানিং যদি করতেই হয়;

তাহলে জাহান্নাম থেকে বাঁচার প্লান করো। গাড়ি-বাড়ি, বাংলো-প্লট, দোকান ও নিজের স্ট্যাটাস ক্যারিয়ার অলঙ্কার ও পোশাক-পরিচ্ছদের সৌন্দর্যে একে অপর থেকে আগে বাড়ার মানসিকতার শিকার, দুনিয়াপ্রাপ্তিতে উল্লসিত এবং দুনিয়ার হারানোর কারণে ব্যথিতদেরকে বলতাম, যদি হাসতে হয়, তবে জান্নাতের আশায় হাসো। আর যদি কাঁদতে হয়, তবে জাহান্নামের আশঙ্কায় কাঁদো। মরতে যদি হয়ই তবে এ দিনের সফলতা নিশ্চিত করেই মরো। বেঁচে থাকলে অন্তহীন এ জীবনের সফলতা নিশ্চিত করার জন্যেই বেঁচে থাকো......যে জীবন শুরু হলে আর কোনো দিন শেষ হবে না।

আমার চোখ থেকে প্রবাহিত অশ্রুধারা আরো প্রবল বেগে বইতে লাগল। তবে এটা আনন্দাশ্রু নয়। এর পেছনে ছিল অসহনীয় এক যন্ত্রণার অনুভূতি। আর একটু কষ্ট করলে হয়তো আরো বহু মানুষের কাছে আমার দাওয়াত পৌঁছে যেত, না জানি কত মানুষ আজ জাহান্নাম থেকে বেঁচে যেতে পারত! এমনই ছিল আমার ব্যাকুল হৃদয়ের আহাজারি। হায়! একটি বার যদি পুনরায় সুযোগ পেয়ে যেতাম, কোনোভাবে যদি অতীত সময়টা আবার ফিরে আসত; তাহলে আমি একেক জনকে ধরে ধরে এ দিনের ভয়াবহতা বুঝানোর চেষ্টা করতাম। কলজে ছেঁড়া একটি তপ্ত 'আহ' বেরিয়ে এলো। বড় অসহায়ত্ব নিয়ে আমি আরশের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। সব সময়ের মতো বড়ত্বের পর্দা তখনো নুরানী চেহারা আবৃত করে রেখেছিল। মুখাপেক্ষিহীনতার বিস্ময়কর আবহ আমি অনুভব করতে লাগলাম। যেন সৌন্দর্য ও পূর্ণতার চমৎকার চাদরটি ঝুলে আছে মহা পরাক্রমশালীর কাঁধ মোবারকের ওপর। আমার অসহায় দৃষ্টি ঝুঁকে পড়লো দয়ার আঁচলে আবৃত চির দয়াময়ের অদৃশ্য কদমে, এ দৃষ্টি যেখান থেকে কোনো দিন ব্যর্থ হয়ে ফিরেনি। এ নগণ্য গুণাহগার অভাবীর সর্বশেষ অবলম্বন ছিল এ কদম, এ দুয়ার।

মনের অবস্থা কিছুটা শান্ত হলে আবারও আমার দৃষ্টি ফিরে গেল জাহান্নামীদের দিকে। তাদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিল, যাদেরকে আমি চিনতাম। তাদের সংখ্যা একেবারে নগণ্যও ছিল না। ঘর্মাক্ত শরীরে তারা পরস্পর গাদাগাদি করে চাকরের মতো হাঁটু তুলে বসে ছিল। তাদের বিস্ময়ভরা চোখের পলক পড়ছিল না। অনেকে তো লজ্জা ও অনুতাপে পিঠ ফিরিয়ে বসে ছিল। যার কারণে পরিচিত অনেককেই আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাদের এ করুণ পরিণতি দেখে আমার মনটা আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। অসীম দয়া ও অনুগ্রহেই তিনি আমাদেরকে এ অশুভ পরিণতি থেকে বাঁচিয়েছেন। আমার মনে হলো, জান্নাতীদের অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে দুটি নেয়ামত সর্বশ্রেষ্ঠ। এক, জাহান্নাম থেকে মুক্তি। দুই, অভাবনীয় মর্যাদায় জান্নাতে প্রবেশ।

মুহূর্তের মধ্যেই আ'রাফে অবস্থানরত সকলের কার্যবিবরণী শোনানো শেষ হয়ে গেল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্যে অপেক্ষার কিছু দেখা যাচ্ছিল না। তার পরও মনে হচ্ছিলো এখনও কোনো আনুষ্ঠানিকতা যেন রয়ে গেছে। সকলেই স্ব-স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল। ইতিমধ্যেই হাশরের ময়দানে তাগড়া একটি বিশালকায় প্রাণী নিয়ে আসা হলো। গলায় রসি পরানো ছিল। ফেরেশতারা টেনে প্রাণীটি আরশের সামনে নিয়ে যাচ্ছিল। সালেহ্ আমার কানে কানে বললো–

"এ হলো মৃত্যু। চির দিনের জন্যে এর পরিসমাপ্তি জানিয়ে দিতেই এ আয়োজন।"

আরশ থেকে ঘোষণা হলো, আজ মৃত্যুর বলি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন আর না কোনো জান্নাতীর মৃত্যু হবে, না কোনো জাহান্নামীর।

ঘোষণার সাথে সাথেই ফেরেশতারা প্রাণীটিকে শুইয়ে জবাই করে দিল। মৃত্যুর বলিতে জান্নাতীরা সশব্দে তালি বাজিয়ে সীমাহীন আনন্দে ফেটে পড়লো। অপর দিকে জাহান্নামীদের কাতারে নেমে এলো শোকের ছায়া। তাদের অন্তরে মুক্তির আশায় যে টিমটিমে আলোটুকু জ্বলছিল, 'মৃত্যু'র বলির সাথে সাথে তাও চিরতরে নিভে গেল।

আরশ থেকে নির্দেশ এলো, জাহান্নামীদেরকে দলে দলে তাদের শেষ ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হোক। ফেরেশতারা দ্রুত চঞ্চল হয়ে ওঠলো। হাশর মাঠের বাঁ দিকটায় তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। চিৎকার-আর্তনাদ এবং আহাজারি-ফরিয়াদের ভেতর দিয়েই ফেরেশতারা ধরে ধরে অবাধ্য ও পাপিষ্ঠদেরকে দল বেঁধে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিটি দল জাহান্নামের দরজায় পৌঁছতেই জাহান্নামের দারোগা 'মালেক' আগে বেড়ে তাদের অপরাধের ভিত্তিতে জাহান্নামের সাত দরজার কোনো একটি খুলে তা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিত। এর ফাঁকে ফাঁকে জাহান্নামকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করা হত–

"তোর জায়গা পরিপূর্ণ হয়েছে কি?"

তেজি গলায় জাহান্নাম বলত–

"পরওয়ার দিগার! আরো কি আছে? তাদেরকেও পাঠিয়ে দিন।"

এ কথোপকথন শুনে হাশরের ময়দানের আর্তচিৎকারে নতুন মাত্রা যোগ হত। এরপর অবশিষ্ট অপরাধীদেরকে ঝাপটা মেরে তাদেরকেও জাহান্নামে পৌঁছে দেওয়া হত। এভাবে মুহূর্তের মধ্যেই সকল অপরাধী নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে গেল।

আরশ থেকে পরবর্তী নির্দেশ এলো–

"জান্নাতীদেরকে আপন আপন ঠিকানায় পাঠানো হোক।"

যখন এ নির্দেশ আসলো, উল্টো দিকে তখনো কিছু লোককে দেখতে পেলাম। আমি সালেহ্কে জিজ্ঞেস করলাম–

"এরা কারা? এদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে না কেন?"

সালেহ উত্তর দিল–

"এরা মুনাফিক। জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর এদের ঠিকানা। তারা দুনিয়াতে আল্লাহকে ধোঁকা দিত। আজকে তাদের শুধু কঠিন শাস্তিই হবে না, ধোঁকাবাজির প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তাদের করুণ পরিণতির সূচনা ধোঁকা দিয়েই হবে।"

"ধোঁকা! এর মানে?"

"বাহ্যত তারা মনে করে বসে আছে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়নি, এ দিকে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, হয়তো মুখের ঈমানের খাতিরে তাদেরকেও ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এটা তাদের স্বপ্নবিলাস, দুঃস্বপ্ন। অতি শীঘ্রই তা ভঙ্গ হয়ে যাবে।"

এরই মধ্যে "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীনে'র এ মাতানো সুরলহরী আমার কানে বাজতে লাগল। এটা ছিল আরশবাহী এবং অন্যান্য ফেরেশতার আওয়াজ। তারা তাদের সুরেলা কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা সংগীত গাইছিল। সালেহ আমাকে বললো–

"এটা বিচার দিবস সমাপ্তির ঘোষণা।"

এর সাথে সাথেই হাশরের মাঠে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আরশের বাইরে আর কোথাও কোনো আলো অবশিষ্ট থাকলো না। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমি আতঙ্কিত হয়ে সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম–

"এগুলো কী হচ্ছে?"

"অন্ধকার..." সংক্ষিপ্ত উত্তর।

"আরে ভাই! এ তো আমিও বুঝতে পারছি। কেন হচ্ছে এমন?"

"এ অন্ধকার ভেদ করে শুধু তারাই জান্নাতে পৌঁছতে পারবে, যাদের কাছে ঈমান এবং নেক-আমলের আলোক-রশ্মি থাকবে।"

এটা বলেই সে আমার আমলনামা হাতে ধরিয়ে দিল। তাতে ছিল এক বিস্ময়কর আলোকচ্ছটা। যা দিয়ে আবার আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। এ নিকষ অন্ধকারের মধ্যেও আমি সব কিছু স্পষ্ট দেখতে লাগলাম।

"প্রত্যেককেই তার আমলনামা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ আমলনামাই এখন হাশরের মাঠের গাঢ় অন্ধকারে আলো দিচ্ছে। মুনাফেক ছাড়া প্রত্যেকের কাছেই এ আলোক-রশ্মি রয়েছে।" সালেহ আমাকে আরো কিছু অজানা বিষয় জানিয়ে দিল–

"এখন হবেটা কী?" আমি জানতে চাইলাম।

"এখন আমরা নিচে যাব। সেখান থেকে প্রত্যেক উম্মত তার নবীকে অনুসরণ করে জান্নাতের পথে রওয়ানা হবে।"

"জান্নাতের পথ কোন দিকে?" আমি জানতে চাইলাম।

"আরশের সন্নিকটে। আরশের পেছনে ডান দিকে, যেখানে মহাশূন্যে জান্নাতের চিত্রগুলো দেখা যাচ্ছিল; সেখান থেকেই জান্নাতের পথ শুরু। কিন্তু এ পথ গহীন জাহান্নাম অতিক্রম করে গেছে। যেখানে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। যার আলোকচ্ছটা যত প্রখর হবে, সে তত দ্রুত এবং সহজভাবে জান্নাতে পৌঁছে যাবে।"
"এর অর্থ কি আরো কোনো পরীক্ষা বাকি আছে?"

"পরীক্ষা কিছু না। এটা হলো দুনিয়ার জীবনের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে যারা যত বেশি যত্নবান ছিল, আনুগত্যে অগ্রগামী ছিল, যারা জীবনের সংকীর্ণতায় নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়েছে, তারা তত দ্রুত এবং সহজভাবে এ সংকীর্ণ পথ পুলসিরাত পাড়ি দিয়ে জান্নাতের পথে অগ্রসর হবে। গতি কম বেশি যাই হোক, যাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হয়েছে তারা সবাই এ পথ অতিক্রম করে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। ঈমান ও আমলের আলোহীন মুনাফেকরাও এ গহীন গহ্বর অতিক্রমের চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা ছিটকে জাহান্নামের অতলে চলে যাবে এবং ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে।"
"পরিবারের লোকেরা কি আমার সঙ্গে থাকবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"এ পথ এভাবেই সকলকে অতিক্রম করতে হবে।" সালেহের স্পষ্ট উত্তর।
"তাহলে দলে দলে জান্নাতে যাওয়ার কী অর্থ হলো?" আমি প্রশ্ন করলাম।
"দলে দলে জান্নাতে যাওয়ার অর্থ, সকল উম্মত তার নবীর পেছনে পেছনে চলে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছবে। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করবে একাকি, ব্যক্তিগত আমলের ভিত্তিতে।"
এরপর একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করলো−
"আরে এখনো কি তোমার তামাশা দেখার সময় আছে?"

আমি কিছু বলার আগেই সে আমাকে নিয়ে সামনে চলতে লাগল। আমরা এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম, যেখানে উপস্থিতদের কাছে তীব্র জ্যোতির্ময় আলোক-রশ্মি ছিল। তাদের আলোক-রশ্মি তাদের সামনে এবং ডানে ডানে চলছিল। তারা উচ্চ আওয়াজে বলছিল হে আমাদের রব! আপনি আমাদের আলোর জ্যোতি পূর্ণ রাখেন। আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। আপনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। সালেহকে জিজ্ঞেস না করেই আমি তাদেরকে চিনে ফেললাম। তারা ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তাদের সামনে ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার আপাদমস্তক পুরো সত্তাই সেদিন নূরে পরিণত হয়েছিল। তাদের অনুসরণে আমি তাদের মুখে উচ্চারিত শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে লাগলাম। এটা ছিল পবিত্র কোরআনের শেখানো দুআ, যা জীবনভর আমি পড়ে এসেছি। কিন্তু এ

দুআ পাঠের মূল সময় ছিল এটি। এভাবেই চলছিল আমাদের সম্মুখযাত্রা। যাত্রাপথে সালেহ বললো–
"এবার তামাশা দেখো।"

আমি দেখলাম কিছু লোক হাঁপিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কোনোমতে সাহাবায়ে কেরামের কাছে এসে পৌঁছল। তাদের কাছে কোনো আলো ছিল না। এসেই তারা দোহাই দিয়ে অনুনয় বিনয় করতে লাগল, দাও না একটু আলো আমাদেরকে! কতক সাহাবী পেছনে হাশরের মাঠের দিকে হাতের ইশারায় উত্তর দিলেন– আমরা তো এ আলো এনেছি পেছন থেকে। তোমরাও পেছনে ফিরে যাও। সেখান থেকেই আলো সংগ্রহ করো। একথা শুনেই মুনাফেকরা দ্রুত পেছনে ফিরল। সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেই তারা দেখল, এখানে এক মজবুত প্রাচীর উঠে আছে। প্রাচীরটিতে খানিক পর পর ছিল দরজা। প্রতিটি দরজায় ফেরেশতা মোতায়েন ছিল। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকার চেষ্টা করতেই ফেরেশতারা মেরে তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিত। এরপর আর তাদের 'আলোক-রশ্মি' অর্জনের কোনো সুযোগ অবশিষ্ট থাকল না। আবার তারা সাহাবায়ে কেরামের কাছে ফিরে এসে বলতে লাগল– দেখো, আমরা তো মুসলমানই ছিলাম। দুনিয়াতে আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম। তা তো আর তোমাদের অজানা নয়। দয়া করে আমাদের একটু আলোর জন্য তোমরা কিছু একটা করো! উত্তর এলো– নিঃসন্দেহে তোমরা আমাদের সঙ্গে ছিলে। কিন্তু তোমরাই নিজেদেরকে ফেতনায় পতিত করেছিলে। আজকের ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ ছিল। তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দুনিয়া। তোমরা শয়তানের অনুসরণ করেছ। আর শয়তান তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আজ না তোমাদের কোনো মুক্তির ব্যবস্থা আছে, না কোনো কাফেরের।

একথা শুনেই মুনাফেকরা নিশ্চিত হয়ে গেল, তাদের পরিণাম কাফেরদের থেকে ভিন্ন হবে না। পেছনে ফেরা সুবিধাজনক মনে করলো না। তাই তারা অন্ধকারেই সামনে চলার চেষ্টা করল। কিন্তু আলোহীন এ চেষ্টার পরিণতি ছিল অতল জাহান্নাম। এক এক করে তারা বুক ফাটানো চিৎকার করতে করতে জাহান্নামে পতিত হতে লাগলো। নিচে তাদের জন্যে আযাবের ফেরেশতা আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। আমরা এসব দৃশ্য দেখছিলাম আর দুআ পড়তে পড়তে আরশের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম।
"হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের আলো নিভিয়ে দিবেন না। আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন। মুনাফেকদের পরিণতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। নিশ্চয় আপনিই সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"

জান্নাতের রাজত্বে প্রবেশ

আমরা জাহান্নামের অতল গহ্বর নিশ্চিন্তে নিরাপদে অতিক্রম করেছিলাম। বিপদসঙ্কুল এ জায়গাটি অতিক্রম করে আমি পেছনে ফিরে দেখলাম, অনেক দূর পর্যন্ত আলোর মশালবাহী এক কাফেলা আমাদের পেছনে পেছনে চলছে। তারাও সশব্দে একই দুআ পাঠ করছিল। যার আলোর প্রখরতা যত বেশি ছিল, সে তত সহজে এ খাদ অতিক্রম করছিল। সামনে ফিরতেই দেখি আমরা একদম আরশের নিকটে পৌঁছে গেছি। আরশ আর কি, জ্যোতির্ময় এক বিস্ময়কর জগৎ। এখানে নূর ও আলোর বান ডেকেছিল। এর প্রকৃত অবস্থা শব্দের চাদরে আবৃত করা সম্ভব নয়। এখানে পৌঁছতেই আরশের জ্যোতির সামনে আমাদের মশালগুলো ম্লান হয়ে গেল। আরশের চারদিক ঘিরে ছিল ফেরেশতাদের সারিবদ্ধ দল। বিনীতভাবে হাত বেঁধে তারা 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'-এর সংগীতে এক প্রাণবন্ত আবহ তৈরি করেছিল। আমরা কাছে গিয়ে দেখলাম, ফেরেশতারা তাদের কাতারের মাঝে জায়গা ফাঁকা রেখেছে। যা দিয়ে মানুষ দলে দলে আরশের নিচে চলে যাচ্ছে। আমরা কাছে যেতেই আওয়াজ আসলো–

"আমার প্রিয় বান্দারা! অভিনন্দন তোমাদেরকে। আজ তোমরা চিরস্থায়ী রাজত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছ। আপন রবের নিরাপদ ভূমিতে চির দিনের জন্যে প্রবেশ করো।"

ফেরেশতাদের কাতার পার হয়েই আমি সালেহের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। সালেহ বিষয়টি একটু খুলে বললো–

"জান্নাতের পথ আরশের নিচ হয়ে আবার ডান দিকে ঘুরে এসেছে।"

"তাহলে আমরা আরশের নিচে যাচ্ছি কেন? সরাসরি ডানেই যাই?"

সালেহ মুচকি হেসে বললো–

"সব কিছু তুমি আগে আগে বুঝতে চাও। ঠিক আছে শোনো, আরশের নিচে মানুষের শেষ পরিশুদ্ধিটুকু হয়ে যাচ্ছে।"

"দুনিয়ার জীবন তো আমাদের পরিশুদ্ধই ছিল।"

"দ্বীনের প্রতিটি বিধানে মূল লক্ষণীয় বিষয় মানুষের পরিশুদ্ধি। মুমিন দুনিয়াতে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ছিল যত্নবান। সে খাবার গ্রহণ করত পবিত্র। ইবাদতের মাধ্যমে তাদের আত্মার পরিশুদ্ধি হত। শরীয়তের বিধানাবলি পালনের মাধ্যমে তাদের জীবন-জীবিকা এবং চারিত্রিক স্বচ্ছতা অর্জন করত। শয়তানের

প্ররোচনা, প্রবৃত্তির তাড়না সত্ত্বেও অমানবিক প্রবণতা থেকে নিজের আঁচল বাঁচিয়ে রাখার পূর্ণ চেষ্টা করত। এগুলো ছিল দুনিয়াতে মুমিনদের সাধনা। আজকে তার প্রতিদান 'রবে'র পক্ষ থেকে পুণ্যভূমি জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ পুণ্যভূমিতে প্রবেশের আগে আল্লাহ তায়ালা নিজে তাদের চূড়ান্ত পরিশুদ্ধিটুকু করে দেবেন। যার মাধ্যমে তাদের আত্মা, শরীর ও চরিত্র সকল প্রকার দূষণ ও কলুষ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে।"

"এ শুদ্ধতার অর্থ কি?"

"অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমাদের শরীর ছিল রক্ত, নাপাক ও দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা সব জিনিসে ভরপুর। এখন তা নূর দ্বারা বদলে দেওয়া হবে। এরপর তোমাদের শরীর থেকে যে বর্জ্য বের হবে, তা থেকে দুর্গন্ধ আসবে না। তোমাদের নিঃশ্বাসে সুগন্ধি ছড়াবে। পেশাব পায়খানা হবে না। সুগন্ধি ঘাম বেরোবে। নাক, কান, চোখ, মুখ বা শরীরের অন্য কোনো স্থান থেকে ময়লা নির্গত হবে না। এমনিভাবে হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, পর নারীর প্রতি কামভাব, ঘৃণা ও গোঁড়ামি সমেত সকল নিষিদ্ধ প্রবণতা অন্তর থেকে চিরতরে মিটে যাবে। তোমাদের মেধা-মন এবং দেহও এ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যাবে।"

আমার প্রফুল্ল মন থেকে সহসাই বেরিয়ে এলো,

"সুবহানাল্লাহ! তবে তো জীবনের প্রকৃত স্বাদ আমরা পেতে যাচ্ছি।"

"এখানেই শেষ নয়; তোমাদের যোগ্যতা এবং সামর্থ অসম্ভব বেড়ে যাবে। ঘুম আসবে না, বিশ্রামের প্রয়োজন হবে না। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হবে না। অলসতা ও বিরক্তি বোধ করবে না। হতাশা ও হীনম্মন্যতার শিকার হবে না। মনভরে খাবে। প্রাণভরে পানীয় গ্রহণ করবে। পেট নষ্ট হবে না। টয়লেটে যেতে হবে না। যেন তোমাদের মধ্যে শক্তিমত্তার কোনো অপার উৎস দিয়ে দেওয়া হবে। সর্বদা সুস্থ থাকবে। চির যৌবনের অধিকারী হবে। সর্বোপরি কথা হলো, এতটা সুন্দর ও সুদর্শন তোমরা হবে, যা কল্পনার বাইরে। এ তো হলো কেবল তোমাদের শারীরিক কিছু পরিবর্তনের কথা। এছাড়া আরো যে অগণিত নেয়ামতের অধিকারী হবে, তা সময়মত দেখবেই।"

"সবার সাথেই কি একই আচরণ করা হবে?"

"হ্যাঁ, সবার ক্ষেত্রেই এমন হবে। তবে যার আমল যত সুন্দর হবে, তার শক্তি সৌন্দর্য এবং পূর্ণতাও তত বেশি হবে।"

মনের অজান্তেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো–

"আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।"

এসব বলতে বলতে আমরা আরশের একদম কাছে চলে এলাম। এখানে পৌঁছতেই সালেহ আমাকে বললো–

“আব্দুল্লাহ! আমি এখন তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। এখান দিয়ে ঢুকে সোজা জান্নাতের দরজায় গিয়ে বের হবে। সেখানে জান্নাতের রক্ষকের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে। নিরাপদে সামনে চলো।”
এটা বলেই সে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

আমি এক রকম ঘোরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ আমার সামনে একটি দরজা খুলে গেল। আওয়াজ এলো–
“হে প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী! ফিরে এসো তোমার প্রতিপালকের নিকট, সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আমার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।”

এ আহ্বান আমাকে সাহস যোগালো। আমি আগে বেড়ে দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। এমনিতেই আমার মুখে জারি হয়ে গেল–
“আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।”

ভেতরে ঢুকতেই আমার মনে হলো, আমি এক নিরাপদ সুরঙ্গপথ দিয়ে আগে বাড়ছি। যার ফ্লোর, ছাদ এবং দেয়াল সব কিছুই দুধেল সাদা বর্ণের। এখানে প্রবেশ করেই আমি এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি অনুভব করলাম। আমার মনে হলো, রাস্তাটি বাঁ দিকে ঘুরে গেছে, কিন্তু দেখে তা বোঝার জো নেই। খানিকটা আগে বাড়তেই হঠাৎ যেন বাহারী রঙের আলোর বিচ্ছুরণ আমাকে ঘিরে নিল। রংধনুর জমকালো বাহারী রঙের তীক্ষ্ণ আলো আমার চারপাশে চমকাতে লাগলো। আমি পূর্ণ প্রশান্তি ও আস্থার সাথে সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। নুরের একটি চাদর স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আমাকে জড়িয়ে নিল। সাথে সাথেই আমার অস্তিত্বের কণায় কণায় ফুর্তি ও আনন্দের বান বয়ে গেল। মনে হলো, আমি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছি। শরীর একেবারে ওজন-শূন্য হালকা হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল, আমার শরীরের অস্তিত্ব মিটে গেছে, 'আমি' বলতে আমার আত্মাটিই শুধু রয়ে গেছে। অচেতন মনে আমি সামনে বাড়তে থাকলাম। একটু পরেই আবার সেই পুরোনো দুধেল সাদা রাস্তায় চলে এলাম এবং তা ধরে সামনে চলতে থাকলাম। আমার পূর্বের ও এখনকার অনুভূতিতে ছিল আকাশ-জমিন তফাৎ। আমার মনে হচ্ছিল, আগের 'আমি' বদলে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হয়েছি। শক্তি সাহস, প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং আত্মনির্ভরতার এক অভাবনীয় জোয়ার আমার মধ্যে বইতে লাগলো। এভাবে চলতে চলতে এক সময় আমাকে থেমে যেতে হলো। সামনে

ছিল ধাঁধানো এক বিস্তৃত জায়গা, যেখান থেকে মোট আটটি রাস্তা বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। রাস্তাটি জান্নাতের কোন দরজার সাথে গিয়ে মিলেছে তা প্রতিটি রাস্তার মাথায়ই লেখা ছিল। আমি উপরের লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করছিলাম, তখনই আওয়াজ এলো—

"শহীদদের দরজা দিয়ে ভেতরে চলে যাও।"

খেয়াল করে দেখলাম, ডান দিকের প্রথম দরজাটি হলো, নবীদের। এর সাথে লাগোয়া দ্বিতীয়টি সিদ্দীকদের। এর পরের দরজাটিই ছিল শহীদদের। আমি তাতে প্রবেশ করলাম। এটিও ছিল একটি সুরঙ্গপথ, যা একটি দরজার কাছে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। পথটি অতিক্রম করে বের হয়ে বাইরের পরিস্থিতি বুঝে ওঠার আগেই আমি সেখানে সালেহকে পেয়ে গেলাম। তার সাথে ছিল অন্য এক ফেরেশতা। সালেহের পরিবর্তে সেই আগে বেড়ে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললো—

"আসসালামু আলাইকুম। চিরস্থায়ী জান্নাতের স্বপ্নীল ভুবনে আপনাকে স্বাগতম। সালেহ আমাকে আপনার আমলনামা দিয়েছে, তাতে আপনার নাম আব্দুল্লাহ লেখা আছে। কিন্তু যে উচ্চ মর্যাদার কথা এতে লেখা আছে, তা দেখে আমি স্থির করতে পারছি না, কী বলে আপনাকে সম্বোধন করবো!"

সালেহ কথায় যোগ দিয়ে বললো—

"সরদার আব্দুল্লাহ বলেই ডেকে যাবেন। মৃত্যুর পর আল্লাহ তায়ালা আমাকে তার অভ্যর্থনার জন্যে বলে পাঠিয়েছিলেন, আমার বান্দা আব্দুল্লাহকে নিয়ে আসো, সে একজন সরদার।"

"ঠিক আছে, সরদার আব্দুল্লাহ! অবিনশ্বর এ রাজত্বে আপনার আগমন শুভ হোক।" এটা বলেই সে আমার সঙ্গে 'মু'আনাকা' করলো।

"আমার নতুন মেজবানের নাম কি?" মু'আনাকা অবস্থায়ই আমি সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম।

"সে তো মেজবান নয়, সে হলো প্রহরী। তাঁর নাম, রিদওয়ান।"

রিদওয়ান মুচকি হেসে বললো—

"সরদার আব্দুল্লাহ! এখানে মেজবান তো আপনি। এ বিশাল রাজত্ব আপনার। একটু দেখুন না, আপনি এখন কোথায় আছেন?"

তার কথায় আমি গভীর মনোযোগের সাথে আশপাশে চোখ বুলালাম। এ ছিল এক সম্পূর্ণ নতুন জগৎ। আসমান-জমিন যেন নতুন রূপ ধারণ করেছে। নতুন আসমান-জমিনের এ ছিল এক বিস্ময়কর জগৎ। দেখে মনে হচ্ছিল, এখানে কোনো কিছুর অভাব নেই। তবে তার সৌন্দর্য ও পূর্ণতা বর্ণনা করার মতো শব্দ আমার ছিল না। দুনিয়ার জীবনে আমি ছিলাম কথার রাজা। ভাষা ও ভাব

প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলাম। শব্দের খই ফুটতো আমার জবান থেকে। আমার বর্ণনাভঙ্গি ছিল স্বর্গীয়। কঠিন থেকে কঠিন ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিসের বিবরণ অত্যন্ত সাবলীল ও বোধগম্য করে পেশ করার এক অসাধারণ যোগ্যতা আল্লাহ আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আমার মনে হলো, আমার সকল ভাষাজ্ঞান ও বাকপটুতাই এখানকার অবস্থা বর্ণনা করতে অক্ষম। প্রাচীন যুগের কোনো মানুষকে শিল্প ও উৎকর্ষতার অত্যাধুনিক এ যুগে উন্নত ও সমৃদ্ধ কোনো শহরে হঠাৎ ছেড়ে দিলে তার যে অবস্থা হবে, ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল আমার। যে তার ছোট্ট কুটিরে সামান্য আলোর প্রয়োজনে লাকড়ি জ্বালাত, হঠাৎ লেজার লাইটের বাহারী আলো এবং টিউব লাইটের উজ্জ্বল প্রখর আলো দেখে সে যেমন কথা বলার শব্দ হারিয়ে ফেলবে, আমার অবস্থা ঠিক তেমনই হয়েছিল।

সালেহ আমার কৌতূহলী অবস্থা দেখে বললো–

"সরদার আব্দুল্লাহ! কৌতূহলের সব কিছুই রয়ে গেছে। এরচে' ভালো, চলো তোমার প্রাসাদে।"

রিদওয়ান রাস্তা দেখিয়ে বললো–

"এ পথেই আপনার প্রাসাদ।"

আমরা সামনে অগ্রসর হলাম। গাঢ় লাল রঙের মোলায়েম একটি গালিচা বিছানো ছিল। আমরা তাতে চলতে লাগলাম। রাস্তার দু'ধারে ফুলের তোড়া হাতে ফেরেশতারা রেশমি রুমাল নেড়ে নেড়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। ফুলের পাপড়ি আর সুগন্ধি ছিটিয়ে সালাম ও মোবারকবাদ দিচ্ছিল। এ ছিল সুপ্রশস্ত এক দীর্ঘ পথ। রূপকথার পরিজগৎ এবং 'কোহে কাফ'-এর গল্প শৈশবে কম বেশি সবাই পড়ে শোনে। রাস্তাটি ঠিক এমনই এক রূপকথার রাজ্যে গিয়ে মিলিত হয়েছে। দূর থেকে যার উঁচু উঁচু প্রাসাদ নজর কেড়ে নিচ্ছিল। সুরম্য প্রাসাদ, সবুজ-শ্যামলে ছেয়ে যাওয়া পাহাড়, তার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া পানির ঝরনা এবং ওপরের নীল আকাশের কারণে এলাকাটিকে সত্যি রূপকথার জগৎ বলেই মনে হচ্ছিল।

আমি রিদওয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম–

"এ সময়ে তো আরো অগণিত লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। সবাইকে রেখে আপনি আমার সঙ্গে চলে আসলেন, আপনার এতটা অবসর কোথায়?"

মৃদু হেসে সে উত্তর দিল–

"সময় এখানে থেমে আছে। ধরুন, দুইজন জান্নাতী পর পর ভেতরে আসবে, তাদের আসার মাঝে সময়ের যথেষ্ট ব্যবধান থাকবে। নিম্নশ্রেণির জান্নাতীদের তো আসার মধ্যে মাসকে মাস, কখনো তো শতাব্দীর ব্যবধান হয়ে যায়।"
আমি সালেহের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম–
"নাঈমা?"
রিদওয়ান আমার কথার উত্তর দিল–

"সরদার আব্দুল্লাহ! আপনি তো অনেক আগেই ভেতরে চলে এসেছেন। আপনার বেগম নাঈমা এবং অন্যদের এখানে আসতে একটু সময় লাগবে। তবে তার আগে আপনার অনেক কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। আপনার জান্নাত, নতুন এ জগৎ, বিশাল রাজত্ব এবং আপনার সেবায় নিয়োজিত খাদেমদেরকে আপনার চিনে নিতে হবে।"
"আচ্ছা! এখানে আর কে আছে?"
"এই যে, এরা হলো আপনার খাদেমদের বিশেষ কয়েকজন।"

রিদওয়ানের কথায় আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, ফেরেশতাদের পর রাস্তার উভয় দিকেই সারিবদ্ধ হয়ে কিছু বালক দাঁড়িয়ে আছে। সবে যারা শৈশব মাড়িয়ে কৈশোরে পা রেখেছে। আমার আর বুঝতে বাকি রইল না, এরাই সেই 'গিলমান', পবিত্র কোরআনে যাদের সৌন্দর্যের তুলনা করা হয়েছে মুক্তোদানার সাথে। সত্যিই তারা এতটা সৌন্দর্যের অধিকারী। বরং তাদের স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য যেন মুক্তোদানাকেও হার মানাবে। আমার স্পষ্ট বুঝে আসলো, কোরআনে যেসব অদৃশ্য বস্তুর বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করার জন্যে মানুষের ভাষা কত নগণ্য শব্দজ্ঞান, উপমা ও অলংকারবিদ্যার পুঁজি নিজের ভেতর ধারণ করতো। আজ আমার সামনে যা কিছু ছিল, তা বর্ণনা করার মতো জিনিস নয়। বরং কেবল দেখা ও উপলব্ধি করারই জিনিস। এ গিলমানেরাও এমনই এক বিস্ময় বাস্তবতা। ফেরেশতাদের মতো তারাও আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরণ করে নিল। কাছে পৌঁছতেই তারা হাঁটুর ওপর ভর করে বসে মাথা নুইয়ে দিল। এদেরকে মনে হচ্ছিল, আমার সম্মানার্থে বিছানো মুতির বিন্যস্ত পরম্পরা।
তাদের সারি দীর্ঘ হতে দেখে আমি সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম–
"ভাই! বিশেষ খাদেমদের সংখ্যা এত হলে মোট খাদেমের সংখ্যা কত? আর এত খাদেম দিয়ে আমি করব কি?"
জান্নাত সম্পর্কে সালেহের চেয়ে রিদওয়ানের জানা শোনা বেশি। সে-ই উত্তর দিল–
"আসমান ও জমিননের দূরত্ব সমান বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি আপনি। অসংখ্য দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। এসব

কাজে আপনি এদেরকে ব্যবহার করবেন। তারা আপনার ব্যক্তিগত কাজ থেকে শুরু করে আপনার বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনায় আমলা হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে।"

"তাহলে তো দেখছি জান্নাতেও কোনো অবসর নেই। এখানেও কাজে লেগে থাকতে হবে।" হাসিমুখে সরল একটি মন্তব্য করলাম।

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এটা আনন্দের জগৎ, কষ্টের জায়গা না। দুনিয়াতে মানুষ যে আয়েশ ও অবসর খুঁজতো, তারও কোনো কমতি নেই এখানে।"

"তাহলে আবার কাজ কিসের?"

"আমি বুঝতে পারছি, আপনি চাচ্ছেন সঙ্কট ও ঝামেলা মুক্ত এক রাজত্ব। আসল ব্যাপার আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। সময়মতো তিনি নিজেই সব কিছু বলে দিবেন।"

আমরা আর একটু অগ্রসর হতেই সালেহ বললো–

"সামনে 'হুর'দের দল আসছে।"

সালেহের এ বাক্যটি শুনে হাশরের মাঠে হুরদের যে কাব্যিক পরিচয় সে আমাকে দিয়েছিল তা আমার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠল। তার কথাগুলো তখন আমি অতিরঞ্জনই ধরে নিয়েছিলাম। এখন দেখছি তার বর্ণনা অতিরঞ্জন নয়, অপূর্ণই ছিল। বাস্তবতা আরো উর্ধ্বে। তাদের কাছে পৌঁছতেই তারা গিলমানদের ব্যতিক্রম কাণ্ডই করল। হাঁটুর ওপর ভর করে না বসে, দোজানু হয়ে বসে গেল এবং কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল।

আমি সালেহকে জিজ্ঞেস করলাম–

"এরা কী করছে?"

"এরা আপনাকে বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে।" সে হাসতে হাসতে বললো।

রিদওয়ান আর একটু ব্যাখ্যা করে বললো–

"মূলত তারা আপনার পায়ের আরামের জন্যে মাথার চুল বিছিয়ে দিচ্ছে। এজন্যেই তারা এভাবে ঝুঁকে আছে।"

তার কথায় আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম, তারা এমনভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে আছে যে, উভয় দিক থেকে তাদের মাথার চুল এসে জমিনের ওপর রেশমি কোমল কার্পেটের মতো হয়ে আছে। এত বিনম্র শ্রদ্ধা আমি জীবনে এ প্রথমবার দেখলাম। পূর্ণ গাম্ভীর্য বজায় রেখে প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে সহাস্য বদনে আমি সামনে অগ্রসর হচ্ছিলাম। চুলগুচ্ছের রেশমি কোমল ফরশের স্পর্শ পায়ে লাগতেই আমার অন্তরাত্মায় আনন্দের এক অপার্থিব ঢেউ বয়ে গেল। এ প্রথম

আমার মনে হলো, মখমলের কোমল দৃষ্টিনন্দন রাজকীয় পোশাক আমার গায়ে থাকলেও পায়ে কোনো জুতো ছিল না।

রিদওয়ান আমাকে এ হুর ও গিলমানদের সম্পর্কে আরো বললো–

"এ হুর ও গিলমানদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাদের ব্যাপারে আপনি ভুল ধারণা নেবেন না। এ বালক-বালিকারা অকল্পনীয় শক্তি ও কর্মদক্ষতার অধিকারী। তারা আপনার নির্দেশে আসমান-জমিন একাকার করতে সক্ষম। আপনার প্রতি তাদের ভালোবাসার কোনো অন্ত নেই। আপনার শরাবের পেয়ালা পরিবেশন করতে পারা তারা নিজেদের জন্যে গৌরব মনে করে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যা দিয়েছেন, তার প্রাথমিক অনুমানটুকুও এখনো আপনার হয়নি।"

আমি রিদওয়ানের কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি ভাবনার জগতে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঐ মহান সত্তার কদমে সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম, যিনি আমার মতো এক নগণ্য অসহায় বান্দাকে নিতান্তই তুচ্ছ কিছু আমলের বিনিময়ে এ অভাবনীয় সম্মান ও গৌরবে ভূষিত করেছেন। আপনিতেই আমার চোখ থেকে অশ্রু বইতে শুরু করল। বাস্তবেও আমি সেজদায় পড়ে গেলাম। মুখে আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা জপতে লাগলাম। আমি এ অবস্থায়ই পড়ে ছিলাম; হঠাৎ ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেলাম। সালেহ আমার পিঠ চাপড়ে বললো–

"আব্দুল্লাহ! এবার ওঠে তোমার সেজদার প্রতিদান দেখ।"

মাথা ওঠিয়ে দেখলাম, অবাক-বিস্ময়ভরা এক দৃশ্য আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। হুর গিলমানদের চেহারায় খুশি ও আনন্দের ঢেউ খেলছিল। তাদের আঁচল ভরা ছিল অনির্বচনীয় সুন্দর মুক্তোদানায়। আমি তন্ময় হয়ে শুধু দেখে যাচ্ছিলাম। সালেহ আমার বিস্ময় কাটাতে বললো–

"এগুলো আল্লাহ তায়ালা তোমার পক্ষ থেকে তাদেরকে গিফ্‌ট করেছেন। তোমার চোখ থেকে তো অশ্রুই পড়তো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এগুলোকে কবুল করে মুক্তোদানায় পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আপনার আগমনে এগুলো তাদের জন্যে বখশিশ, যা তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।"

আমরা আবার হাঁটতে লাগলাম। পরিশেষে এ সারিবদ্ধ উষ্ণ অভ্যর্থনার সমাপ্তি হলো এক সুউচ্চ বিশাল ফটকের সামনে। আমরা ফটকটির কাছে যাওয়ার আগেই দরজার উভয় কপাট খুলে গিয়েছিল। এখান থেকে রিদওয়ান ফিরে চলে গেল। আমি সালেহকে সঙ্গে নিয়ে আমার আবাসস্থলে প্রবেশ করলাম। আমি 'আবাসস্থল' শব্দটি বুঝে শুনেই ব্যবহার করলাম। কারণ, ঘর, বাড়ি, দালানকোঠা, প্রাসাদ, অট্টালিকা, কুঠরি, বাংলো, রাজমহল, বালাখানা, শহর,

নগর ইত্যাদি কোনো শব্দই আমার এ 'আবাসস্থলে'র বিবরণ দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল না। এটি ছিল দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত এক ভূখণ্ড। সবুজ-শ্যামলে ভরা পাহাড়-পর্বত, তাতে নির্মিত আকাশচুম্বী প্রাসাদ, পাহাড়ের পাদদেশে বিস্তৃত উদ্যান, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে কলতানে বয়ে যাওয়া নদী, সব মিলিয়ে যে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য তৈরি হয়েছে, তা বর্ণনার জন্যে শব্দ তো সেগুলোই ব্যবহার করা হবে যেগুলো আমার শব্দভাণ্ডারে জমা ছিল– কিন্তু প্রকৃত অবস্থা, সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এক কথায় অসাধারণ, অভাবনীয় ও অনির্বচনীয়।

আমি এসবের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সালেহের কাছে জানতে চাইলাম,
"এসব প্রাসাদের মধ্যে আমার কোনটি?"
সালেহ মুচকি হেসে বললো–

এসব আপনার আবাসস্থল না। এসবে আপনার যারা একান্ত খাদেম, তারা অবস্থান করবে। আপনার আবাসস্থল এখান থেকে বেশ দূরে। ইচ্ছে করলে পায়ে হেঁটে যেতে পারেন। তবে ভালো হলো, পরিবহন নিয়ে যাওয়া।"

এটা বলেই সে এক দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিল। আমি সেদিকে ঘুরতেই এক সুরম্য দালান দেখতে পেলাম। তবে দালানটি অপেক্ষাকৃত ছোট। ছোট বললাম এ জগতের দিকে তাকিয়ে। অন্যথায়, ফেলে আসা দুনিয়ার হিসেবে তো তা বিশাল এক প্রাসাদের সমান বিস্তৃত হবে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সালেহ না বললে আমি দালানটির অস্তিত্বই খুঁজে পেতাম না। কারণ, তা ছিল সম্পূর্ণ কাঁচের তৈরি। এতটা স্বচ্ছ যে, এক পাশ থেকে অপর পাশের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সালেহ সামনে অগ্রসর হলে আমি তার পেছনে চললাম। ধারণা ছিল, এখানে কোনো গাড়ি বা বাহন রাখা থাকবে। কিন্তু সে সরাসরি আমাকে নিয়ে এ দালানের মাঝ বরাবর একটি কুঠরিতে ঢুকে গেল। সেখানে হীরা-জহরতে সাজানো এক রাজকীয় আসন রাখা ছিল। সালেহ আমাকে তাতে বসার ইঙ্গিত দিয়ে বললো–

"এটাই আপনার বাহন, যা আপনাকে আপনার আবাসস্থল পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। আমি আপনাকে একাকী ছেড়ে যাচ্ছি, যেন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ রাজ্যের প্রকৃত অধিপতি আপনিই। কারো কোনো পরওয়া আপনার নেই। কোনো খাদেম বা কোনো ফেরেশতার প্রয়োজনও আপনার নেই। আপনি যা চাইবেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাই হয়ে যাবে। আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে আপনার শাহী মহলে।"

আমি কিছু বলার আগেই সে বের হয়ে গেল। সালেহের এসব কথায় আমি একরকম ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলাম। আসলে জান্নাতে প্রবেশের পর থেকেই কেমন যেন ঘোর ঘোর অবস্থায় ছিলাম। প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন আনন্দের বান আমাকে যেন আলাভোলা করে রেখেছিল।

দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবতে লগলাম, আমি কোথায় আছি এবং কেন আমি এখানে? সালেহের কথাগুলোর উদ্দেশ্যই বা কি ছিল? সালেহের উচ্চারিত শব্দগুলো আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকল। তার কথার মর্ম বুঝতেই আমার মধ্যে অসাধারণ আত্মবিশ্বাস জন্ম নিল; সত্যিই এখন আমার রাজত্বের সূচনা হতে যাচ্ছে। সাথে সাথে আমার মাথায় এ প্রশ্নও আসলো, ঘর আকৃতির এ বাহন চলবে কী করে? ভাবলাম, সালেহ নেই তো কি হয়েছে। আমার রব তো আমার সঙ্গেই আছেন, যিনি দুনিয়াতে আজীবন আমার সঙ্গ দিয়েছেন। হঠাৎ কোরআনে কারীমের বর্ণনার কথা আমার মনে হলো, জান্নাতে মানুষের সকল আশা 'সুবহানাল্লাহ' বললেই পূর্ণ হয়ে যাবে। আমি মৃদু আওয়াজে বললাম–
"সুবহানাল্লাহ!"

এর সাথে সাথেই ঘর আকৃতির এ বাহনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওপরে ওঠতে লাগল। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। সহসা আমি সশব্দে বলে ওঠলাম–
"বিসমিল্লাহি মাজ্‌রেহা ওয়া মুরসা-হা"

এটা ছিল হযরত নূহ আলাইহিস সালামের মুখনিঃসৃত বাণী, যা তিনি আল্লাহর আদেশে নির্মিত কিশতিতে আরোহণকালে বলেছিলেন। আমার বাহন ধীরে ধীরে এক দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আমি নীরবে মাথা ঝুঁকিয়ে নিচের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যগুলো উপলব্ধি করতে লাগলাম। আমাকে বহনকারী ঘরটি ধীরে ধীরে ওপরে ওঠছিল। মনে হচ্ছিল নিচে শীতসন্ধ্যার হালকা কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় অন্ধকার ছেয়ে গেল। এর সাথে সাথেই কাঁচের এ ঘরটি বাহারী রঙে আলোকিত হয়ে ওঠল, যে আলোর উৎস আমি কোথাও খুঁজে পেলাম না।

অন্ধকার ভেদ করেই আমার ভ্রমণ অব্যাহত ছিল। বাইরে দূর পর্যন্ত নিকষ অন্ধকার ছেয়ে ছিল। তবে এ অন্ধকারে ভয় শঙ্কা কিছুই ছিল না। এ অন্ধকার ও নীরবতার মধ্যেও এক অদ্ভুত প্রশান্তি ও আনন্দময় আবহ বিরাজ করছিল। মনে হচ্ছিল, শব্দহীন নীরব এক সাংগীতিক ঢেউ বইছিল, যা কানের বদলে মনের দুয়ারে আছড়ে পড়ে তার অস্তিত্বের জানান দিচ্ছিল। বাদ্যযন্ত্রহীন এক চিত্তাকর্ষক ধ্বনি পরিবেশটা মুখরিত করে রেখেছিল, যা কানের পর্দার পরিবর্তে অনুভূতির জানালা ভেদ করে মনের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে অন্তর্জগৎকে দোলা দিয়ে

যাচ্ছিল। পরিবেশটাকে অন্ধকার করে রাখার একমাত্র কারণ হিসেবে আমার যা বুঝে আসছিল, তা হলো, দূর দিগন্তে প্রদীপের মতো জ্বলতে থাকা আলোক-রশ্মির উজ্জ্বলতা আরো বাড়িয়ে তোলা। আলোক-রশ্মিটি একটি সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়া থেকে উৎসারিত ছিল। অন্ধকারের মধ্যে রশ্মিটি এতটা চমৎকার দৃষ্টিনন্দন দেখাচ্ছিল যে, দৃষ্টি সরাতে মন চাচ্ছিল না। আমি আবার ভাবলাম, এ অন্ধকারে দেখারই বা কী আছে! নিচের দৃশ্যগুলো যদি দেখতে পারতাম, তাহলে কী না মজা হত! আমি সুবহানাল্লাহ বলতেই অন্ধকার সরে গেল। নিচের সবকিছু আমি স্পষ্ট দেখতে লাগলাম।

নিচে ছিল দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত এক সবুজ-শ্যামল মাঠ, যার ঠিক মাঝখানে ছিল মরমর পাথরের সফেদ সুদৃশ্য একটি পর্বত। এটা কোনো পাহাড়ি সারির অংশ ছিল না। বরং এটি ছিল জমিনের বুক চিড়ে দাঁড়িয়ে থাকা খুঁটির মতো মরমর পাথরের ভিন্ন আঙ্গিকের একটি টিলা। পর্বতটি উপরে উঠে বর্শার মাথার মতো চিকন হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তবে পর্বতটির আশ্চর্যময়তা এখানেই শেষ হয়ে যায়নি; বরং পর্বতটির তীক্ষ্ণ এ মাথা ছিল সুবিশাল সুরম্য একটি প্রাসাদের ভিত্তিমূল, যে প্রাসাদটি নির্মিতই হয়েছিল পর্বতটির এ সরু মাথার ওপর। দৃশ্যটি আমার কাছে বাস্তবের চাইতে কোনো দক্ষ চিত্রশিল্পীর কল্পনার তুলিতে আঁকা এক অপূর্ব শৈলী বলেই মনে হচ্ছিল। কারণ, বিস্তৃত মাঠের বুকে এমন পাহাড়, পাহাড়ের এত সূক্ষ্ম চূড়া, এ সূক্ষ্ম চূড়ায় ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা এত সুবিশাল প্রাসাদ বাস্তবে পাওয়া অসম্ভব। তবে এ অসম্ভাব্য ছিল ফেলে আসা দুনিয়ার হিসেবে। এখন তো মানুষের পরীক্ষা আর প্রাকৃতিক বিধি-নিষেধের যে জগৎ তা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ নতুন এক জগতের জন্ম হয়েছে, যেখানে আমার রাজত্ব আছে আর আছি আমি। আমি ভাবলাম, মানবতার ইতিহাস হাজার লক্ষ বছরের পরিক্রমা শেষ করে এখন "একত্ববাদে"র নতুন ভুবনে পাড়ি জমিয়েছে, ফেরেশতাদের ব্যবস্থাপনায় সব অসাধ্য যেখানে সাধ্যের মধ্যে এনে দিয়েছে। এমন এক জগতের সৃষ্টি হয়েছে, যেখানকার অন্ধকার ভয়মুক্ত আর নীরবতা আশঙ্কামুক্ত। যেখানকার আঁধারে আছে আলোর আনন্দ। যেখানের নীরবতায় মিশে আছে বাদ্যযন্ত্রের হৃদয় আন্দোলিত করা ঢেউ।

আমার ইচ্ছায় আরো একবার অন্ধকার ছেয়ে গেল। অন্ধকারে আমার মন চাইল, জাহান্নামীদের অবস্থা একটু দেখে নিই। আমি 'সুবহানাল্লাহ' বলার সাথে সাথেই বাম পাশে নিচের দিকে একটি স্ক্রীন ভেসে ওঠল। তাতে যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল, তা ছিল অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। এটা ছিল জাহান্নামের মাঝখানের দৃশ্য। ভয়ঙ্কর চেহারার শক্তিশালী ফেরেশতারা উত্তপ্ত আগুনের মধ্যে কয়েকজন বীভৎস

চেহারার মানুষকে টেনে টেনে বাইরে বের করছিল। তাদের গলায় বেড়ি পরানো ছিল। আর হাত পায়ে বাঁধা ছিল ভারী ও কাঁটাবিশিষ্ট শিকল। চেহারার গোশত আগুনে ঝলসে গিয়ে ছিল। তাদের শরীরে ছিল আলকাতরা জড়ানো পোশাক। জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে পুড়ে তা তাদের শরীরে গোশত পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। প্রচণ্ড কষ্টে তারা চিৎকার করছিল। কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিল, একটি বার আমাদেরকে দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দাও! আর কখনো অবিচার করবো না, কুফরী করবো না, অন্যায়ের কাছে যাবো না। কিন্তু সেখানকার চিৎকার, কান্নাকাটি এবং দাঁত পেষণ সবই ছিল অর্থহীন।

এরপর জাহান্নামীরা পানির জন্য হাহাকার করতে লাগল। ফেরেশতারা তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে পানির ঝরনা সদৃশ উৎসের কাছে নিয়ে গেল। এখানের ফুটন্ত পানি থেকে ভাপ ওঠছিল। কিন্তু জাহান্নামীদের তীব্র তৃষ্ণা তাদেরকে এ পানি পানে বাধ্য করল। তারা টগবগ করতে থাকা পানি পান করছিল আর চিৎকার করছিল। পানি থেকে মুখ একটু সরিয়ে নিতেই তাদের তৃষ্ণা আরো বেড়ে যেত, যার ফলে গবাদি পশুর মতো আবারো এ পানি পানে বাধ্য হতো। বার বার এমন হতে থাকায় তাদের চেহারার চামড়া ওঠে গেল এবং ঠোঁট নিচের দিকে ঝুলে গেল। এ ভয়াল চিত্র দেখে নিজের অজান্তেই আমি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করলাম। আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করি, কারণ তিনিই আমাকে এ জঘন্য পরিণাম থেকে রক্ষা করেছেন। এ ভীতিকর দৃশ্য ভুলবার জন্যে আমি পাহাড়ের চূড়ায় নির্মিত আমার প্রাসাদের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। আমার বাহনটিও ওই প্রাসাদটির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মন চাচ্ছিল, প্রবেশের আগেই এখানে বসে বসে প্রাসাদটা একটু দেখে নিই। আমি আগের নিয়মে সুবহানাল্লাহ বললাম। সাথে সাথেই আমাকে বহনকারী ঘরটি সিনেমা হলে বদলে গেল। তবে স্ক্রীন শুধু সামনেই ছিল না। ডানে বামে এবং ওপরে সবদিকেই প্রাসাদের দৃশ্য থ্রীডি ফিল্মের মতো চিত্রিত হতে লাগল। আমি যেন প্রাসাদে অবস্থানের আনন্দ অনুভব করছিলাম। সব কিছু দেখছিলাম এবং শুনছিলাম।

এখানে ছিল আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন। পাহাড়ের উচ্চতায় আমার সুরম্য প্রাসাদটি জ্যোতির্ময় কোনো তীর্থস্থানের মতোই দেখাচ্ছিল। বাতিহীন আলোর বিচ্ছুরণ আর প্রদ্বীপহীন প্রকাণ্ড আলোকরশ্মি রাজপ্রাসাদটিকে যেন অন্ধকার সমুদ্রে আলোর দ্বীপ সদৃশ বানিয়ে দিয়েছিল। সব দিকেই ছিল এ আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ। আলোর চেয়ে রংধনুর বাহারী রংয়ের দ্যুতিই ছিল বেশি উপভোগ্য। যা চোখের জানালা ভেদ করে অনুভূতির জগতে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন আনন্দের খোরাক সরবরাহ করত। আলোর দ্যুতিও যে এতটা শোভনীয় হতে পারে, তা কোনো

চোখ কখনো অবলোকন করেনি। থেমে থেমে এখানে সংগীতের ঢেউ বয়ে যেত, যা হৃদয়ের গহীনে দোলা দিয়ে হাওয়ায় মিশে যেত। মিউজিকও যে মানুষকে এমন মোহাচ্ছন্ন করতে পারে, কোনো শ্রোতার তা কল্পনার অভিজ্ঞতাও কখনো হয়নি। বাতাসে শুধু সংগীতের ঢেউ-ই অনুরণিত হত না, সুমিষ্ট মৃদু সুবাসও পরিবেশ সুরভিত করে রেখেছিল। সুবাস সুরভি যে এমন আনন্দের উপাদান হতে পারে, তা কোনো দিন কারো কল্পনায়ও উদিত হয়নি।

বিশাল বিস্তৃত প্রাসাদের উঠানে খাদেমদের ছুটোছুটির দৃশ্য ছিল ছিটানো মুক্তোদানার মতো। তাদের চেহারার দীপ্তি, পোশাকের সৌন্দর্য, কথার হৃদয়গ্রাহিতা এবং চলা-ফেরার উদ্যমী ভাবভঙ্গি ছিল আকর্ষণীয়, মোহময়। এসব খাদেমদের অবস্থানস্থল ছিল প্রাসাদের এক কোণায় তৈরি প্রশস্ত উদ্যানে। উদ্যান বলতে কী, তাতে ছিল সবুজের সমারোহ, রকমারি ফুল আর সারি সারি গাছের বিন্যস্ত স্থাপন যার সামনে যে কোনো পরিকল্পিত সাজানো বাগানের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যাবে। ছড়িয়ে থাকা হাজারো রং বাগানে শোভা পাচ্ছিল। শুধু সবুজেরই এত বিচিত্র রূপ যে, গুণে শেষ করা যেত না। উঁচু উঁচু গাছ আর তাতে থোকায় থোকায় ঝুলে ছিল অগণিত প্রজাতের ফল। প্রতিটি গাছের পাতায় পাতায় ছিল রঙের বাহার। হাজারো প্রজাতির বৃক্ষচারার শোভা ছিল রং-বেরংয়ের ফুল-কলি। এসবের বিন্যাসে কোনো ত্রুটি ছিল না। বরং এ সকল বৃক্ষচারা এবং ফল-ফুলের সৌন্দর্যের আসল রহস্যই ছিল এগুলোর পরিকল্পিত বিন্যাস এবং পরিমিত ছাঁট। উদ্যানটিকে তুলনা করা যায় রুচিশীল একজন কবির হৃদয়ছোঁয়া কোনো কবিতার সাথে, যাতে বর্ণমিল, শব্দমিল ও ছন্দমিল ঠিক রেখে কিছু বিক্ষিপ্ত শব্দকে এক সুঁতোয় গাঁথার শিল্পকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে অত্যন্ত সুচারুরূপে। সুন্দর মনোরম এ উদ্যানের সৌন্দর্য অসম্ভব পর্যায়ে উন্নীত করেছিল এর পরিকল্পিত রাস্তা ও মেঠোপথ, যাতে বিছানো ছিল ইয়াকুত, মুক্তোদানা ও যামরাদ, নীলাম এবং ফিরোজের মতো উৎকৃষ্ট পাথরকণা। আরো ছিল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার মতো উদ্যানের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর শোভা এবং তার শ্রুতিমধুর কলকল ধ্বনি। এ নদীগুলোর কোনোটা দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল স্ফটিক সাদা দুধ, কোনোটায় মিশ্রণমুক্ত ঝাঁজানো পানি, কোনোটায় আবার ছিল টকটকে লাল শরবতের স্রোতধারা, আর কোনোটায় দৃষ্টি কাড়ছিল প্রবহমান মধুর ঢেউ। প্রতিটি নদীই এক একটি স্বতন্ত্র সুবাস বিলিয়ে যাচ্ছিল, যা পাশ দিয়ে যাওয়া পথিককে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলত। নদীর তীরে, গাছের নিচে বসার জন্যে রাখা ছিল হীরা-জাওহারখচিত বেঞ্চ, রাজকীয় সোফা আর পুরু গালিচা এবং আরামদায়ক চেয়ার।

সুন্দর শিল্পসাজ, মনজুড়ানো নদী, দৃষ্টিনন্দন রং-বেরংয়ের ফুল, সুদর্শন পত্র-পল্লব আর সুস্বাদু ফলে সমৃদ্ধ উদ্যানটির চতুর্দিক ছিল খোলা। এখানে গভীর কিন্তু অত্যন্ত মনোলোভা শৈত্যপ্রবাহ বিরাজমান ছিল। মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপটা এসে নতুন কোনো সুগন্ধিতে এ শৈত্যপ্রবাহকে সুরভিত করে তুলত। বাগানের বাইরে দূর পর্যন্ত সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বাইরে যে গাঢ় অন্ধকার সব কিছু গিলে ফেলছিল, বিস্ময়করভাবে এখানে তার কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। বহু দূর পর্যন্ত একটি অভিজাত শহরের উঁচু উঁচু দালান-কোঠা আর তাতে দীপ্তি ছড়ানো আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছিল, রাতে চমকানো জোনাকির দৃশ্যের সাথে যার তুলনা করা যায়। আকাশেও ছোট ছোট বহু নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছিল, যার রূপসী আলো অন্ধকার আকাশের সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। স্ক্রীনের এক কোণায় চমকানো একটি আলোকরশ্মি ধীরে ধীরে প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমার মনে হলো, এটিই মূলত আমার বাহন। ভেতরে বসেও আমি যার প্রাসাদ অভিমুখী যাত্রার বহির্দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। তা একমাত্র আল্লাহর কুদরতের অপার মহিমা।

বাগানের এক কোণায় আমি সালেহকে বসে থাকতে দেখলাম। মনে মনে বললাম, বান্দা আমার আগেই পৌঁছে গেছে। সে যেখানে বসে ছিল, তা ছিল বাগানের সবচে' সুদৃশ্য জায়গা। তার আশপাশের জমিন ছিল স্বচ্ছ কাঁচের মতো। এতটাই স্বচ্ছ ছিল যে, গভীর নিচ পর্যন্ত সব কিছু অনায়াসে দেখা যাচ্ছিল। ভূগর্ভে সূর্যডুবা সন্ধ্যার মুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল, যাতে গাঢ় সবুজ ঘাস আর রং-বেরংয়ের ফুলে ছেয়ে থাকা মাঠ এবং তার মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর দৃশ্য অত্যন্ত চমৎকার দেখাচ্ছিল।

নিচে অত্যন্ত সুন্দর একটি সন্ধ্যার দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। আর আশপাশে ছিল সৌরভময় আলো ঝলমলে একটি রাতের দৃশ্য। নিচে ছিল প্রবহমান নদী, ওপরে ছিল ফলের ভারে নুইয়ে পড়া গাছের ডাল। পছন্দের ফলটি উপহার দেওয়ার জন্যে যা ইঙ্গিত পেয়ে নিচে নামার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। কয়েকজন খাদেম এক কোণায় বসে জ্বলন্ত আগুনে পশু-পাখির সুস্বাদু গোশত ভুনা করার কাজে ব্যস্ত ছিল। আর এখান থেকে ছড়িয়ে পড়া লোভনীয় ঘ্রাণ এক না-মেটা স্বাদ ও অপূরণীয় ক্ষুধার বার্তা দিয়ে যাচ্ছিল। কাঁচের মতো স্বচ্ছ রৌপ্য-পেয়ালা ও গ্লাস পাশেই সাজানো ছিল। যেন অপেক্ষা শুধু অনুষ্ঠান শুরুর, কাঙ্ক্ষিত খাবার পানীয় পরিবেশন আর মনিবের চাহিদা মেটানোর জন্যে তারা একদম প্রস্তুত।

আমি এসব দৃশ্য দেখায় একেবারে বুঁদ হয়ে পড়েছিলাম। আর আমার প্রবল অনুভূতি জাগছিল, এসবের কিছুই আমার অপরিচিত নয়। আমার স্পষ্ট মনে

পড়তে লাগল, এসব দৃশ্য তো আমি কবর জীবনেই দেখে এসেছি। ইতিমধ্যেই আমি বুঝতে পরলাম, আমার বাহনের গতি ক্রমশ মন্থর হয়ে আসছে। আমার ইঙ্গিতে স্ক্রীনটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার বাহনটিও লক্ষ্যে পৌঁছে যাচ্ছিল। উপর থেকে আলো ঝলমলে প্রাসাদটি এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, আমার মন চাচ্ছিল এখানে চলার গতি থামিয়ে দৃশ্যটি উপভোগ করতে থাকি। দৃশ্যটির আনন্দ উপভোগের জন্যে আমি প্রাসাদের চতুর্দিকে কয়েকটি চক্কর লাগালাম। আমার মনে হলো, সালেহ নিচে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘর সদৃশ আমার কাচের বাহনটি ঠিক সেখানেই অবতরণ করলো, যেখানে সালেহ দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে বের হতেই সশব্দ হাসিতে সালেহ আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললো "আমার মনে হচ্ছিল, প্রাসাদটিকে আরশ মনে করে তুমি প্রদক্ষিণ করছ। সাত চক্কর যে লাগাওনি তাও ভালো।"

তার এ সরস মন্তব্য শুনে আমি নিজেও তার হাসিতে অংশ গ্রহণ করে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। সে আমার থেকে আলাদা হয়েই বললো–

"আগে প্রাসাদ পরিদর্শন করবে, না খানা খাবে?"

"আমি তো আমার বাসস্থানের সৌন্দর্যে বিস্মিত হয়ে গেছি। আমি ভেবেই পাচ্ছি না যে, সৃষ্টি এমন সুন্দর হতে পারে!"

"আব্দুল্লাহ! এ তো হলো কেবল সূচনা। এখন থেকে নিয়ে মহা সম্মেলনের আগ পর্যন্ত আপনি যা দেখবেন, কোরআনের ভাষায় তা হলো 'নুযূল'। অর্থাৎ, আতিথেয়তার প্রাথমিক বিষয় এগুলো। এর পর যা কিছু পাবে, তা না কোনো কান কখনো শুনেছে, না কোনো চোখ দেখেছে, আর না কোনো অন্তরে এর কল্পনা জেগেছে।" "তুমি সত্যিই বলছো। এ সব বিষয় কোরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। তবে জান্নাতের দৃশ্য ব্যতিক্রম পেয়েছি। অর্থাৎ, যেমন বলা হয়েছে, তারচে' আরো বহুগুণ বেশি সুন্দর।"

"এর কারণ হলো, কোরআনে বর্ণিত বিবরণসমূহের পেছনে রয়েছে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালে আরবদের কল্পনায় আসা ভোগ-বিলাসিতার সর্বোচ্চ উপমা। অর্থাৎ, আরবরা যে জিনিসগুলোকে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি বলে মনে করত, তারই আলোকে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জান্নাতের নেয়ামতরাজিকে যে এসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করবে, তার চেয়ে নির্বোধ আর হয় না।"

"ঠিক বলেছ। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় তো আরবরা এমন অনেক নেয়ামতের কথা কল্পনায়ও আনতে পারত না, যা আমাদের সময়ে আবিস্কৃত হয়েছিল। কোরআনে কারীম তো আরবদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কৃষি নির্ভর যুগের

উপকরণ ও বিলাস সামগ্রীর মানচিত্র এঁকেছিল। কিন্তু ভাই! আমি যে বাহনে করে এলাম, তার কাছে তো আমার কল্পনা শক্তিও পরাজিত।"

"এমন বিস্ময়কর আরো অনেক কিছুই তুমি এখন দেখতে থাকবে। আগে বলো এখন করবে কী?"

আমি তার কথা শুনেও না শোনার ভান করলাম। আশপাশে ছড়িয়ে থাকা সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে ডুবে গেলাম। এক এক করে মনমাতানো চোখ জুড়ানো সব বস্তু ও দৃশ্য আমি গভীরভাবে দেখতে লাগলাম। সালেহ আমার তন্ময়তা দেখে রসিক ভঙ্গিতে বললো–

"তুমি মনে হয় হুরদেরকে তালাশ করছ। তারা তোমাকে অভিবাদন জানানোর জন্যে বাইরে এসেছিল। এখন সবাই আপন আপন জায়গায় ফিরে গেছে। তবে তুমি চাইলে......"

আমি তাকে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে শান্তভাবে বললাম–

"আমাদের সময়ে দু'জন দার্শনিক পণ্ডিত ছিল। একজন হলো, কাল মার্কস। তার দর্শন ছিল 'পেট'-ই মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। আর একজন হলো দার্শনিক ফ্রাইড, তার...... ।'

কথা শেষ না করেই আমি কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেলাম। সালেহ উদ্দাম হাসিতে ফেটে পড়ল। ভুনা গোশতের লোভনীয় ঘ্রাণে আমার জিভে পানি এসে গেল। আমি বললাম– "এ মুহূর্তে আমি কিছুক্ষণের জন্যে কাল মার্কসকে অনুসরণ করতে চাচ্ছি।"

দুনিয়াতে মানুষ ছিল সময়ের গোলাম। মিনিট, ঘণ্টা, দিন এবং মাসের পরিক্রমায় সময়ের চাকা আগে বাড়ত। প্রহর ঋতুর ব্যবধানে সময়ের প্রস্থান বুঝে আসত। কিন্তু এ জগতে সময় মানুষের গোলাম, মানুষ হলো সময়ের মনিব। মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর, যুগ ও শতাব্দীর হিসাব শেষ। অতীত জীবনের মতো কালের আবর্তন-পরিক্রমাও গত হয়ে গেছে। সময় ও কালের প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে শুধু প্রহর এবং ঋতুই বাকি ছিল। আর তাও আমাদের পরিপূর্ণ অনুগত হয়ে। মানুষের ইচ্ছায় সব সময়ের জন্যে কোথাও সকালের মিষ্টি রোদ ছেয়ে থাকত। কোথাও দুপুরের প্রখরতা, কোথাও সূর্য ঢলে যাওয়া দিনের ভ্যাপসা গরম, কোথাও সন্ধ্যা বেলার ডুবন্ত সূর্যের দিগন্ত বিস্তৃত লালিমা, কোথাও শেষ রাতের গাঢ় অন্ধকার নীরবতা, কোথাও উষার উজ্জ্বল আভা, কোথাও পূর্ণিমার চাঁদনি রাত, কোথাও তারা ভরা রাত। কোথাও সবুজাভ বসন্ত। কোথাও হৈমন্তিক মনোলোভা রূপ। জান্নাতীদের অবস্থানস্থলের ঋতু

যদিও সহনীয় এবং আরামদায়ক থাকত, কিন্তু মানুষের চাহিদা পূরণের জন্যে কোথাও কোথাও যেমন ছিল শ্বাসরুদ্ধকর শীত, তেমনি ছিল মরু-তাপ। আবার কোথাও ছিল বর্ষাকালের মেঘলা পরিবেশ, আর কোথাও বসন্ত ও হেমন্তের আমেজ। এক কথায় যা মন চাইত, মানুষ যা কামনা করত, মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যে সেই প্রহর ও ঋতু উপভোগের আয়োজন হয়ে যেত।

আমি এক বিশাল সাম্রাজ্যের একক অধিপতি হয়ে গিয়েছিলাম। যা অন্যের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সালেহ এ নতুন স্বপ্নীল ভুবনেও সর্বদা আমার সঙ্গী হিসেবে ছিল। সালেহ আমাকে বলেছিল, এ সাম্রাজ্যও এক সময় বিশ্বজগতের অধিনে পরিচালিত হত। নতুন এ ব্যবস্থাপনায় এগুলোর বণ্টন হয়েছে এভাবে যে, জান্নাতীদের বসবাসও এ জমিনেই ছিল, যেখানে লাখ লাখ বছর পর্যন্ত মানুষদেরকে পরীক্ষা করা হত। জান্নাতীদের মধ্যে দু'টি শ্রেণি ছিল। একটি সাধারণ, অপরটি ভি আই পি। সাধারণ বা স্বল্প আমলবিশিষ্ট লোক ছিল তারা, যাদেরকে পুরস্কার হিসেবে এক বা একাধিক গ্রহের অধিকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গ্রহগুলো তখন আর আগের মতো আগুন ও অন্ধকার রাজ্য ছিল না। সেগুলো মনোলোভা উদ্যান এবং আলোকময় উপত্যকায় বদলে গিয়েছিল।

ভি আই পি-রা ছিল জান্নাতের শাসক শ্রেণি। তাদের মধ্যে শহীদ ও সিদ্দীকগণ ছিলেন। তাদেরকে লক্ষ কোটি গ্রহ নিয়ে গঠিত বিশাল জগতের আধিপত্য ও রাজত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমিও এমন এক রাজত্বের অধিপতি ছিলাম। এর উপর পর্যায়ে ছিলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম। তারা তো ছিলেন অগণিত জগৎ সমষ্টির মহা নায়ক।

এখনো বিষয়টি রহস্যপূর্ণই ছিল, কে কোন জায়গার রাজত্ব পাবে। সেখানে তার কাজ কী হবে। সালেহ আমাকে বললো, দরবারের দিন আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই বলে দিবেন। ঐ দিনই প্রত্যেককে তার রাজত্ব আনুষ্ঠানিকতার সাথে অর্পণ করা হবে। অস্থায়ীভাবে তখন পর্যন্ত সকলেই জমিনে অবস্থান করছিল। সালেহ বললো, তারা এখন যে নেয়ামত পাচ্ছে, তা হলো তাদের প্রাথমিক আতিথেয়তা। প্রধান প্রধান নেয়ামত না কোনো চোখ দেখেছে, না কোনো কান শুনেছে, না কোনো অন্তরে তার কল্পনা এসেছে। এ সব তারা দরবারের পর থেকে পাওয়া শুরু করবে। যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সম্মান ও পদমর্যাদার ঘোষণা হবে। অবশ্য তাদের এখনকার প্রটোকলও তাদের মানের বিচারেই দেওয়া হচ্ছিল।

এ সব প্রটোকলের তারতম্য বুঝে আসত ঐ সব মজলিস ও অনুষ্ঠানে, যা জান্নাতীগণ একে অন্যের সম্মানে আয়োজন করতেন। যদিও জান্নাতীরা কেউই এখন পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেনি; কিন্তু তাদের স্বাভাবিক জান্নাতী জীবন-যাত্রার সূচনা হয়ে গিয়েছিল। পেছনে হাশরের মাঠে শুধু এতটুকু হত, পালাক্রমে নেককারগণ জান্নাতে প্রবেশ করতেন। এখানকার সময় ছিল স্থির। তাই দু'জন জান্নাতীর জান্নাতে প্রবেশের মাঝে অগণিত বছর ও শতাব্দীর ব্যবধানও হয়ে যেত। আমার অনুমানও এমনই ছিল যেমনটা সালেহ নিজেও সত্যায়ন করেছে যে, দরবার ঐ দিনই অনুষ্ঠিত হবে, যেদিন সকল জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে পৌঁছে যাবে। এটা ছিল জান্নাতী জীবনের শুভ সূচনা। এর ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ আচার অনুষ্ঠান আয়োজন হত। বেশিরভাগ সময় আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের নিজেদের এবং অন্য নবীর অগ্রগামী নেককারদের সম্মানে এসব আয়োজন করতেন।

এ সকল অনুষ্ঠানে অনেক মানুষের সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ হতো। দুনিয়াতে যদিও আমি খুব অল্প মানুষের সঙ্গেই মিশতাম। কিন্তু জান্নাতে আসার পর অনুভব করলাম, অভ্যাস বদলে আমি এখন বেশ সামাজিক এবং মিশুক হয়ে ওঠেছি। আর এজন্যই আমার বন্ধুতালিকায় নতুন নতুন মানুষ যুক্ত হচ্ছে। মানুষের বর্তমান অবস্থা এবং অতীত জীবন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে লাগলাম। প্রথম পর্যায়ে সফলতা অর্জনকারীদের বেশিরভাগ লোককেই দেখছিলাম তারা দুনিয়াতে ছিল গরিব এবং বিপন্ন অবস্থার শিকার। বিষয়টি যদিও আমার জন্যে অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল না। কিন্তু তার পরও একটা বিস্ময়বোধ আমার মধ্যে কাজ করছিল। দুনিয়ার জীবন অনেক দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়েই তাদেরকে কাটাতে হয়েছে। কিন্তু সব সময় তারা ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছে। আমি একটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষ্য করলাম, যারা প্রথম পর্যায়ে সফলতা অর্জন করেছে তাদের সবার জীবনে একটি জিনিস সমানভাবে বিদ্যমান। তারা সকলেই ছিল ধৈর্যশীল। সঙ্কটপূর্ণ সময়েও তারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করেছে। নিবেদন ও আত্মসমর্পণ এবং আস্থা ও ভরসার আঁচল কখনো তারা ছাড়েনি।

জীবন যেদিন শুরু হবে

জান্নাতের এ স্বপ্নীল ভুবনে আমার পরিচিত অনেকেই আসছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছিল। তাদের মধ্যে আমার আহ্বানে জীবনের বাঁক পরিবর্তন করে ঈমান ও উন্নত ইসলামী চরিত্রের উচ্চতায় পৌঁছে যাওয়া লোকেরাও ছিল। আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত করার সংগ্রামে আমার সহযোগী বন্ধুরাও ছিল। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে মনে হত, জীবনে আনন্দ ও ভালোবাসার নতুন দুয়ার যেন খুলে গেলো। তবে এখনো পর্যন্ত তার দেখা পাচ্ছিলাম না, অধীর হয়ে আমি যার অপেক্ষা করছিলাম। যদিও এ অপেক্ষায় কষ্ট বলতে কিছু ছিল না, ছিল ব্যতিক্রম এক আনন্দ ও পুলক। হঠাৎ একদিন....
আসলে এ নতুন ভুবনে রাত দিন বলতে কিছু ছিল না। সালেহ এসে বললো–
"আব্দুল্লাহ! তোমার জন্যে একটি দুঃসংবাদ আছে।"

আমি অবাক হলাম, জান্নাতে আবার কোন দুঃসংবাদ আমাকে শোনাবে! তার ভাবভঙ্গির কারণে বাধ্য হয়েই আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম–
"কেন ভাই! এখানকার কোন সংবাদটি অশুভ হতে পারে?"
"আব্দুল্লাহ! দুঃসংবাদ হলো, তোমার আয়েশের দিন শেষ। নাঈমার অবর্তমানে অনেক দিন পর্যন্ত তুমি স্বাধীন ছিলে। এবার নাঈমা আসছে, তোমার তদারকি করতে থাকবে।"

"সত্যি?" প্রবল আবেগের কাছে পরাজয় বরণ করে আমি তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম।
"আমি কি মিথ্যা বলতে পারি?"
এরপর সে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো–
"আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তো নাঈমার আগমনের সুসংবাদদাতা মাত্র। আমি তো আর নাঈমা নই।"

"তা তো তুমি হতেও পারো না।" আমি তাকে ছেড়ে দিয়ে বললাম।
"এমন আনন্দের খবর তুমি এত কঠোর ভঙ্গিতে কেন শোনালে, তার কারণ তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। নাঈমা থেকে যদি তুমি এমন কিছুই আশা করে থাকো, তাহলে তোমাকে অবশ্যই নিরাশ হতে হবে। বাদ দাও এসব। নাঈমার আগমনে আমি তাকে শ্রেষ্ঠ কোনো উপঢৌকন দিতে চাই।"
"কী উপঢৌকন দিতে চাও?"
"অসম্ভব সুন্দর একটি বাড়ি।"

"আরে ভাই! তুমি তো তোমার বাড়ি পেয়ে গেছ। আর সে-ও তার নিজস্ব বাড়ি পাবে। নতুন এ জগতে তো আর পারিবারিক ব্যবস্থা থাকবে না যে, স্বামী হিসেবে তোমার তাকে বাড়ি বানিয়ে দিতে হবে। আর সে বসে বসে তোমার সন্তান প্রতিপালন করতে থাকবে। তাহলে বাড়ি বানানোর প্রয়োজন কী?"

"আমি জানি, প্রত্যেক জান্নাতীরই নিজস্ব বাড়ি থাকবে, থাকবে বিশাল রাজত্ব। তবু আমি নাঈমার জন্যে একটি বাড়ি বানাতে চাই, আমার রাজ্য-সীমায়। আমি তাকে বাড়িটি গিফ্ট করবো।"

"তুমি কি ভুলে গেছ, আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলেছেন?" সে আমাকে নিরুত্তর করতে চাচ্ছিল।

"জান্নাতে শয়তান আসতে পারবে না বলে তার কিছু চেলাচামুণ্ডা তো অবশ্যই থাকবে। যারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসার পরিবর্তে দূরত্ব সৃষ্টির জন্যে তৎপর থাকবে।" আমি তার দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কৃত্রিম রাগের সুরে বললাম–

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" সে হাত জোড় করে বললো–

"আমাকে বলো, তুমি কী করতে চাও?"

এরপর আমি তাকে আমার প্লান সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলাম। আমার কথা শেষ হতেই সে বললো–

"চলো, বাড়িটি দেখতে চলো।"

আমি অবাক হয়ে বললাম–

"মানে? বাড়ি কি তৈরি হয়ে গেছে?"

"তুমি কি ভেবেছ এখনো তুমি দুনিয়াতেই আছ যে, প্রথমে জায়গা প্রস্তুত করতে হবে, প্লান-পরিকল্পনা মঞ্জুর করাতে হবে, নির্মাতা প্রতিষ্ঠান খুঁজতে হবে, তারপর বাড়ি তৈরিতে কয়েক মাস লেগে যাবে!"

.....

আমরা বিশাল বিস্তৃত সমুদ্রের বুক চিরে সামনে চলছিলাম। আমি আর সালেহ সামুদ্রিক জাহাজ জাতীয় কোনো নৌ-যানের আরোহী ছিলাম। সালেহের কথা মতো ভ্রমণের এ মাধ্যম গ্রহণ করেছিলাম। সালেহ বলেছিল, জান্নাতের বাড়ি যত সুন্দর হয়, তাতে পৌঁছার পথ হয় আরো সুন্দর। এটা ঠিক যে, দুনিয়াতে নৌ-ভ্রমণে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু এ ভ্রমণটি ছিল ব্যতিক্রম। নৌযানটি ছিল ভাসমান একটি দালানের মতো। আমরা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। মুগ্ধকর আবহাওয়ায় মৃদু বাতাসের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের গন্তব্যের পথে অগ্রসর হচ্ছিলাম।

আমাদের গন্তব্য ছিল একটি পাহাড়ি দ্বীপ। যাতে নাঈমার জন্যে তৈরি করা হয়েছে একটি সুরম্য প্রাসাদ। প্রাসাদটি ঠিক তেমনি ছিল যেমন আমি সালেহকে বর্ণনা দিয়েছিলাম। সমুদ্রের মাঝখানে এক বিশাল বড় দ্বীপ হবে। যেখানে থাকবে সবুজবেষ্টিত পাহাড়, নদী-নালা ঝরনাধারা। সমুদ্রের সাথে সাথে চলতে থাকবে পাহাড়ি রাস্তা। সবুজ-শ্যামল ঘাসে ভরা মাঠ-প্রান্তর। আর এসব কিছুর মাঝে থাকবে একটি প্রাসাদ সদৃশ রাজকীয় বাড়ি। যার জমিন হবে স্বচ্ছ হীরার, হীরার মতো জ্বলজ্বলে আর কাঁচের মতো স্বচ্ছ। যার স্বচ্ছতায় নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া পানির স্রোত আর তাতে সাঁতরে বেড়ানো রং-বেরংয়ের মাছ স্পষ্ট দেখা যাবে। দেয়াল হবে স্বচ্ছ রুপার। বাইরের সব দৃশ্য উপভোগ করা যাবে ভেতরে বসেই। সুউচ্চ ছাদ হবে স্বর্ণের। ছাদে থাকবে মুক্তা, জওহর এবং দামি দামি পাথর-কণার মিশেল। প্রাসাদটি হবে কয়েক তলা বিশিষ্ট। যার উচ্চতা আশপাশের পাহাড়ের উচ্চতা ছাপিয়ে যাবে। যার প্রতি তলায় ফুটে উঠবে প্রকৃতি এবং তার শিল্পকর্মের নতুন নতুন রূপ।

এখানে এসে আমি যা দেখলাম, আমার বর্ণনা ও কল্পনার চেয়েও তা অনেক সুন্দর। হয়তো তার কারণ, আমার ক্ষুদ্র শব্দভাণ্ডার এসব নেয়ামত বর্ণনার জন্যে যথেষ্ট ছিল না। আমি তো একটি প্রাথমিক ধারণা মাত্র দিয়েছিলাম। আমার এ প্রাথমিক ধারণার সাথে যে সুন্দর ডিজাইন, আস্তর-রং, আলোকসজ্জা আর যেসব সৌন্দর্য যুক্ত হয়েছিল, তা আমার বর্ণনা ও কল্পনা থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে। সালেহ আমার বর্ণনাকে প্রাসাদের মৌলিক পরিকল্পনা হিসেবে রেখেছে। আর তার ওপর যে প্রাসাদ দাঁড় করিয়েছে, তা ছিল নির্মাণশিল্পের এক অপূর্ব শৈলী। কল্পজগতের যেকোনো প্রাসাদের চেয়েও আরো আকর্ষণীয়। প্রাসাদটি এত বিশাল ছিল যে, পুরোটা একবার দেখতে গেলেও অনেক সময়ের প্রয়োজন। আমি সালেহকে বললাম–

"আমি সন্তুষ্ট, পুলকিত। এখন আমরা চলে গেলে কেমন হয়? নাঈমা আসলে ওকে নিয়েই.... ।"

আমি এতটুকু বলতেই সংগীতের তালে তালে একটি মিষ্টি সুর ভেসে এলো–

"কিন্তু আমি যে এসে গেছি।"

পেছনে ফিরে আমি অবাক বিস্মিত চোখে তাকিয়েই থাকলাম। এটা কি নাঈমা, না অন্য কেউ? হাশরের মাঠে নাঈমাকে যুবতী এবং বেশ সুন্দর দেখে ছিলাম। কিন্তু এখন আমার সামনে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল, তার বিবরণ পেশ করার জন্যে সুন্দর, মায়াবী, আকর্ষণীয়া, অপরূপা, ভরা যৌবনা, সুদর্শনা জাতীয় সব

শব্দ ছিল অর্থহীন। আমি এমনই বিস্ময়ের জগতে ছিলাম। হঠাৎ সালেহের কণ্ঠ ভেসে এলো–

"নতুন করে আবার দু'জনে পরিচিত হয়ে নাও।

মুহতারাম! সে হলো জনাব আব্দুল্লাহ। আর জনাব! ইনি তোমার নাঈমা। আমি জানি, তোমরা আজ একে অপরকে পেয়ে অত্যন্ত খুশি।"

"কিন্তু তুমি আগে বলোনি কেনো যে, নাঈমা এখানেই থাকবে?" আমি কিছুটা রাগত ভঙ্গিতেই সালেহের দিকে তাকিয়ে বললাম।

নাঈমা সালেহের সাফাই গেয়ে বলে ওঠলো–

"আমি তাকে বলতে নিষেধ করেছিলাম। আপনাকে সারপ্রাইজ দিতে চাচ্ছিলাম।"

"সেও কিন্তু তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিল। তুমি কি খেয়াল করেছ, কী অসাধারণ একটি বাড়ি সে তোমার জন্যে বানিয়েছে?"

"তা তো দেখছিই। কিন্তু আমি আমার চোখের দেখা বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"আর আমারও তো চোখের দেখা বিশ্বাস হচ্ছিল না।" আমি নাঈমার দিকে তাকিয়ে বললাম। এরপর সালেহকে লক্ষ্য করে বললাম–

"তোমার তো আর বেগম নেই। বিদায় হবার তো কিছু নেই?"

সে হাসতে হাসতে উত্তর দিল–

"আমি দুনিয়াতেও সর্বদা তোমাদের সাথে ছিলাম। এখনো আমি সব সময় তোমাদের পাশেই থাকতে চাই।"

"কিন্তু ভাই, তখন তো আর তোমাকে দেখতাম না।"

তীর্যক ভঙ্গিতেই সে তখন বললো–

"এটা এখনো সম্ভব যে, আমি তোমার থেকে অদৃশ্য হয়ে যাব।"

এটা বলেই সে আমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। এরপর শুধু তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল–

"ঠিক তো?"

"না, না ভাই! এটা চলবে না।" নাঈমা চট করে বলে ফেলল।

সালেহ আমাদের সামনে দৃশ্যমান হলো। তাকে দেখে নাঈমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো–

"প্রতিশ্রুতি দাও, যখন আসবে, মানুষের মতো আসবে। যখন প্রস্থান করবে, তখনো মানুষের মতো করবে।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে, মানলাম।" মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে সে উত্তর দিল। কিন্তু তখনো তার চোখে মুখে রীতিমত দুষ্টুমি জ্বলজ্বল করছিল। নির্দোষ ভঙ্গিতে সে বললো–

"সমস্যা হলো, আমি যে মানুষ নই। মানবীয় রীতি-নীতি তাহলে আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে কীভাবে?"
"ধরে নাও, আমার দৌড় তোমার মনিব পর্যন্ত। আমার এক অভিযোগেই তো তিনি তোমাকে প্রকৃত মানুষ বানিয়ে দিতে পারেন।" আমি হাসতে হাসতে বললাম। সেও একই রকম মধু মিশিয়ে বললো–
"বন্ধু, ভয় দেখানোর কি আছে! যাও, আমি ওয়াদা করছি, আমি যখনই আসব বা যাব, তোমার অনুমতি নিয়েই করবো। তুমি বললে আমি এখনই চলে যাচ্ছি।"
এটা বলেই সে পেছনের দিকে ঘুরে গেল। দু'চার কদম গিয়েই আবার ফিরে এসে নাঈমাকে বললো–
"আসলে আমার চলে যাওয়ায় কিছু আসে যায় না। কারণ, তোমাদের সন্তানরা সবাই এখানে এসে গেছে। তাদের সিদ্ধান্ত, আমাদের মা-বাবার বিবাহ আমরা নিজেরাই করাব। এরপরই তুমি সরদার আব্দুল্লাহর ঘরে আসতে পারবে।"
"সালেহ একদম ঠিক বলেছে।" লায়লা ভেতরে আসতে আসতে উচ্চ আওয়াজে বললো। তীরের গতিতে ছুটে এলো আমার কাছে। তার পেছনেই ছিল আনোয়ার, জমশেদ, আলিয়া ও আরিফা। তাদেরকে দেখে আমার আনন্দ বহুগুণ বেড়ে গেল। আমি সবাইকে স্বস্নেহে গলায় জড়িয়ে নিলাম। কুশল বিনিময়ের পর্বটি শেষ হতেই নাঈমা কিছুটা রাগত স্বরে বললো-
"এটা কেমন ছেলেমানুষী করতে চাচ্ছ, আবার আমাদের বিবাহ করিয়ে দিবে?"
আলিয়া বললো–

"আম্মি, দুনিয়ার যাপিত জীবনে আমরা কেউই আপনার বিবাহে উপস্থিত ছিলাম না। তাই আমাদের ভাই বোন সবার সিদ্ধান্ত হলো, জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আবার আপনাদের বিবাহ করাব। আমরা নিজেরাই আপনাকে নববধূ সাজিয়ে বিদায় দিব। তার আগ পর্যন্ত আপনি আব্বুর সঙ্গে পর্দা করে চলবেন।"
কথার মাঝখানে আনোয়ার বলে ওঠলো–
"পর্দার বিষয়টি অনেক কঠিন হয়ে যায়। এতটুকু শর্তারোপ করতে পারো যে, তারা একান্তে মিলিত হতে পারবে না।"
"তোমার এ অনুগ্রহের জন্যে ধন্যবাদ। এখন বলো, বিবাহ কবে হবে?" নিরুপায় হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"যখনই প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যাবে।" আরিফার সরল শান্ত উত্তর।
"প্রস্তুতি কী কী আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"আমি বলছি।" লায়লা বলে ওঠলো।

"জায়গা তো এটা ঠিক আছে। শুধু পোশাক-পরিচ্ছদ আর অলংকারাদি ব্যবস্থা করতে হবে।"

"আমারও একটু ভালো কাপড় নিতে হবে...আব্বুর মতো। আব্বুর কাপড়গুলো দেখার পর আমার কাপড়গুলো তো ভালোই লাগছে না।" জমশেদও নিজের কিছু দাবি পেশ করল।

"আচ্ছা, এসব তৈরি হলেই তো বিয়ে হয়ে যাবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না হওয়ার কিছু নেই।" সবাই একত্রে বলে ওঠলো।

"তাহলে এখনই চলো। আমি তোমাদেরকে জান্নাতের সবচে' বড় শপিং এরিয়ায় নিয়ে যাচ্ছি। এমনিতে তোমরা সেখানে প্রবেশের অনুমতিই পাবে না। আজ আমার পক্ষ থেকে ইচ্ছে মতো শপিং করে নাও।"

এতে বাচ্চারা সবাই আনন্দধ্বনি দিয়ে ওঠলো। এরপর আমরা শপিং-এর জন্যে রওয়ানা হলাম।

এটা ছিল সম্পূর্ণ 'আলিফ লায়লা'র মতো এক ভিন্ন জগৎ। ইতঃপূর্বে আমি বার কয়েক সালেহের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। প্রত্যেক বার এসে নতুন নতুন জিনিস দেখতাম। এ জায়গাটির জন্যে শপিংমল, ট্রেডসেন্টার জাতীয় সকল শব্দই অর্থহীন। শত শত মাইল বিস্তৃত এক এরিয়া। রং ও আলোর বন্যায় ঝলমলে। এখানে সারাক্ষণ রাতের আবহই ছেয়ে থাকে। এখানে খাদ্যদ্রব্য ও পোশাকাদির এত বিপুল সমারোহ যে, এগুলোর সংখ্যা তো দূরের কথা, বিভিন্ন প্রকারের সংখ্যাই ছিল কল্পনার বাইরে। সব জায়গায় ফেরেশতা মোতায়েন করে রাখা ছিল। মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে পণ্য বাছাই করত এবং ফেরেশতাদের কাছে নোট করে দিত। এরপর পছন্দের সামগ্রীগুলো তাদের ঘরে পৌঁছে যেত। ফেরেশতারা প্রত্যেকের রিপোর্ট চেক করে তাদের সব তথ্য জেনে নিত। এ শপিং-এরিয়ার দুটি অংশ ছিল। একাংশে সাধারণ সব জান্নাতী কেনাকাটা করত। অপর অংশ বিশিষ্টদের জন্য বরাদ্দ ছিল। সাধারণদের এখানে যাওয়ার অনুমতি তো ছিল, কিন্তু কেনাকাটার অনুমতি ছিল শুধু উচ্চ মর্যাদার অধিকারী জান্নাতীদের।

এরা এখানে প্রথম বারের মতো এসেছিল। আমি প্রথমে তাদেরকে সাধারণদের অংশ হয়ে নিয়ে গেলাম। তারা তো এখানকার অবস্থা দেখেই আনন্দে আত্মহারা। এরপর তারা ইচ্ছে মতো পছন্দের জিনিসগুলো কিনতে লাগল। অবশ্য নাঈমা পুরো সময়টাই আমার সঙ্গে ছিল।

কেনাকাটা শেষ করার পর আমি তাদেরকে বললাম, এবার তোমাদেরকে খাবার খেতে নিয়ে যাব। খাবারের জন্যে আমি তাদেরকে উপরে নিয়ে গেলাম।

এখানে ছাদ থেকে দূর পর্যন্ত আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। উপরে ছিল তারা ভরা আকাশ। দুনিয়ার বিপরীতে এখানে শহরের আলোয় তারার আলো ম্লান মনে হচ্ছিল। আসমান জমিন ছিল সমান ঝলমলে।

তারকারাজির বাহারী আলো, শীতল বায়ুতে ভেসে আসা খাবারের লোভনীয় স্বাদ-ঘ্রাণ পরিবেশটাকে বেশ মাতিয়ে তুলেছিল। মণ্ডির মতো এখানেও অদৃশ্য জায়গা থেকে ভেসে আসছিল সংগীতের মৃদু ধ্বনি। বিভিন্ন ধরনের খাবারের আয়োজনে কে কী খাবে বুঝে আসছিল না। যা-ই মুখে দিত, তা-ই ছিল কল্পনাতীত সুস্বাদু। রাখতে মন চাইত না। খোদার শুকর, এখানে পেট ভরার কোনো ঝামেলা ছিল না। যতক্ষণ মন চাইত, বসে বসে মানুষ খেতে থাকত।
ফেরার পথে ইচ্ছে করেই তাদেরকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী জান্নাতীদের শপিংয়ের জায়গায় নিয়ে গেলাম। দেখে তো তাদের চোখ ছানাবড়া। জমশেদ বললো–
"এটাও কি শপিং সেন্টারের অংশ?"
"হ্যাঁ, এটাও শপিং এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত জায়গা।" আমি উত্তর দিলাম।

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই তারা শপিং করতে ছড়িয়ে পড়ল। আমার সাথে শুধু নাঈমা রয়ে গেল।
"কী ব্যাপার, তুমি যে কিছু নিচ্ছ না? আগেও কিছু নিলে না। এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছ।"
আমার কথা শুনে নাঈমা স্মিত হেসে বললো,

"আমার সবচে' দামি বিষয় আপনার সঙ্গ। এ দুর্লভ জিনিসটি আপনার কাছে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না।" বলতেই নাঈমার উজ্জ্বল চেহারার ঔজ্জ্বল্য আরো বেড়ে গেল।

আমরা দু'জন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলাম। স্বপ্নজগৎ ও কল্পলোকের চেয়ে সুন্দর এ জায়গাটি ও তার আশপাশ আমরা বেশ উপভোগ করতে লাগলাম। বিশাল বিস্তৃত জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠা এ বাজারে সব ধরনের দোকানই ছিল। পোশাক, ফ্যাশন, জুতা, সাজ ও উপহার সামগ্রী থেকে শুরু করে আরো না-জানি কত আইটেমের দোকান ছিল এখানে। একেকটা দোকান কয়েক ঘণ্টা দেখেও শেষ করা যেত না। দুনিয়ার সবচে' বড় শপিং সেন্টারও এখানকার একটি দোকানের কাছে কিছুই ছিল না। এখানকার দোকানগুলো নয়, চতুর্দিক ছেয়ে থাকা এক জাদুময়ী আবহই ছিল এখানের মূল আকর্ষণ। এ-মগজ আকৃষ্ট করার মতো সামগ্রীতে ভরা দোকান, আলো ঝলমলে সুরভিত পরিবেশ, মৃদু বাতাস, ধীমানো সংগীতের ধ্বনি, দৃষ্টিনন্দন ঝরণা, রং ও আলোর সহস্র শিল্পকর্ম, বিভিন্ন

ধরনের ডিজাইন, চিত্তাকর্ষক দৃশ্য আর সুন্দর সুদর্শন সব মানুষের দুরন্ত ছুটোছুটি, সব মিলিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল একটি অঙ্গনের রূপ পেয়েছিল জায়গাটি। এখানকার পরিবেশ আগতদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিসহ মানুষের চিন্তা চেতনার জগৎ জয় করার মতো সবগুলো শক্তিতে প্রচণ্ড আক্রমণ করে সেগুলোকে নিষ্প্রভ করে দিত। অন্যদের জন্যে জায়গাটি ছিল শপিংয়ের। আর আমার জন্যে ছিল বিনোদন প্রবণতা প্রশমিত করার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আসলে কি, নাঈমার উপস্থিতি এখানকার সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য আমার দৃষ্টিতে ম্লান করে দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের একাকিত্বের মুহূর্তটা ছিল একেবারেই সংক্ষিপ্ত। অল্পক্ষণের মধ্যেই লায়লা ফিরে এসে বলতে লাগল,

"ঐ হীরার মুকুটে আমাকে কেমন দেখাবে?"

"খুব সুন্দর।"

"কিন্তু আব্বু, তারা তো বলছে আমি না-কি এটা নিতে পারব না।"

"আচ্ছা!" আমি এটুকু বলতেই দেখি বাকিরাও গোমরা মুখে ফিরে এসেছে। আনোয়ার বললো–

"আব্বু, চলো এখান থেকে। এখানকার জিনিসগুলো তেমন ভালো লাগছে না।"

"অন্য কথায় 'আঙ্গুর টক'।" নাঈমা হাসতে হাসতে বললো।

"না, আঙ্গুর এত টকও না। চলো আমার সঙ্গে।"

আমি তাদেরকে নিয়ে কর্তব্যরত ফেরেশতার কাছে গেলাম। তাকে বললাম– "আমার নাম আব্দুল্লাহ। এরা আমার স্ত্রী-সন্তান। যা নিতে চায়, তাদেরকে দিয়ে দিন।"

ফেরেশতা সৌজন্যমূলক হাসি দিয়ে বললো–

"সরদার আব্দুল্লাহ, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কষ্ট করে আপনিই এসেছেন। যা খুশি তারা নিতে পারবে।"

এতে তাদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠল। আরো একবার তারা কেনাকাটার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

. . . . .

দরবার শুরু হয়ে যাচ্ছিল। জান্নাতবাসী সবাই সাধারণ, বিশিষ্টজন, দরবারি, বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত, আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শহীদ ও সালেহগণ নিজ নিজ আসনে বসা ছিলেন। দরবারের পূর্বে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ দাওয়াতের ব্যবস্থা ছিল। ইতিপূর্বে আয়োজিত সব দাওয়াতের চেয়ে এটা ছিল সবচে' বড় ব্যবস্থাপনা। এতে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সকল জান্নাতী একত্রিত হয়েছিল। পাঁচজন বিশিষ্ট রাসূলকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মেযবানির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। নুহ, ইবরাহীম, মুসা, ঈসা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আতিথ্যভোজের মেযবান ছিলেন।

আয়োজন করা হয়েছিল সুউচ্চ একটি পাহাড়ের পাদদেশে। এটা ছিল বিশাল বিস্তৃত একটি মাঠ। বাগানের মতো করে সাজানো। দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত সবুজ-শ্যামল এলাকা চোখ শীতল করে দিত। মাঠের মাঝ দিয়ে বয়ে গিয়েছিল সাগর-ধারা। দাওয়াতের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা সাজানো হয়েছিল আরবি রীতি আর অনারবি জৌলুসের প্রতি লক্ষ্য রেখে। আসনগুলো ছিল রাজকীয়। হীরা-মুক্তাখচিত। নিচে ছিল দূর পর্যন্ত পুরু কার্পেট ও গালিচা বিছানো। গিলমানদের বড় একটি সংখ্যা শরাবের পেয়ালা হাতে ছুটোছুটি করছিল। জান্নাতীদের কারো কোনো প্রকার শরাবের প্রয়োজন হলে মাথা তুলে তাকাতেই চোখের পলকে তাদের কাছে পৌঁছে যেত। তাদের চাহিদা মতো পাত্র ভরে শরাব পরিবেশন করত। এগুলো ছিল শরাব নামে স্বচ্ছ পানীয়। যাতে স্বাদ ও আনন্দ ছিল অবর্ণনীয়। কিন্তু নেশা জাতীয় খারাবি, দুর্গন্ধ, মাথা ব্যথা, মস্তিষ্ক বিকল হওয়ার মতো কিছু ছিল না এতে। সাথে ছিল বিভিন্ন ধরনের পাখির গোশতের তৈরি সুস্বাদু খাবার। যা পরিবেশন করা হয়েছিল সোনা ও রূপার পাত্রে। গাছের ডাল-পালা ফলের ভারে ছিল নুইয়ে পড়া। কারো কোনো ফল খেতে মন চাইলে ডাল আরো ঝুঁকে যেত। মানুষ তা থেকে অনায়াসে ফল ছিঁড়ে নিত।

চমকানো হলদে রংয়ের পোশাকে অনেক যুবক যুবতীকেই চারদিকে দেখা যাচ্ছিল। তাদের চেহারা ছিল উজ্জ্বল, চোখগুলো জ্বলজ্বলে। ঠোঁটে ফুটে ছিল মুচকি হাসি। দৃশ্যগুলো দেখে দুনিয়ার অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ে গেল। যেখানে মেয়েরা মেকআপ চড়িয়ে, খোদার বিধান লঙ্ঘন করে, নিজের সাজ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত। আর পুরুষরা দৃষ্টি অবনত না করে এ প্রদর্শিত সৌন্দর্য থেকে নিজের আনন্দের অংশটা উপভোগ করে নিত। অনৈতিক ও অরুচিকর দেহ প্রদর্শন থেকে যারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখত, যে পুরুষরা নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখত, তাদেরকে কত যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হত!

এখন তো তাদের সব সমস্যা শেষ, আমি মনে মনে ভাবলাম। অনুষ্ঠানে সুন্দরী রমণীদের সংখ্যা ছিল বেশ। অসাধারণ রূপলাবণ্যের সাথে সাথে পোশাক ও অলংকারের সৌন্দর্যের প্রভাবে তাদেরকে অপূর্ব মনে হচ্ছিল। যে কারো দৃষ্টি কাড়ার মতো। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা সবার অন্তর পবিত্র করে দিয়েছিলেন। কুদৃষ্টি এবং কুমন্ত্রণার ধারণাও সেখানে ছিল না। অতুলনীয় সৌন্দর্যের সাথে প্রত্যেক পুরুষ এবং নারী ছিল এক পবিত্র চেতনায় উজ্জীবিত। এখানে না ছিল নিজের সৌন্দর্য গোপন রাখার কোনো নির্দেশ, না অন্যের সৌন্দর্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা। দুনিয়ার সামান্য কষ্টের কী অসমান্য প্রতিদান!

আমার সঙ্গে ছিল পরিবারের লোকজন এবং কাছের ও দূরের বন্ধুদের অনেকেই। আমার সন্তানরা আমাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ছিল। একই অনুষ্ঠানে জমশেদ এবং আমুরার বিবাহও সম্পন্ন হয়, তাদের সম্মতিতেই। আমুরা তখন আমাদের পরিবারের সদস্য। আনন্দ-ফুর্তির মহা সড়কে আমাদের জীবন বেশ উপভোগ্য গতিতেই চলছিল। আমার মনের মধ্যে ছিল এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি। কারণ, আমার প্রিয় মানুষগুলো তখন আমার সঙ্গেই ছিল। শুধু আমার প্রিয় উস্তাদ ফারহান সাহেব ছিলেন না। তবে দরবারে তাকেও পেয়ে যাওয়ার একটি ক্ষীণ আশা ছিল।

খাবার পর্ব শেষ হতেই সকলে দরবার হলে এসে নিজ নিজ আসনে বসতে শুরু করল। আরশের একদম কাছে ছিলেন আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশেষ বান্দাগণ। তাদের মধ্যে বড় অংশ ছিল আম্বিয়ায়ে কেরাম, সিদ্দিকীন, শুহাদা এবং সালেহগণের। অন্য জান্নাতীরা বসা ছিল তাদের পেছনে। প্রথমবারের মতো আল্লাহর সাক্ষাতে ধন্য হবে, এটাই ছিল এ বৈঠকের মূল আকর্ষণীয় বিষয়। যা জান্নাতীদের জন্য সবচে' বড় প্রাপ্তি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, দুনিয়াতে চৌদ্দ তারিখের চাঁদ যেমন দেখা যায়, জান্নাতীরা ঠিক সেভাবেই আল্লাহর দীদার লাভ করবে। এর জন্যে মানুষের মধ্যে ছিল অন্য রকম উৎসাহ উদ্দীপনা। এছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে আজকেই সকলকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়ার কথা ছিল। তাই প্রত্যেকেই এ দিনের জন্যে অধীর অপেক্ষায় ছিল।

সকলে নিজ নিজ আসনে সমাসীন। প্রত্যেকের মুখে ছিল আল্লাহর পবিত্রতা ও বড়ত্বের গান। অন্তরে তাকবীর তাহলীলের আলোড়ন। চোখে কৃতজ্ঞতা ও তৃপ্তির ছাপ। সবার অভিব্যক্তি ছিল একটিই, এসব একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কোনোভাবেই জান্নাতের অধিকারী হতে পারতাম না।

দরবারের সূচনাতে ফেরেশতারা তাসবীহ তাহমীদ পাঠ করে। এরপর আসেন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম। তিনি তার জাদুময়ী সুরে একটি হামদ গাইলেন। পরিবেশ এতে স্তব্ধ হয়ে গেল। এরপর আরশবাহী ফেরেশতাগণ ঘোষণা করলেন, মহান আল্লাহ তায়ালা এবার বান্দাদের সাথে সরাসরি কথা বলবেন। ঘোষণার অল্পক্ষণ পরেই আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদের সাথে অত্যন্ত কোমলভাবে কথা বলতে শুরু করলেন।

এখানে আল্লাহ তার বান্দাদেরকে অভিবাদন জানালেন। যারা তাদের শ্রম, কষ্ট ও ধৈর্যের কারণে এ পর্যন্ত পৌঁছেছে। বান্দাদেরকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তাদের শ্রমের বদলায় প্রাপ্ত পুরস্কারে তারা সন্তুষ্ট কি না? সবাই এক বাক্যে উত্তর দেয়,

আমরা যা পেয়েছি, তা আমাদের কল্পনাতীত। আমরা যা পেয়েছি, অন্য কোনো মাখলুক তা পায়নি। আমরা সন্তুষ্ট কেন হব না!

এরপর ঘোষণা হলো, এসবের চেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তু আমি এখন তোমাদেরকে দিতে চাচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টির দৌলতে ধন্য করছি। আমি আর কোনো দিন তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না। সাথে সাথেই আল্লাহু আকবার ধ্বনি বেজে ওঠলো।

এরপর মানুষের সম্মান ও পুরস্কার ঘোষণা শুরু হলো। এ ছিল এক দীর্ঘ সময়ের কাজ। কিন্তু এখানে ছিল অসংখ্য নেয়ামতধারা। এর কারণে মানুষ শান্ত হয়ে বসে থাকে। অন্যদের মতো আমার পরিবারের লোকেরাও সামনের আসনে বসা ছিল। আমি সব কিছু দেখছিলাম। ভাবছিলাম, দুনিয়ার কষ্ট কী সামান্য, আর পুরস্কার কত বিরাট! সাথে এ ভাবনাটাও আসলো, তারপরও দুনিয়ার বেশি সংখ্যক মানুষ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এরপর উস্তাদ ফারহানের কথা মনে পড়লো। এখন পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো না। আমি মনে করেছিলাম, আজকে কোথাও না কোথাও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েই যাবে। ভাবলাম, সালেহকে জিজ্ঞেস করব। সে তখন আমার কাছে ছিল না। কিন্ত তার কথা ভাবতেই সে এসে হাজির হয়ে গেল।
তাকে দেখেই আমি বললাম–
"আমি তো ভেবেছিলাম, দরবারের কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে আমি আমার উস্তাদকে পেয়ে যাব। কিন্তু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। আমার উস্তাদ সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে?"

"না, জান্নাতুল ফেরদাউসের এ সীমানায় আমি তাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। আমার মনে হচ্ছে, এবার তুমি তাকে নিয়ে ভাবনা ছেড়ে দাও। আল্লাহর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। দুনিয়ার কোনো শক্তি তার সিদ্ধান্ত টলাতে পারবে না। আল্লাহর ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবেই।"
"তবে তার রহমত?"
"তুমি ভালো করেই জানো, আল্লাহর রহমত ও ইনসাফ, সব কিছুই নীতি নির্ভর। কারো চাওয়ায় এখানে কোনো পরিবর্তন হয় না।"
"কিন্তু ফেরদাউসের এ জগৎও তো সম্ভাবনার। এখানেও তো সব কিছুই সম্ভব।"
সালেহ মাথা নেড়ে বললো–

"বন্ধু! তর্কে যাচ্ছো কেন? যা হওয়ার, তা তো হয়েই গেছে। আর তুমি সরাসরি পরওয়ারদিগারের সাথে কথা বলো না কেন? তোমার অনেক আশাই তো পূরণ হলো। আমি তোমাকে আরশ পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছি। চলো, সময়ের চাকা ঘুরিয়ে দেওয়ার আবেদন করো।"

আমি বুঝতে পারলাম না, সালেহ রাগান্বিত হয়েই আমাকে ভর্ৎসনা করছিল, না কি আমাকে সুপরামর্শ দিচ্ছিল! তবে তার কথায় রওয়ানা হওয়ার মতো নির্বুদ্ধিতার জন্যে আমি তৈরি ছিলাম না। অবশ্য এটাও ঠিক যে, আমাকে তখন ডাকা হচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার নাম ঘোষণা হলো। আমি তখনো নিশ্চিন্তে বসে ছিলাম। হঠাৎ ওঠে দাঁড়ালাম। ধীর পায়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকলাম। সেই মহান সত্তার সামনে উপস্থিতির অনুভূতিতে আমার শরীর শিউরে ওঠছিল। কাছে যেতেই আমি সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর আওয়াজ এলো–

"ওঠে দাঁড়াও!"

আমি ধীরে ধীরে উঠলাম। অবনত মস্তকে হাত জোড় করে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়ালাম। আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কোমলভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন–

"আব্দুল্লাহ! আজ আমার জন্যে কী নিয়ে এসেছো?"

আমি নেওয়ার জন্যে এসেছিলাম। কিছু দেওয়ার জন্যে নয়। তাই এমন প্রশ্ন ছিল আমার জন্যে অনাকাঙ্ক্ষিত। আমি আমার সঞ্চিত আমলের কথা জানিয়ে বললাম–

"মালিক! আমি যে সৎকর্ম করেছি, তা মূলত তোমার তাওফিকেই করেছি। তা আমি তোমার সামনে পেশ করতে পারছি না। তোমার মহান সত্তার সামনে আমি নগণ্যের পেশ করার মতো, অনুশোচনা আর অসহায়ত্ব ছাড়া কিছুই নেই।"

উত্তর এলো–

"ভালোই করেছ। এসব আমার কাছে নেই। এগুলো আমি আমার কাছে তোমার নামে লিখে রাখছি। এবার বলো, কী চাও?"

আমি আরজ করলাম–

"তোমার দয়া ও সন্তুষ্টি সবই পেয়েছি। আমার ধারণ ক্ষমতা অতি সামান্য। আমার এর থেকে বেশি নেওয়ার কিছু নেই। তবে তুমি আমাকে যে ভিক্ষা দান করবে, আমি তারই ভিখারী।"

পাশে থাকা আরশবাহী ফেরেশতাদের একজনকে ইঙ্গিত করলেন। আমার সম্মান ও মর্যাদাগুলো সে বলতে শুরু করলো। আমি তো জানতাম, আমি এ নতুন জগতের শাসক ও অভিজাত শ্রেণির একজন। কিন্তু এখানে আমাকে যা দেওয়া হলো, তা আমার অবস্থান, কল্পনা ও সময়ের চেয়ে ঢের বেশি ছিল। ফেরেশতা ঘোষণা করছিল, আর লজ্জায় আমার মাথা নুইয়ে আসছিল। আমি বার বার ভাবছিলাম, দয়াময় আমার মতো গুনাহগারকে এত কিছু দিলেন, তার পুণ্যবান বান্দাদেরকে না-জানি কত পুরস্কার তিনি দিবেন?

ফেরেশতার বলা শেষ হলে আমাকে সম্বোধন করে বলা হলো–

"আব্দুল্লাহ! গুনাহগার তো সবাই। কিন্তু যারা তওবা করে, অনুতপ্ত হয়, তাদেরকে আমি গুনাহগার হিসেবে লিখে রাখি না। তুমি তো মানুষের কাছে আমার পরিচিতি তুলে ধরার জন্যে, আমার সাক্ষাৎ সম্পর্কে সচেতন করার জন্যে তোমার জীবন দিয়ে দিয়েছ। আমি তোমার নাম অনুগতদের সাথেই লিখে রেখেছি।"

সামান্য বিরতির পর আবার বলা হলো–

"একটু আগে সালেহকে তুমি কী বলছিলে, তা আমি জানি। হাশরের মাঠে আমলনামা প্রদানের সময় তুমি কী ভাবছিলে, তাও আমি জানি। এটাই তো তুমি ভাবছিলে, যদি আর একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো? কোনোভাবে যদি যাপিত সময় আবার ফিরে পেতাম। তাহলে আমি ধরে ধরে এক একজনকে এ দিনের ভয়াবহতার কথা বলতে পারতাম।

আব্দুল্লাহ! তোমার অস্থিরতা সম্পর্কে আমি অনবগত নই। আমার প্রতি তোমার ধারণাও আমার কাছে অস্পষ্ট নয়। আমি সব কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী, তোমার এ বিশ্বাস যথার্থ। সকল সৌন্দর্য, পূর্ণতা বড়ত্বের মালিক আমিই। আমি জানি, আমার কদম পর্যন্ত পৌঁছতে পারাই তোমার সবচে' বড় চাওয়া, পাওয়া। আমার কাছে তোমার গুরুত্ব আছে। তোমার বিশ্বাসের মূল্য আছে। কিন্তু...."

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যেই কাটতে লাগলো। কম্পিত হৃদয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, আমার রবের কাছে মুখের কথা যেমন গোপন থাকে না, তেমনি অন্তরের কল্পনাও তার জ্ঞানের বাইরে থাকতে পারে না। সহসাই আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো–

"আমার মালিক! আপনার সত্তা পবিত্র।"

"আমার জানা ছিল, মনের তামান্না প্রকাশের জন্যে তুমি এ বর্ণনা-ভঙ্গিই বেছে নিবে। দেখো! মানুষকে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় পাঠানো আমার প্লানে নেই। এজন্যে না তুমি দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারবে, না অন্য কেউ। তারপরও সময় আমার অনুগত। আমি চাইলে সময়ের চাকা ঘুরিয়েও দিতে পারি।"

এরপর এক ফেরেশতার প্রতি নির্দেশ হলো। সে রুপোর একটি প্যাকেট নিয়ে হাজির হলো। আমি দেখলাম, প্রথম পেইজে স্বর্ণের সুঁতোয় খচিত ছিল– "জীবন যেদিন শুরু হবে।"

আওয়াজ এলো–

"আব্দুল্লাহ! এটা তোমার জীবন বৃত্তান্ত। এ নতুন জগতে তোমার প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে, তার কিছুটা এখানে সংরক্ষিত আছে। তোমার সন্তুষ্টির জন্যে, তোমার এ ব্যথা ও অনুতাপের দাস্তান সময়ের জানালা দিয়ে আবার দুনিয়ায় পাঠানো হচ্ছে। এগুলো মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আমি আমার বান্দা-বান্দিদের অন্তরে এর প্রভাব সৃষ্টি করে দেব। তারা তোমার এ দাস্তান প্রিয়জনদের কাছে পৌঁছে দিবে। যাদেরকে তারা পরকালের লাঞ্চনা থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে নিয়ে আসার কামনা করবে। কিছু সৌভাগ্যবান মানুষ এ বাণী পড়ে তাদের আমলে পরিবর্তন আনবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তাদের জীবনে পরিবর্তন আসবে। তাদের ভবিষ্যৎ বদলে যাবে। এসবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তোমার আবেদনের কারণে আমি মানুষকে আরো একবার সুযোগ দিতে চাচ্ছি। চির দুর্ভাগ্যের আগে আগেই, চূড়ান্ত ধ্বংসের পূর্বেই।"
মনের অজান্তেই আমি আল্লাহু আকবার বলে সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম।

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ ভেসে আসতেই আব্দুল্লাহ এক ঝটকায় আল্লাহু আকবার বলে উঠে দাঁড়ালো। উদাস দৃষ্টিতে সে আশপাশ দেখতে লাগল। ঘোরের মধ্যেই কাটলো কিছুক্ষণ। বুঝে উঠতে পারছিল না, সে এখন কোথায়। সে তো আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো ছিল। বুঝতে চেষ্টা করলো। তখনো সে নিজেকে আল্লাহর সামনেই দণ্ডায়মান ভাবলো। বাইতুল্লাহর বরাবর সামনে, হারামের অভ্যন্তরে। সময়টা ছিল ফজরের। মসজিদে হারামে ছিল মানুষের ব্যস্ত ছুটোছুটি।
"তবে কি আমি স্বপ্ন দেখছিলাম?" আব্দুল্লাহ নিজেকে প্রশ্ন করলো।

"স্বপ্ন হলেও তা বাস্তব। হাশরের মাঠ, জান্নাতের মিলনমেলা, আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া সেগুলো যদি বাস্তব হয়, তাহলে আমার চোখে দেখা এগুলো কি? এগুলো বাস্তব হলে, সেসব বাস্তবের চেয়ে আরো সুনিশ্চিত কিছু। স্বপ্ন কি এগুলো, না সেগুলো?"
বারবার সে নিজেকে প্রশ্ন করছিল–
"একদিন তো এমন হবে না, হঠাৎ চোখ খুলে দেখবো, দুনিয়াতে যা দেখেছি, আসলে তা ছিল স্বপ্ন? প্রকৃত জীবন হলো পরকালের জীবন।"

আকাশ থেকে ক্রমাগত বর্ষিত হচ্ছিল জ্যোৎস্নাধারা। দীপ্তিমান শুভ্র আলোকধারায় হারামের পরিবেশ স্নাত হচ্ছিল। দিনের আলোর চেয়ে রাতেই ছিল বেশি মানুষের আনাগোনা। এটা পবিত্র মক্কা। মুমিনদের কা'বা। পুণ্যবানদের কেন্দ্রভূমি। খোদা-প্রেমিকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বংশ-গোত্র নির্বিশেষে আল্লাহর বান্দা-বান্দি সবাই এখানে সমবেত ছিল। সবাই আল্লাহর হামদ-তাসবীহ পাঠে রত ছিল।

পবিত্র হারামে আজকে আব্দুল্লাহর শেষ রাত। কিন্তু এটা হয়ে গেল তার জীবনের সবচে' মূল্যবান রাত। একটু আগের সেই ঘোর ঘোর অবস্থা এখন আর নেই। পবিত্র হারাম চত্বর সে আর একবার দেখে নিল। হারামের বাইরে সুউচ্চ ভবনের দৃশ্যও সে দেখলো।

ভিন্ন এক ভাবনায় সে আবার ডুবে গেল। চোখ থেকে অশ্রুধারা বইতে লাগলো। মহা মহিম আল্লাহর সামনে মন থেকে সে বিনীত আবেদন জানাতে লাগলো–

"মালিক! কেয়ামত মনে হচ্ছে মাথার উপর। নগ্নপদ বকরি-পালকরা উঁচু উঁচু ভবন নির্মাণ করছে। তোমার মাহবুবের দেওয়া ভবিষ্যতবাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তোমার বান্দাদের কাছে তোমার বাণী পৌঁছে দেওয়াই এখন আমার প্রধান কর্তব্য। সংঘটিত হওয়ার আগেই কেয়ামত সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করতে হবে। মানুষকে এখন ধরে ধরে বুঝাতে হবে। পরকাল-ভাবনার ওপর দুনিয়ার ভালোবাসা এখন প্রবল। তোমার সাক্ষাত সম্পর্কে মানুষ এখন উদাসীন হয়ে গেছে। শাসকশ্রেণি এখন জালেম। প্রজা সাধারণ মূর্খ। ধনীরা সম্পদের নেশায় মত্ত। গরিব নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন। ব্যবসায়ীরা সুদখোর, মজুতদার এবং মিথ্যুক। রাজনীতিকরা সততা শূন্য। কর্মচারীরা কাজ ফাঁকি দেওয়ায় অভ্যস্ত। সম্পদের পাহাড় গড়াই পুরুষদের জীবনের লক্ষ্য। সাজ-সজ্জা এবং দেহ প্রদর্শন করে ঘুরে বেড়ানোই এখন নারী জীবনের প্রধান ব্যস্ততা।"
আব্দুল্লাহর চোখ থেকে অশ্রু ঝড়ছিল। মন থেকে বরাবর দুআ আকুতি আসছিল। যা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা মনে হচ্ছিল অনেক বেশি।

"মাওলা! মানুষ আজ তোমার স্মরণ ভুলে বসেছে। উদ্ভ্রান্ত জীবনে জড়িয়ে পড়েছে। মানুষ আজ অত্যাচারে মত্ত। দুনিয়ার ভালোবাসায় বিভোর। ধর্মের নামে যারা কাজ করছে, তারাও দলাদলি ও অনৈক্যের বেড়াজালে আবদ্ধ। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার। নিষ্ঠার সাথে তোমার কথা বলার মানুষের বড় অভাব। তুমি আমাকে এ খেদমতের জন্যে কবুল করে নাও। আমাকে তুমি যোগ্য করে গড়ে তুলো। আগত জীবনের চিত্র তোমার বান্দাদের সামনে ফুটিয়ে তোলার শক্তি দাও। তোমার কিতাবে যা বর্ণনা করেছো, তোমার নবী যে মহাপ্রলয়ের বার্তা দিয়ে গেছেন, সে দিনের জীবন্ত চিত্র যেন আমি মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারি। পুণ্য লাভের সুযোগ যে শেষ হয়ে যাচ্ছে মানুষ তা ভুলে বসেছে। তুমি আমাকে কবুল করো। তোমার বান্দাদেরকে যেন সতর্ক করতে পারি। পরওয়ার দিগার! বিশ্ব মানবতাকে তুমি হেদায়েত দাও। জানি তুমি সব কিছু চূড়ান্ত করে রেখেছ। তুমি আমাকে খুব বেশি মানুষকে জান্নাতের পথ দেখানোর তাওফিক দাও। আমি যেন তাদেরকে তোমার দ্বার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে পারি।...... শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার আগে.....ফিরে আসার সুযোগ শেষ হয়ে যাওয়ার আগে।"

* * *

প্রিয় পাঠক!

আপনি যদি এই উপন্যাসটি আদ্যোপান্ত পড়েন তাহলে আশা করি, অন্যান্য পাঠকের মতো আপনিও সম্পূর্ণ নতুন এক জগতের সন্ধান পাবেন। আমি চাই, বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থের সাথে আপনার পরিচিতির জন্যে উপন্যাসটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ইনশাআল্লাহ।

আমি যা লিখেছি, কোরআন হাদীসের বিস্তারিত ও ইঙ্গিতবহ বিবরণের আলোকেই লিখেছি। আল্লাহ প্রতিদান দিবসের মালিক। জান্নাত মানুষের চূড়ান্ত সফলতা। আর জাহান্নামের ব্যর্থতাই প্রকৃত ব্যর্থতা। দুনিয়ার জীবন ধোঁকা। দুনিয়ার ভোগবিলাস অল্প ক'দিনের। ঈমান ও নেক আমলের প্রতি কোরআনের আবেদনে সাড়া দেওয়াই মানুষের চিরস্থায়ী সফলতা। এটাই সকল নবীর দাওয়াত এবং কোরআনের সারকথা। আমার বিশ্বাস, উপন্যাসটি পড়ে যখন আপনি অর্থসহ বুঝে বুঝে কোরআনে কারীম পড়তে বসবেন, কোরআনের মর্ম আপনার কাছে আরো অনেক বেশি স্পষ্ট হতে থাকবে। তখন কোরআন আপনার জন্যে অজানা নয়; বরং চিরচেনা স্বপ্নীল এক জগতের পরিচয় বহন করবে। কোরআন যদি আপনি এভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারেন, তা হবে আমার পরম প্রাপ্তি।

আশা করি, নোভেলটি পড়ে আপনি একবার হলেও পূর্ণ কোরআনে কারীম অর্থসহ পড়ার চেষ্টা করবেন।

–আবু ইয়াহইয়া